গল্প-ভারতী

পূজার পরিশিষ্ট

ত্রয়োদশ পর্য্যায়

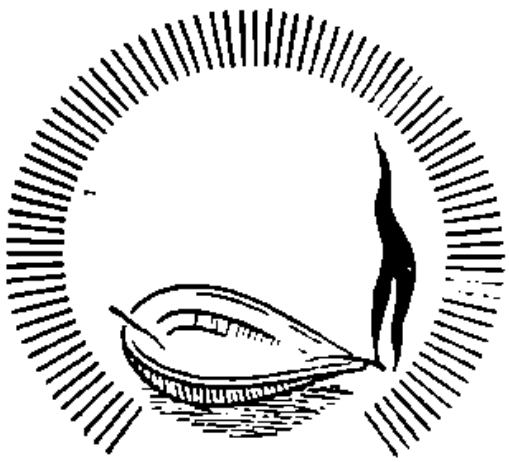

গল্প-ভারতী

759.6
.005/2

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম"

সম্পাদক
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক
ভারতী সাহিত্য ভবন লিঃ,
১১৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা-৬

মূল্য—২।।০ টাকা

গল্প-ভারতী সহায়ক-সমিতি

গল্প-ভারতীর সহৃদয় পাঠকবর্গকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গল্প-ভারতীর প্রস্তাবিত বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেক শিক্ষায়তনের সহযোগিতা আমরা লাভ করিয়াছি। গল্প-ভারতীর সহায়ক সমিতির সুদীর্ঘ তালিকার মধ্যে, বাংলাদেশের আর দুইজন কৃতী ব্যক্তির নাম সংযোগ করিতে পারিয়া বর্তমানে গল্প-ভারতীর সহায়ক-সমিতি নিম্নলিখিত সুদীর্ঘ তালিকার দ্বারা পুনর্গঠিত হইল—

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী, ডি-ফিল (অক্সফোর্ড)
- অবিনাশ ঘোষাল
- কালিদাস নাগ, ডি-এট্-লিট্ (প্যারিস)
- খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্.এ. ভূতপূর্ব রামতনু অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
- নরেন্দ্র দেব,
- পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়,

বন্ধুল
- বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক যুগান্তর
- রাধাবিনোদ পাল, ডি-এল
- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পি-এইচ-ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি-লিট্ (লণ্ডন)
- সজনীকান্ত দাস, সম্পাদক, শনিবারের চিঠি
- সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সম্পাদক, বসুমতী
- সরোজকুমার রায় চৌধুরী
- সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পি-এইচ-ডি
- সৌরীনাথ ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, এম্. এ, পি, আর, এস
- মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য, এম, এ পি, এইচ-ডি,

৺হরিনাথ শাস্ত্রী ও ৺বেনীমাধব বড়ুয়া প্রথম হইতেই গল্প-ভারতীর সহায়ক সমিতিতে থাকিয়া তাঁহাদের পূর্ব সহযোগিতা দান করিয়াছেন। গল্প-ভারতী সগৌরবে চিরকাল তাঁহাদের নাম স্মরণ করিবে।

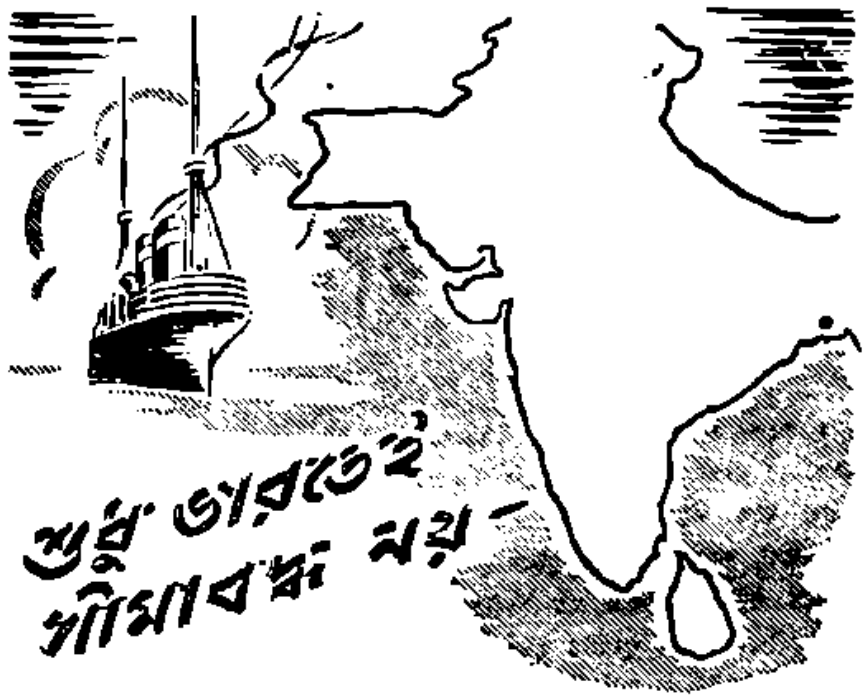

শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়—

রসনীয় অন্তর্নিহিত শক্তিতে দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, এর গতি কেউ রোধ কর্তে পারে না। আমাদের মিষ্টান্নের প্রতি অণুটী মনোরম সুরভি স্নিগ্ধ—কারণ আমাদের প্রত্যেকটী উপকরণ বিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আমাদের কারিগরদিগের নৈপুণ্য অনন্যসাধারণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই দেশবাসীর নিকট থেকে অনাবিল প্রশংসা ও আন্তরিক উৎসাহ লাভে সমর্থ হয়েছে। তাই আমাদের খ্যাতি মাতৃভূমি ছাড়িয়ে বিদেশেও বিস্তার লাভ করেছে।

ভীম নাগ

৬-৮, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা- ফোন: বি, বি, ১৪৬৫
৬৮, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর- ফোন: পার্ক, ১১৭৭
৪৬, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা- ফোন: বি, বি, ৩৩৭৮

—এই গ্রন্থে আছে—

	বাংলার শক্তি-পূজার কাহিনী	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	
২।	কবি নিলমণি ভূষণ	ডঃ মতিলাল দাস	
	বাংলার নব-জাগরণের স্মৃতি		
৩।	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়	৩২
৪।	রবীন্দ্রনাথ	ডাঃ কালীদাস নাগ	
৫।	কবি-কঙ্কাবর্ত্তন	সম্পাদক শ্রীমতী রাধা চন্দ	
৭।	ভিজে খড়	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	
৮।	সন্তান	জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী	৫০
৯।	সত্যই যে মহত্তম:	শ্রীদিলীপ কুমার রায়	
১০।	কর্ণেলের সমস্যা	সুজাতা রায়, এম, এ, এম, এড্ (লীডস)	
১১।	বন্দিনী	শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী	
১২।	অলকানন্দা	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	
১৩।	ছল	শ্রীশান্তা দেবী	
১৪।	বিভূতিনী	শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	

—o—

বঙ্গলক্ষ্মীর

পাইলট

&

সুগন্ধী

গায়ে মাখা সাবান

★

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস লিঃ

১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভবন

বাংলার শক্তি-পূজার কাহিনী

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস নয়, প্রবন্ধ নয়, তত্ত্বকথা বা ধর্ম-আলোচনা নয়,

তার আয়োজন আমার নেই, দুঃসাহসও রাখি না,

আমি তীর্থ-পথিক, তীর্থের পথে পথে যা দেখেছি দুচোখ ভরে, যা শুনেছি দুকান পেতে,

তারি কাহিনী আজ বলবো, বলবো স্বাধীন বাংলার তরুণ-তরুণীদের কাছে,—

পরিত্যক্ত দেবালয়ের ভগ্ন-বিগ্রহের মত, আমাদের জাতীয় আদর্শ, ক্রমশঃ দেখছি আমাদের তরুণ-চিত্তের অরণ্য-দেশে যেন হারিয়ে যাচ্ছে···ক্রমশ যেন তার বিস্মৃত-দেউলের উপর পরগাছার বন-সমৃদ্ধি আত্ম-বিস্তার ক'রে চলেছে···

মরু-বালুকার স্তরে বিলুপ্ত দর্শন প্রাচীন নগরীর মতন, আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের চেতনা যেন ক্রমশ এক অশোভন উদাসীন অজ্ঞতা আর আত্মস্ফীত পরধর্মিতার বালু-স্তরের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে···

তাই আজ যারা যাত্রী, যারা তীর্থ-পথিক, তাদের নতুন করে যাত্রা করতে হবে, জাতির সেই দূর-অপসৃয়মান প্রাণ-তীর্থের সন্ধানে···পরধর্মিতার বালু-স্তরের বক্ষ ভিন্ন করে খুঁড়ে বার করতে হবে সেই সুপ্ত চির-নগরীকে··· যে-চির-নগরীতে অধিষ্ঠান করছেন জাতির কল্যাণ-লক্ষ্মী, বরযাত্রী···

বারবার মানুষের যাত্রা-পথের দীর্ঘ ইতিহাসে দেখেছি, যখন বাইরে থেকে তার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনের তাগিদ আলো সামনে এগিয়ে চলবার, তখন পেছন থেকেই তার মন খুঁজে বার করে সামনে-অগ্রসর-পথে যাবার আলোক-বর্তিকা...বারবার এমনি করে, যে-অতীতকে আমরা মনে করেছি মৃত, সে পুনরুজ্জীবিত হয়ে বর্তমানের দেহে এনে দিয়েছে প্রাণ-স্পন্দন। সে-স্পন্দনে উৎসাহিত হয়ে আবার মানুষ চলেছে এগিয়ে। মহাকালের অচ্ছেদ্য প্রবাহের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অতীত-বর্তমানের সীমারেখার ক্ষীণ-চিহ্ন।

আজকে বাংলা দেশে আবার এসেছে সেই মহাসন্ধিক্ষণ, যখন সামনে এগিয়ে যাবার দুর্বার তাগিদে আমাদের পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে হবে সেদিনকার হাতে-আলা কনক-প্রদীপটীকে...অতীত বলে যা পড়ে আছে পিছনে, খুঁজে দেখলেই দেখতে পাবো, অতীত বলে তার মধ্যে মরে যায়নি গতির স্পন্দন···

শুধু স্তম্ভিত হয়ে থেমে আছে তার গতি···অভিশপ্ত পাষাণী অহল্যার মত সে প্রস্তর-স্থির হয়ে চলা-পথের পাশে হাত পড়ে আছে রাম স্পর্শের অপেক্ষায়। যেদিন সে-স্পর্শ সে পাবে, সেদিন সেই মুহূর্তে সে আবার নতুন জীবনে উঠবে জেগে···তার সেই জাগরণের মধ্যে দিয়ে জেগে উঠবে জাতির প্রাণ-ধারার ছেদহীন প্রবাহ। সম্পূর্ণ হবে একটা গতি-চক্র। তাই আজ দিকে দিকে সুরু হোক, সামনে এগিয়ে যাবার জন্যেই পিছনে ফিরে চাওয়া·· বাঙালীর জীবনে সার্থক হয়ে উঠুক তার চির-দিনের-শোনা রূপকথা...রাজার কুমার তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে এসে, রক্ষ-রক্ষদের নিধন করে ঘুমন্ত নিশ-মহলে ঢুকে সোণার পালঙ্কে ঘুমে ঢলে-পড়া রাজার কুমারীকে আবার জিয়নকাঠির স্পর্শে তুলুক জাগিয়ে। অতীত জেগে উঠে বর্ত্তমানের কণ্ঠে তুলিয়ে দিক বরণমালা।

আজ রাত্রি অমাবস্যা। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার পর আজ শ্যামা অমাবস্যা। বাঙালী আজ রাত্রি নিশীথে আরাধনা করবে দিগম্বরনা শ্যামা জননীকে। অমাবস্যার গাঢ় তমিস্রার পটভূমিকায় রক্ত-লোলুপ শৃগাল কেরুপালের রক্তান্বেষণ-চীৎকার-মুখরিত মহাশ্মশানে সন্তানের নৃ-মুণ্ডমালায় বিভূষিতা হয়ে জননী আজ খর্পরধারিণী হয়ে এসেছেন মৃত্যু বিতরণ করতে। সঙ্গে নেই আজ শ্বেতবসনা সরস্বতী, পাশে নেই আজ হেমাম্বরবিভূষিতা ভোগাকর-শোভিনী লক্ষ্মী, উলঙ্গিনী নীলা জননীর সঙ্গিনী আজ অন্ধকার-বিবসনা রুধির-পিপাসাতুরা কাল-ভৈরবীর দল। দেবতারা আজ ভয়ে অন্তর্হিত।

সেই দেবতা-বিমুখ ভয়ার্ত্ত অন্ধকারে, বাঙালী সাধক আজ নিজের অন্তরকে সর্ব্বভিক্ত করে রচনা করেছে দেবীর অধিষ্ঠান-আসন, শ্মশান ভালবাসিস্ বলে, শ্মশান করেছি এ হৃদি। শুধু একদিনের আবাহন আর পরের দিনের বিসর্জ্জন নয়, এ নিত্য-পূজা, নিত্য-আবাহন, সেই শ্মশানে তুই নাচবি নিরবধি।

বাঙালীর সেই সর্ব-ভয়-মুক্ত অন্তরের আসনে আজ হবে মৃত্যুরূপা জননীর উদ্বোধন·····সর্ব-ভয়, সর্ব-মোহ, সর্ব-কুণ্ঠতার ঊর্দ্ধে বাঙালী আজ মৃত্যু-রূপা জননীর কাছ থেকেই চেয়ে নেবে মৃত্যুর আশীর্বাদ। জননী যার মৃত্যুময়ী, মৃত্যুতে তার কিসের ভয়?

সর্ব-ভয়ের বীজকে ধ্বংস করবার জন্যেই তার এই মৃত্যু-ভয়ী সাধনা। মৃত্যুর স্তন থেকে বাঙালী সাধক পান করেছে অমৃতের সুধা। দেবতারা যার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখে ভয়ে আত্মগোপন করেছে, বাঙালী সাধক তাঁকেই মা বলে শিশুর মত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

দীপান্বিতার রাত্রিতে বাঙালীর ঘরে-ঘরে জ্বালানো প্রত্যেক মাটীর প্রদীপের শিখায় লেখা আছে বাঙালীর সেই অপরূপ সাধনার কাহিনী। সারারাত্রি জ্বলুক সেই প্রদীপের শিখা। বাঙালীর অস্তিত্বকে ঘিরে জ্বলুক দীপান্বিতার রাত্রির এই প্রদীপের আলো।

গহন-অন্ধকারের বুকে সেই প্রদীপের আলোয় আত্মবিস্মৃত বাঙালী পড়ুক আবার তার জীবন-কাহিনী ...

মহা-সম্ভাবনার বিদ্যুৎ-জ্বালা জ্বলে উঠুক প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর বুকে···

পুড়ে ছাই হয়ে যাক আত্ম-তৃপ্ত সামান্যতার এই রক্তহীন মেদ-বৃদ্ধি…

বাঙালীর বুকে জেগে উঠুক আবার দুঃসাহসের বন্যা…বিরাট করে, বিশাল করে সে আবার দেখুক স্বপ্ন…

ভগীরথীর সন্তান সে, স্মরণ করিয়ে দিক সে-কথা বীণাযিতার রাত্রির প্রহরীকে।

সকলকে সে গ্রহণ করেছে তার নরম পলি-মাটীতে, কোন বীজকে করেনি প্রত্যাখ্যান। কিন্তু সকলকে স্বীকার করেও, সে রয়েছে স্বতন্ত্র। তার এ তত্ত্ব যদি আজ সে হারিয়ে ফেলে, সেই হবে তার চরম মৃত্যু।

শক্তি-পূজা তার সেই স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয়।

(৩)

বন্ধু তর্জনী করে ওঠে, বাংলার স্বাতন্ত্র্য! থামাও এই উচ্ছ্বাস! আজ ইতিহাসের মহা-ভূলকে সংশোধন করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এক-কেন্দ্রে এক-জাতীয়তার সম্বন্ধে হতে চলেছে, আজ কেন আবার সেখানে চীৎকার করছো, বাংলার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে! বিচ্ছিন্ন প্রাদেশিকতা! শোন নি, মিলিতভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল এই প্রাদেশিকতার মহাপাপ সম্বন্ধে বিরত থাকবার জন্যে বারবার আবেদন করছেন?

বন্ধুকে পাশে টেনে নিয়ে বলি, আজ তোমাকে একটা অন্তরের কথা বলবো। তারপর তোমার কথার জবাব দেবো। একদিন যখন আমরা পরাধীন ছিলাম, তখন সমগ্র ভারত এই বাংলার দিকেই চেয়ে ছিল…সেদিন বাংলার প্রতিভা, বাংলার দুঃসাহসিকতা, বাংলার দুরন্তপনা, তাঁরাই আদর্শ হিসাবে সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেদিন বাংলার স্বাতন্ত্র্য ভারতের কাউকে পীড়া দেয়নি। আজ দৈববিপাকে, বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে,…তার বিশাল প্রান্তরে আর একটীও মহীরুহ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নেই…সমস্ত ক্ষেত্র অঙ্কুর তুলে সমতল হয়ে গিয়েছে… বীর-প্রসবিনী প্রতিভার ধাত্রী আজ শূন্য কোলে বসে আছে! স্বর্ণদীর্ঘ শতাব্দীর যে ক্ষেত্র একদিন ভারতের মানসিক অন্ন জুগিয়েছিল, আজ সে-ক্ষেত্র পড়ে আছে শূন্য…আগাছায় পরিপূর্ণ। এর বেদনা বন্ধু, তুমি অনুভব কর না? এই মহাদৈন্য তোমার অন্তরে হাহাকার জাগিয়ে তোলে না? যদি করে থাকে, তাহলে আজ তোমাকে ভাবতে হবে, কেন একটা জাতির ইতিহাসে সম্ভব হলো এমন মারাত্মক দুর্ভিক্ষ? কোথায় কি ভাবে এই সমাজ-যন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছে, যার জন্যে আজ উৎপাদন বন্ধ? না, এই কথাই স্বীকার করে নিতে হবে, জাতি হিসাবে আমাদের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে এসেছে? যে মহা-সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখিয়ে একদিন বাংলা সমগ্র ভারত-চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিল, সে শুধু স্বপ্নই…কোন মহা-সম্ভাবনার দায়িত্ব নেই বাংলার স্কন্ধে? জগৎ-ব্যাপারে কোন বৃহৎ অংশ নিতে আসে নি সে? শেষ হয়ে গিয়েছে তার আত্মিক অস্তিত্বের ধারা।

আজকের বাতাবন খুলে গতকালের দিকে চেয়ে দেখলে, সে-কথা বিশ্বাস করতে মন পারে না। রাম-মোহন থেকে সুভাষচন্দ্র···অগণন দিয়া আবির্ভাবে আমাদের অতি-নিকটবর্তী গতদিন যেভাবে দীপ্যমান হয়ে রয়েছে, তাতে এ জাতির মহাসম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন সংশয়ই মনে জাগতে পারে না। যে বিরাট প্রাণ-সম্পদের উত্তরাধিকারী আমরা, তার সম্বন্ধে অচেতন হয়ে থাকা আমাদের শোভা পায় না। তাই আজ বন্ধু, সে-সম্বন্ধে চাই তোমাকে সচেতন করে তুলতে-- সচেতন করে তুলতে চাই কি মহৎ ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী তুমি। বাংলার প্রত্যেক বৃক্ষলতা আজ তারস্বরে বলছে, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। তোমার প্রাপ্য যে ঐশ্বর্য্য, তুমি তা গ্রহণ করবার জন্যে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে তোল···। সমস্ত রাজনৈতিক শ্লোগানের ঊর্দ্ধে কান পেতে শোন, জাতির বিজয়দ্রষ্টা আজ ডেকে বলছেন, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!

বন্ধু হেসে বলে, কিন্তু তা নয় হলো, তবে প্রাদেশিকতাকে আশ্রয় করতে হবে?

—স্বাতন্ত্র্য-বোধ আর প্রাদেশিকতা এক জিনিস নয়। তাদের গোত্র সম্পূর্ণ আলাদা। স্বাতন্ত্র্য-বোধের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই প্রাদেশিকতার বিষ দূর হবে। এবং তখন যে-মিলন হবে, সেইটাই হবে আসল মিলন। নইলে বাইরের এই আইনের শৃঙ্খলে-বাঁধা একজাতিত্বের বন্ধন, ভূতের মধ্যে ছোট্ট ইঁটের কুঁচীর মত চলতে ফিরতে শুধু বয়েই বেড়াবে...মনের মধ্যে হারিয়ে-রাখা আত্মাভিমানের বীজ সুযোগ পেলেই মহা-মহীরুহ হয়ে পথ আগলে দাঁড়াবে। তাই বিশ্ব-কবি বারবার করে বলে গিয়েছেন, যখন আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের প্রদীপটিকে পরিপূর্ণ ভাবে জ্বালিয়ে তুলতে পারবো, সেইদিনই নিখিল দেওয়ালী উৎসবের সার্থকতা ফুটে উঠবে। স্বাতন্ত্র্যকে হারিয়ে যে মিল, তার মধ্যে থেকে যায় ছোট-বড়র সংশয়, কম-পাওয়া বেশী-পাওয়ার আনুপাতিক দ্বন্দ্ব, হিসেব করে ভাগ বাটোয়ারার লাভ-লোকসানের ভয়, পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ, বিদ্বেষ.. যা আবার একদিন ফেটে পড়বে অন্তর্দ্বন্দ্বে বা সিভিল ওয়ারে। স্বাতন্ত্র্যের বিকাশের মধ্যে যে বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয় থাকে, সে ছোটবাট ভাগ বাটোয়ারার হিসেবের তারতম্যে টলে না। তখন সে দিলে, নিজেকে রিক্ত বোধ করে না, না পেলে নিজেকে অসহায় মনে করে না। তার বলিষ্ঠ পরিপূর্ণতার মধ্যে সে সকলকে সেদিন নির্ভাবনার স্থান দিতে পারে। মানসিক ক্ষেত্রে বাংলা যা চিরদিন করে এসেছে.....

তবু বন্ধু বলে, কিন্তু বাংলার এই স্বাতন্ত্র্যের কথা, এটা কি কবি-কল্পনা নয়? সত্যি কি, এমন কোন বিশিষ্টতা এই মাটীর আছে, যাকে স্বতন্ত্র করে দেখা যায়?

আশ্বাস দিয়ে বলি, আছে, আছে। সে কথাটী জানা, সে কথাটী বোঝা, সেইটেই হলো আজ প্রত্যেক বাঙালী তরুণ-তরুণীর শিক্ষার প্রথম পাঠ। আজ আমাদের সমস্ত সাহিত্য, সমস্ত শিক্ষা, যেন সেই কথাটিকেই স্পষ্ট করে জাতির নবীন আগন্তুকদের সামনে তুলে ধরে, জাতির মানসিক উন্নয়নের সেই হবে আসল ভিত্তি। এই অতি সু-প্রাচীন মহাসমৃদ্ধ ভারত সমাজে বাংলা দেশ বহু বহু শতাব্দী ধরে একটা বিশিষ্ট জীবন-ধারা অনুসরণ করে এসেছে, একটা স্পষ্ট জীবন-নীতি তার অস্তিত্বের পেছনে সর্ব্বদাই শক্তি জুগিয়ে এসেছে···তার এই গৌরবময় দীর্ঘ ইতিহাসের পেছনে একটা শাস্ত্রসম্মতি অতি-বাস্তব প্রবণ-বর্জ্জন করবুলা কাজ করে এসেছে, যার জন্যে এত রাজনৈতিক অধঃপতনের আর উত্থান-পতনের মধ্যেও এই মাটীতে রামমোহন, পরমহংসদেব,

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দের জন্ম সম্ভব হয়েছে এবং যার জন্যে বাস্তব জীবনে নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে যখন ভারতবর্ষ স্তিমিত নির্বীর্য হয়ে পড়েছিল, তখন এই বাংলা দেশই আবার সেই নির্বীর্যতার বুকে জীবনের স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, কল্পনা-প্রসূত কোন ধোঁয়াটে অবাস্তব থিয়ি নয়, ইতিহাসের অকাট্য তথ্য অনুযায়ী অঙ্ক কষে একে বার করা যায়। নিজের জাতির অস্তিত্বের এই মূল সূত্রটী সম্বন্ধে অচেতন হয়ে থাকা মানে, নিজের জাতির অপমৃত্যু ডেকে আনা···বাইরে থেকে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রস্তাব দিয়ে তখন আর জাতিকে বাঁচিয়ে তোলা যায় না। এবং তাই, আজ আমাদের জাতীয় জীবনে, বাইরের সমস্ত উন্নয়নের পরিকল্পনা শুধু পিছলে পড়ে যাচ্ছে···উন্নয়নের জন্যে যা কিছু তৈরী হচ্ছে, কি অদ্ভুত গোপন এক প্রক্রিয়ায় তাইই আমাদের অধঃপাতে আরো গভীরভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে...যত আইন তৈরী হচ্ছে, আইন এড়াবার তত ফন্দী অন্ধকারে গজিয়ে উঠছে···কনট্রোল যত শক্ত হচ্ছে, চালে তত কাঁকড় বাড়ছে...সর্ষের তেলে আজ তাই সব ছাড়া আর সবই পাওয়া যাচ্ছে। নিজের জাতির মর্যাদা, তার সম্ভাবনা, তার চরিত্র, আজ আমরা ভুলে যেতে বসেছি। জাতিগতভাবে আজ আমরা চরিত্রহীন হতে চলেছি। বাইরের শত মহামারী আর দুর্ভিক্ষের চেয়ে এইটেই হলো আমাদের আসল আশঙ্কার বিষয়।

সন্দিগ্ধভাবে বন্ধু বলে, তাহলে সেই সূত্রটি কি? যার মধ্যে তুমি বলছো আমাদের জাতীয় চরিত্র বিধৃত হয়ে আছে?

—সেইটীই আজ অনুশীলন করতে হবে। পণ্ডিতদের আজ তা প্রাকৃতজনের জন্যে খুঁজে বার করতে হবে। তবে ইতিমধ্যেই তার স্বরূপ যতটুকু উদ্ঘাটিত হয়েছে, সংক্ষেপে তা তোমাকে জানাচ্ছি ..এবং যদি সূত্র হিসাবে জিজ্ঞাসা কর, তাহলে একটী সূত্রে পরিচয় দেওয়া যায়, বাংলার এই স্বাতন্ত্র্য কি? সে সূত্রটী হলো, বাংলার বৈশিষ্ট্য হলো তার প্রাণ-ধর্ম। তার সমস্ত ইতিহাস, তার সমগ্র অস্তিত্ব এই সূত্রটির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

এই প্রথম সূত্র থেকে উপ-সিদ্ধান্ত হিসাবে অন্যান্য সব সূত্র লেখা যিয়েছে।

প্রাণ-ধর্মের স্বভাবই হলো, সে কোন জিনিসই প্রত্যাখ্যান করে না। সব যীতই বাংলার নরম পলি-মাটিতে আশ্রয় পেয়েছে। তাই যে-কোন ভাব-আন্দোলনই বাংলা দেশে সহজেই প্রভাব বিস্তার করে। বাংলায় অন্যকে গ্রহণ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। তাই যখন দেখবে গ্রহণ করতে সে বিমুখ হয়েছে, ভয় পেয়েছে, তখনই বুঝবে তাকে ব্যাধিতে ধরেছে। তাই তার চরিত্রের মধ্যেই আছে প্রাদেশিকতার বিরোধী মন্ত্র। সকলকেই সব সময়ই আহ্বান করেছে সে তার সীমানার মধ্যে।

জীবন্ত সুস্থ শরীর যেমন খাদ্য গ্রহণ করে' তার পুষ্টির অংশকে রক্তে পরিণত করে নেয় তেমনি সেই সঙ্গে বর্জনীয় অংশকে শরীর থেকে বার করে দেয়। বাংলা দেশও তেমনি প্রত্যেক জিনিসকে তার নিজের মতন করে আত্মসাৎ করে নেয় এবং তার মধ্যে বর্জনীয় অংশকে সে অনায়াসে বাদ দিয়ে ফেলে দেয়। এই সমীকরণ আর বর্জন-নীতি হলো বাংলার চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর্য সভ্যতা থেকে আরম্ভ করে

বিশিষ্ট সভ্যতা পর্যন্ত শত শত ভাব-ধারাকে সে এই ভাবে গ্রহণ আর বর্জনের দ্বারা নিজের করে নিয়েছে। গ্রহণ করতে সে যেমন উন্মুখ, তেমনি বে-দিলিশ গ্রহণ করছে, তার মধ্যে বর্জনীয় অংশকে ফেলে দিতেও সে তেমনি সজাগ। শরীরতত্ত্ব অনুযায়ী শরীর যদি অপ্রয়োজনীয় জিনিস বর্জন করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে তাহলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাংলা দেশও তেমনি যখনই বর্জন করবার শক্তি হারিয়ে ফেলবে, তখনই বুঝতে হবে তার দেহের মধ্যে কোথাও ব্যাধির বীজাণু প্রবেশ করেছে।

তৃতীয় সূত্র হলো, বাংলা দেশ কোনদিনই শাস্ত্রের শাসনকে অন্তরের ধর্মের বা মুক্তির ওপর স্থান দেয়নি। সেদিকে সে চির-বিদ্রোহী। তাই একদিন শাস্ত্রীয় সংস্কৃত আর্যাবর্তের বাংলা দেশকে অপাংক্তেয় করে রেখেছিল। সেখানে পদার্পণ করা ছিল, পাপ। কিন্তু বাংলাদেশ সগৌরবে এই অপাংক্তেয়তার শাস্তিকে বরণ করে এসেছে। সেইখানেই তার বিদ্রোহী মনের স্বাতন্ত্র্য। এবং ভারতবর্ষে যখনই প্রচলিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কোন অভ্যুত্থান হয়েছে, তা হয়েছে এই বঙ্গ অঞ্চলেই। এই অঞ্চলেই তাই বেদবিরুদ্ধ জৈন আর বৌদ্ধ ধর্ম জন্ম ও প্রসার লাভ করে, এই দেশেরই গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেছেন মহাবিদ্রোহী সাংখ্যকার। এই দেশেই তাই চৈতন্যদেব পুঁথি-পত্র গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে শুধু অন্তরের প্রেমধর্মে মানুষকে আহ্বান করে গিয়েছিলেন, এই দেশেই তাই সব আচার-অনুষ্ঠানের ঊর্দ্ধে সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের মহাবিপ্লব সংঘটন করে গিয়েছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ।

চতুর্থ সূত্র হলো, তার অপূর্ব মানবীয়তা। স্বর্গবাসী শাস্ত্রের সমস্ত দেব-দেবী তার কাছে তাই তার ঘরের মানুষ। তার দেবতা তাই কোন দূর স্বর্গলোকে বাস করে না, তার প্রতিদিনের জীবনের হাসি-কান্না দুঃখ-দারিদ্র্য, কামনা-বাসনার মধ্যে সে তার দেবদেবীকে নিয়ে ঘর করে, তার সঙ্গে ঝগড়া করে, বিবাদ করে শিশুর মত তার কাছে কাঁদে, আবদার করে। তাই তার শক্তি উপাসকের কাছে অম্বের ভীমা ভৈরবী দেবী প্রেমময়ী মানবী মা। তাই তার বাউল কবি পুঁথি-পত্র, শাস্ত্র-সংজ্ঞা সব ফেলে দিয়ে গেয়ে উঠলো, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। শিক্ষিত হিন্দু তার শাস্ত্র নিয়ে আর শিক্ষিত মুসলমান তার কোরাণ নিয়ে যেখানে মিলতে পারলো না, সেখানে বাংলার বাউলরা বাংলার প্রাকৃত জনেরা, সব ভেদ উড়িয়ে একসঙ্গে এক জায়গায় গেল মিলে। কাতর কণ্ঠে গেয়ে উঠলো,

তোমার পথ চাইকাছে মনিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই চলতে না পাই
কথে দাঁড়ায় শুরুতে মরশেদে॥

বাংলার এই অপরূপ মানব-ধর্ম, তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে গেল, একটী হলো তার বৈষ্ণব ধর্ম, আর আর একটী হলো তার বাউল-সাধনা, আর একটী হলো তার শক্তি-পূজা বা শক্তি-সাধনা। একই দেবতার তিনটী মুখ।

দিয়ে দেখি, বন্ধু নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে!

(৪)

সামনে আমার নীলবর্ণা দেবী কালিকার মূর্তি। প্রতিমার দেহ-গঠনে বাঙালী শিল্পী আজ যেন একটা নতুন উৎসাহ পেয়েছে। তার কল্পনা নানাভাবে দেবী মূর্তিকে গড়ে তুলতে চেয়েছে। বিমুগ্ধ জনস্রোত সমস্ত শহর ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছে···বলাবলি করছে, কোন্ পাড়ার মূর্তি সব চেয়ে ভাল হয়েছে...

এই উৎসব-মত্ত জনস্রোতের এক পাশে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি, এই মূর্তির মধ্য দিয়ে অদৃশ্য ছায়া মূর্তিতে ভেসে চলেছে আমার ইতিহাস। যে-বেশ আমার অতীত হয়ে গিয়েছে, যে-সাধনার কথা আজ স্মৃতিমাত্র, সেই সব সাধনায় যাঁরা ছিলেন ধারক, আজ তাঁদের যেন সকলকে একত্র একজায়গায় এই প্রতিমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। অতীত আর বর্তমানের মধ্যে যোগসেতু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই মূর্তি রক্তপর্বধারিণী কালী কাল-ভৈরবী.....

গভীর অরণ্যে জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই···পরিত্যক্ত জীর্ণ ভগ্নপ্রাসাদের কোণে মৃৎ-প্রদীপের আলোয় জ্বলছে এই মূর্তি...মনুষ্য আবাস থেকে দূরে বাঙালী সাধক শক্তির আশীর্বাদ লাভের আশায়, পরমাবিভূতির জন্যে উপাসনায় বসেছে এই মূর্তির সামনে···

রক্ত-সর্বস্ব রিক্ত জাতি রাজনৈতিক উত্থান-পতনের তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষীণবল অসহায় হয়ে, বারবার এই মূর্তির সামনে বসেছে ঘোর তান্ত্রিক সাধনায়, যুগ-যুগান্তের অন্তর মথিত করে উঠছে প্রার্থনাধ্বনি, শক্তি দে মা, শক্তি দে! কখন জননী যশোরেশ্বরী, কখন বা কিরীটেশ্বরী···কখন বা অপোগারিণী, কখন বা প্রাসাদবাসিনী

শুধু মৃন্ময়ী ধার বদলে···আবার দেখি, সেই একই মূর্তি শক্তিরূপা লীলা জননী...রাত্রি নিশীথে তারই সামনে বাঙালী বিপ্লবী নিজের দেহের রক্ত দিয়ে সহচরের কপালে পরিয়ে দেয় টীকা...জননীর রক্ত-পদস্পর্শ করে' শপথ গ্রহণ করে···হয় মৃত্যু···নয় মুক্তি···

তাই আজ আমি দেখছি, এই অগণন জনস্রোতের উর্দ্ধে এই শ্যামা মৃন্ময়ীর মধ্যে আমার ইতিহাসের ঘনীভূত মূর্তি...শক্তি-প্রয়াসী বাঙালীর শক্তি-সাধনার অপরূপ কাহিনী···দেখছি, কি নিবিড়ভাবে মিশিয়ে আছে রাত্রিরূপিনী জননী আমার, আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে···

(৫)

বাংলাদেশের নরম পলি-মাটীতে এসে তন্ত্রের শক্তি-পূজাও একটা সম্পূর্ণ আলাদা রূপ পরিগ্রহণ করে। কি ভাবে এই গূঢ় বিদ্যা বাঙালী সাধকদের জীবন-সাধনায় এক অভিনব সহজ প্রাণ-ধর্মে বিকশিত হয়ে ওঠে, তার অপরূপ কাহিনীর মধ্যে বাঙালীর অন্তরের স্পষ্ট পরিচয় ফুটে আছে। গ্রহণ এবং বর্জন নীতির সূত্র অনুযায়ী দেখা যায় বাঙালী সাধক তন্ত্রের আচারের ভয়ঙ্করত্বকে ছাড়িয়ে উঠে কি ভাবে নিজের নিবিড় হৃদয়-ধর্মের মধ্য দিয়ে তার পরমাসিদ্ধিকে অর্জন করেছে। এই-শক্তি-উপাসনার ধারা একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে

বাংলা দেশে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনায় চরম অভিব্যক্তি লাভ করে। পঞ্চ-মকারের বিভীষিকাময় শ্মশান থেকে ঠাকুর বিশ্ব-জননীর বেদী রচনা করলেন, তাঁর আপন-ভোলা শিশু অন্তরে।

তন্ত্রের সাধনা ভারতের একান্ত গূঢ় বিদ্যা। তার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের ইতিহাস ও বিবর্তন আমার জ্ঞানের বাইরে। আমি শুধু দেখেছি, বাঙালী সাধকের জীবনে তার অপরূপ বিকাশের ছবি...এই মর্ত্য মানুষের সঙ্গে সেই অমর্ত্য বিশ্ব-জননীর অপরূপ সম্পর্কের কাহিনী বেদনা-বিদ্ধ এই গ্রহের ইতিহাসে এনে দিয়েছে এক পরম সান্ত্বনার মহাসম্ভাবনা...মানবীয়তার এক অপূর্ব মধুর রূপ। সমগ্র মানব-অভিজ্ঞতার ইতিহাসে এমন মাধুর্যময় সম্পর্কের লীলা আর কোথাও দেখা যায় না। দেবতা আর ভক্ত নয়, ক্রিয়া আর সিদ্ধাই নয়, আচার আর বিভূতি নয়...মা আর ছেলে। তন্ত্রের সমস্ত আচার আর মন্ত্রকে ছাড়িয়ে উঠছে—প্রাণের আকুল একাকার ডাক, মাগো! সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানকে সরিয়ে রেখে একটী মাত্র সুরকে সে গ্রহণ করলো, যদি ডাকার মতন ডাকতে পারি...

তাই বাঙালী শক্তি-সাধকের কাছে তার ইষ্টদেবী একান্ত জীবন্ত মূর্তি...যাঁর সঙ্গে সে কথা বলে, জীবনের প্রতি মোড়ে মোড়ে যাঁর স্পষ্ট অস্তিত্ব সে উপলব্ধি করে, ছোট ছেলের মত ক্ষুধা পেলে যাঁর কাছে ছুটে যেতে পারে, ভয় পেলে যাঁর অভয় অঙ্কিয়ের কোলে নিজেকে নিঃসংশয়ে তুলে দিতে পারে। এবং শুধু অন্তরের ভালবাসার জোরেই তাঁর ওপর তার সব দাবী। সে জানে যদি সে তেমন আকুলভাবে তাঁকে চায় তিনি আসবেনই, তিনি ধরা দেবেনই। আচার-অনুষ্ঠান, তন্ত্র-মন্ত্র...সকলের ওপর সে জানে, হৃদয়ের প্রেমধর্ম... জীবন্ত মানুষ সে, সে চায় জীবন্ত মানুষেরই সুস্নিগ্ধ স্পর্শ। এই তত্ত্ব বোঝাবার জন্যে আচার্য ক্ষিতিমোহন শুরু কবি রবিদাসের একটী অপরূপ কাহিনীর সন্ধান আমাদের দিয়েছেন।

সাধক কবি রবিদাসকে একদিন তাঁর কোন শিষ্য প্রশ্ন করে বসলো, প্রেমের ধর্মে বিকারের ভয় আছে, তবে সে-পথে যাব কেন?

কবি তার সে প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে, শিষ্যকে নিজেই আর একটী প্রশ্ন করলেন, কি খাও?

শিষ্য উত্তর দিল, দুধ দই শাক অন্ন খাই!

কবি আবার প্রশ্ন করেন, এই সব জিনিস কি পচে না?

উত্তর হলো, হাঁ, পচে।

কবি বলেন, কিন্তু ইট পাথর তারা পচে না, তা কেন খাও না?

শিষ্য উত্তর দিল, তাতে যে প্রাণ বাঁচে না।

তখন রবিদাস উত্তর দিলেন, ঠিক সেই জন্যেই প্রেমের পথে বিকারের ভয় থাকলেও সেই পথেই যেতে হবে। কেন না, তা জীবন্ত। তা না হলে প্রাণ যে বাঁচে না!

এই প্রাণের পথই হলো, বাংলার পথ। বাঙালী শক্তি-সাধকদের জীবনের অপরূপ কাহিনীর মধ্যে আমরা বারেবারে তারই প্রকাশ দেখেছি। তাঁদের সেই সবচেয়ে একান্ত-করে-পাওয়ার আকুল আহ্বান তাঁরা রেখে

গিয়েছেন বাংলার আকাশে বাতাসে, তাই কর্ম-ক্লান্ত সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জনে যখন দূর থেকে মেঠো সুরে হঠাৎ রামপ্রসাদের গানের একটা কলি কানে এসে লাগে, তখন বাঙালী মাত্রেরই চেতনার মর্মমূল যেন আন্দোলিত হয়ে ওঠে···সেই অলঙ্কার-হীন অতি-সহজ দৈনন্দিন ভাষার আটপৌরেমীর ভেতর থেকে জেগে ওঠে অনাদিকালের আকুতির সুর। সে-সুর যেদিন বাঙালীর মনে ঘুমবে না অনু-রণন, সেদিন বুঝতে হবে সত্যই আমরা হয়েছি জাতিভ্রষ্ট।

তাই আমাদের দেবতা দূর স্বর্গলোকে মানব-সংস্পর্শের বাইরে বাস করেন না। বাঙালীর দেবতা তার কুটীর-প্রাঙ্গণে তার প্রতিদিনের হাসি-কান্না বেদনা-ভাবনার মধ্যে তার জীবনের নিত্যসাথীরূপে বিচরণ করে। দেবতাকে সে মানব করেছে, তাই মানবকেই সে জানে দেবতা বলে। দেবতা-মানবের দূরত্ব সে ঘোচাতে চেয়েছে তার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। তাই মনে আশা জাগে, এই মানব-ধর্মের নব-নিষ্পীড়নের যুগে হয়ত বাঙালী আবার জগতে প্রতিষ্ঠা করবে মানবীয়তার অভিনব আদর্শ···জগতের বস্তুতান্ত্রিক রাজনীতির এই ক্রমবর্দ্ধমান মানব-পাষণার বৈজ্ঞানিক আয়োজনের মধ্যে বাঙালী আবার নিয়ে আসবে নব-মানবীয়তার চরম দুঃসাহসিক আদর্শ...তারই লক্ষণ দেখি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে; বিবেকানন্দের বিশ্ব-পরিক্রমায়, রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কাব্যে। এই ঐতিহাসিক মহাবারিধের ধারা-বাহিকতার চেতনা আজ জেগে উঠুক আমাদের তরুণ তরুণীর অন্তরে, আমাদের সমস্ত শিক্ষা ও সাহিত্য নতুন করে আবার আমাদের সমাগ করে তুলুক সেই মহৎ ভবিতব্যতার সম্ভাবনায় ইতিহাস সূচনা করেছে আমাদের যে পরম দুঃসাহসিক অস্তিত্ব,—সমস্ত ক্ষুদ্রতা নীচতা আর তুচ্ছতাকে পদ-দলিত করে আগত ও অনাগত কাল যেন তাকেই সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলে, এই বিরাট আদর্শে আবার জেগে উঠুক বাঙালীর প্রাণ-ধর্মী চেতনা।

(৬)

কবে সে কোন্ দূর হিমগিরিরাজ্যে বিশ্বজননী বালিকা গৌরীর মূর্ত্তি ধরে এসেছিলেন নগাধিরাজ হিমালয়ের গৃহে···বালিকা কন্যাকে অশ্রুজলে বিদায় দিয়েছিলেন স্নেহকাতর জনক-জননী পতিগৃহে যাবার কালে ···আর্য্য ঋষিরা দেখেছিলেন, তার মধ্যে দেবতার প্রয়োজন···অসুর-নিধনে কার্ত্তিকেয় সেনাপতির জন্ম··· দেবাদিদেবের ধ্যানভঙ্গের আয়োজন···অসুরবিনাশিনী দুর্গতিনাশিনী শক্তিরূপা বিশ্বজননীর আবির্ভাব...কিন্তু বাঙালী সাধক কবি সেই হিমগিরিবিহারিনী কৈলাসগেহিনী দেবীকে দেখলো বাঙালীর ঘরে ঘরে···বাঙালী মা-বাপের অশ্রুজলের সঙ্গে মিশে গেল মেনকা আর গিরিরাজের নয়নাশ্রুধারা...তাই দেবীর আগমনীর গানের মধ্যে বেজে উঠলো এই বাংলার কুটীর প্রাঙ্গণেরই বেদনার সুর···দেবী হলো মানবী। মানবীর প্রেমে বাঙালী সাধক খুঁজতে বেরুলো বিশ্বের আরাধ্যা দেবীকে···নিজের অন্তরকে মাত্র সম্বল করে...কখন কন্যা, কখন জননী, কখন বা জায়া। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ভেদ-ভাঙা এই দুঃসাহসিক প্রাণ-সাধনার কাহিনীর মধ্যে বয়ে চলেছে বাঙালীর প্রাণ-গঙ্গার ধারা। বাঙালীর জীবন ইতিহাসের এক অপরূপ অভিব্যক্তি··যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্য ভাঙা গড়ার ইতিহাসের পাশাপাশি চলেছে আর এক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারা...বাইরের রাজনীতির পরিবর্ত্তন কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে নি তার অব্যাহত ধারায়···আর এক স্বতন্ত্র ইতিহাস···বাঙালীর মনোরাজ্যের ইতিহাস···

অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বর নাটোরাধিপতি রামকান্ত মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, মাতৃ-আরাধনায়। দূরদেশ থেকে এক সন্ন্যাসী এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর অপরূপ সাধনার কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে। এসে শুনলেন, মহারাজা এখন পূজোয় বসেছেন, সুতরাং দেখা হওয়া তো এখন সম্ভব নয়।

সন্ন্যাসী বলেন, তা হলে এই মন্দির প্রাঙ্গণেই অপেক্ষা করি! পূজো হয়ে গেলে মন্দির থেকে যখন বেরুবেন, তখন না হয় দেখা করবো।

তাই মন্দিরের চত্বরের একধারে বসে সন্ন্যাসী অপেক্ষা করে থাকেন। এমন সময় হঠাৎ নূপুরের শব্দে তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন। যেন কোন দুরন্ত বালিকা নূপুর-পরা পায়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ক্রমশ নূপুরের শব্দ যেন কাছে এগিয়ে এল। সন্ন্যাসী ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, সত্যি, যা অনুমান করেছিলেন, তাই ঠিক। একটী অপূর্বসুন্দর বালিকা নূপুর পায়ে ছুটোছুটি করছে, আর মাঝে মাঝে মধুর কণ্ঠে বলে উঠছে, দুয়ো, ধরতে পারলি না, দুয়ো! যেন কার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

বালিকার সেই অপূর্ব্ব কান্তি দেখে সন্ন্যাসী আর চোখ ফেরাতে পারেন না। আহা কি অপূর্ব্ব কান্তি! দেখলে মন ভরে যায়।

সন্ন্যাসী নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না। ইঙ্গিতে বালিকাকে আহ্বান করেন। খেলা ভঙ্গে যেন ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়ে বালিকা নূপুর পায়ে রুম্ রুম্ করতে করতে সন্ন্যাসীর সামনে এসে দাঁড়ায়। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করে, তুমি, কে মা?

বালিকা সেই প্রশ্ন শুনে হেসে যেন লুটিয়ে পড়ে। বলে, ওমা, তুমি কে গা! আমি যে রাজার মেয়ে জাননা তুমি? বিদেশী বুঝি।

সন্ন্যাসী বলেন, হাঁ, মা, আমি বিদেশী। তা তোমার বাবার পূজো কখন শেষ হবে?

—তা আমি কি করে বলবো? আমি যাই···নইলে এক্ষুনি আমাকে ধরে ফেলবে···

দুরন্ত চঞ্চল মেয়ে তেমনি রুম্ রুম্ করে আবার ছুটে মন্দিরের পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সন্ন্যাসী বিহ্বল হয়ে ভাবেন, রাজার ঘরে না হলে এমন রূপ হয়?

তাঁর কানে ভ্রমর গুঞ্জনের মত বাজতে থাকে সেই নূপুরের আওয়াজ···

এমন সময় পূজা সেরে মহারাজা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন। চোখে তাঁর ধ্যানের স্বপ্ন মাখা · যেন নিজের মধ্যেই নিজে বিভোর হয়ে আছেন।

সন্ন্যাসীকে দেখে মহারাজা তাঁর দিকে এগিয়ে এসে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

—কোথা থেকে আসছেন আপনি?

সন্ন্যাসী বলেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই দূর দেশ থেকে আসছি···শুনেছি আপনি ভক্ত সাধক লোক···এসে শুনলাম, আপনি মন্দিরে পূজোয় রয়েছেন···তাই এখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছি···

মহারাজা কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, এ কি কথা! অতি সামান্য লোক আমি, আমার জন্য আপনি যে এত কষ্ট করে অপেক্ষা করে আছেন···এ আমার লজ্জারই কথা।

সন্ন্যাসী বলেন, কষ্ট মোটেই আমার হয় নি · এই কিছুক্ষণ আগেই আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম··· আহা···আপনার মেয়ের রূপ দেখে আমি সব দুঃখকষ্টের কথা ভুলে গিয়েছি···

মহারাজা সহসা প্রস্তর-স্থির হয়ে যান। বলেন, কি বল্লেন আপনি? আমার মেয়ে? আমার মেয়ে তো কেউ নেই সন্ন্যাসী?

বিস্মিত হয়ে সন্ন্যাসী বলেন, সে কি মহারাজ! আমি নিজের চোখে দেখলাম···অপরূপ কিশোরী গৌরী মূর্তি···পায়ে নূপুর···তার সঙ্গে কথা বল্লাম···সে নিজেই পরিচয় দিল···আমি যে রাজার মেয়ে···তুমি বিদেশী, তাই জান না।

সন্ন্যাসী চেয়ে দেখেন, সামনে মহারাজা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, তাঁর দুচোখ দিয়ে নীরবে ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

সন্ন্যাসীর মনের মধ্যে সহসা যেন বিদ্যুৎ ঝলকে কি মহাসম্ভাবনার কথা জেগে ওঠে!

মহারাজা বলেন, সন্ন্যাসী তুমি ধন্য···সার্থক তোমার সন্ন্যাস···এত সাধনা করে, এত আরাধনা করে যাঁর দেখা পেলাম না, আর তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে একদণ্ডের মধ্যে সেই বিশ্বজননীর সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে গেলে!

সন্ন্যাসীর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মহারাজা আর প্রাসাদে প্রবেশ করেন না। অবরুদ্ধ কণ্ঠে নিজের ভৃত্যকে আহ্বান করেন, ওরে ভোলা, নিয়ে আয় আমার জপের মালা।

ভোলা গঙ্গার দিকে মহারাজা যাত্রা করেন। জপের মালা হাতে নিয়ে গঙ্গাজলে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন···মাতৃ-বিরহ-বেদনা-কাতর আহ্বানে মুখরিত হয়ে ওঠে গঙ্গার দুইতীর···

৬

ময়মনসিং জেলার পণ্ডিতবাড়ি গ্রাম···ভক্ত দ্বিজদেবের বাড়ীতে আজ উৎসব। তাঁর রূপসী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন পরম ভক্ত রাঘবানন্দের। নিমন্ত্রিতরা সকলে আহারে বসেছেন। নব-পরিণীতা কন্যা বধূরূপে আজ স্বহস্তে সকলকে পরিবেশন করছেন। সহসা বধূর মাথা থেকে ঘোমটা বাতাসে উড়ে গেল। নব-পরিণীতা মহালজ্জায় পড়লেন। তখন দু হাতেই তাঁর পরিবেশনের থালি। কি করেন?

রামধনানন্দ এক দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চেয়ে আছেন। সহসা দেখলেন, বধূ আর দুটী হাত দিয়ে মাথার ঘোমটা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে নিয়ে যথারীতি পরিবেশন করতে লাগলেন।

বিষয় আর বাসনার জোটানায় জর্জরিত আজ রামপ্রসাদ। মন চায় সব ছেড়ে খুঁজে বেড়াতে কোথায় আছে পথ, কোথায় আছে মন্ত্র, কোথায় আছে মন্ত্র-তন্ত্র, যা দিয়ে পাওয়া যায় অভয়পদ.. বিশ্ব-মায়ের আশীর্বাদ। কত মন্ত্র, কত তন্ত্র করলেন সাধন·· কিছুতেই অন্তরে মেলে না সেই পূর্ণ-পাওয়ার আনন্দ। মাতৃ-বিরহ-বেদনায় কাতর প্রাণ গানে গানে ফেটে পড়ে। আর কতদিন, আর কতদিন এমনি ধারা চোখ-বাঁধা কলুর বলদের মত ঘোরাবি মা এই দুঃখ-বেদনাময় সংসারের চারদিকে? সংসারের কাজ করেন, আর সব কাজের মধ্যে হাহাকার করে ওঠে মন। বাড়ীর সামনে বেড়া ভেঙে গিয়েছে। তাই মেরামত করতে বসেন। কাজ করে চলেছেন কিন্তু মন ভাবছে বেড়া ভাঙারই কথা। এমন সময় বেড়া বাঁধবার দড়িটা বেড়ার ওপার দিয়ে ধরবার জন্যে মেয়েকে ডাকলেন। মেয়ে এসে বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে দড়ি ধরে আর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেয়। শেষের দিকে মেয়ে কখন চলে গিয়েছে তার হুঁস নেই...তাজ্জা বেড়া মেরামত করে বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখেন, মেয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে! কি রকম ব্যাপার? এই যে মেয়ে তাঁর সঙ্গে বেড়া বাঁধছিল! বিস্মিত স্ত্রী বলেন, তুমি কি সত্যি উন্মাদ হয়ে গেলে নাকি? মেয়ে আমার কখন থেকে ঘুমুচ্ছে!

রামপ্রসাদ কেঁদে ওঠেন, হায়, সারাজীবন তোকে দেখবো বলে সজাগ হয়ে থেকে, যখন এলি, তখন চোখ চেয়েও দেখলাম না।

মন্দিরের ধারেই পুকুর। বিরাট পুকুর। দীঘি।

দীঘির পাড়ে বসে আলতারাঙা ছোট্ট দুটী পা জলে ডুবিয়ে অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে আপনার মনে জল নিয়ে খেলা করছে। এমন সময় রাস্তা দিয়ে শাঁখারী হাঁক দিয়ে যায়, শাঁখা চাই, চাই শাঁখা।

নিজের সুগোল দুটী ছোট্ট হাত তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে মেয়েটী। শাঁখারী কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, শাঁখা পরবে মা? তারী সুন্দর মানাবে।

মেয়েটী হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, হাঁ পরবো।

ঝুড়ি নামিয়ে বুড়ো শাঁখারী শাঁখা পরাতে বসে। অনেক হাতে সে অনেক শাঁখা পরিয়েছে, কৈ এমন নরম হাত তো আর সে কখনও দেখে নি।

হঠাৎ তার নজর পড়লো, মেয়েটীর আলতারাঙা দুটী পায়ের ওপর। ধারবার দুটী শ্রম সেই পায়ের কাছে আসবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শাঁখারীর নাকে এসে লাগে পদ্মের গন্ধ। হয়ত দীঘিতে ফুটেছে পদ্ম। কিন্তু এমন মিষ্টি পদ্মের গন্ধ তো সে আর কখনও পায় নি।

শাঁখা পরাতে পরাতে তার মন আনন্দে ভরে যায়। আহা, এমন হাতে শাখা পরিয়ে কি করে সে পয়সা চাবে? অথচ এমনি গরীব সে, পয়সা ছেড়ে দেবে, তাও তার ক্ষমতা নেই।

তাই কাতর হয়ে বলে, মাগো, শাঁখা বেচে খাই, পয়সা নিয়ে গেলে তবে ছেলেপুলেরা খেতে পাবে··· নইলে এমন হাতে শাঁখা পরিয়ে কি কেউ পয়সা চায়?

মেয়েটি হেসে বলে, তার জন্ত তুমি কিছু ভেবো না, ঐ যে মন্দির দেখছো, ঐ মন্দিরে আছেন আমার বাবা···পূজোরী···ওঁকে বোলো ঝাঁপিতে যা আছে, তাই তোমাকে দিতে।

আনন্দিত মনে শাঁখারী মন্দিরের পূজোরীর কাছে গিয়ে বলে, বাবা, দীঘির পারে বসে তোমার মেয়ে শাঁখা পরলো।

পূজোরী অবাক হয়ে বলে, কি বলছো তুমি শাঁখারী···আমার তো মেয়ে নেই···তাই তো সারা জীবন ধরে এই মন্দিরের পাষাণীকে মা মা বলে ডাকছি···

শাঁখারী বলে, তা কি হয় বাপু···আমাকে নিজে সে বল্লো, আমার বাবাকে গিয়ে বলো ঝাঁপিতে যা আছে তাই তোমাকে দিতে।

পূজোরী বলে, ঝাঁপিতে তো কিছু নেই বাছা। নিশ্চয়ই তাহলে তোমাকে কেউ ঠকিয়েছে।

তবু শাঁখারী বলে, বেশ তো, ঝাঁপিটা একবার দেখই না বাবা।

বিস্মিত শাঁখারী ঝাঁপি নামিয়ে দেখে, ঝাঁপির ভিতর চক্ চক্ করছে দুটি স্বর্ণ মুদ্রা।

দুই চোখ জলে ভাসিয়ে, পূজারী বলে, ওগো শাঁখারী, তোমাকে সে ঠকায় নি, ঠকিয়েছে আমাকে।

এই বাংলার মাটিতে, মানুষেই যে শুধু ছুটেছে দেবতার সন্ধানে তা নয়; দেবতাও ছুটে এসেছে মানুষের সন্ধানে। দেবতা আর মানুষের খেলাঘর এই বাংলার মাটী—জল—হাওয়া সে কি আজ আজ শুধু মাটী জল আর হাওয়া হয়েই থাকবে?

জল, মাটী, হাওয়া···য়ুরোপ তার বিজ্ঞান-শালায় পরীক্ষা করে দেখলো, তার মধ্যে কি কি মৌলিক উপাদান আছে, কি কি মৌলিক উপাদানের সংযোগে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হয়েছে। অণু আর পরমাণু আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র··উনবিংশ শতাব্দীর মানুষকে এক নতুন আদর্শে দীক্ষিত করে তুলো। আকাশের দিকে তার দূরবীক্ষণ যন্ত্র তুলে সে ঘোষণা করলো, যন্ত্রে যা ধরা পড়ে না, তা নেই! যন্ত্রে যা ধরা পড়ে, অঙ্ক-শাস্ত্রে যার হিসেব মিলে, সেই একমাত্র সত্য! তার বাইরে আর কিছুই নেই।

কামানের সাহায্যে সেই নতুন মতবাদ পাশ্চাত্য জগৎ পূর্ব্ব-জগতে নিয়ে এলো···স্তিমিত-গতি হীন-বিভব পূর্ব্ব জগৎ বৈজ্ঞানিক বল-দৃপ্ত পশ্চিমের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। যন্ত্রের নির্ঘোষে চাপা পড়ে গেল ভারতের

আরণ্যক সভ্যতার বাণী। পরাজিত জাতি প্রতিবাদ করতে পারলো না। বৈজ্ঞানিক বিশ্বয়ের বাস্তবতার কাছে সে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলো।

সেই মহা-দুর্যোগের রাত্রিতে এলো বাংলার নগণ্য এক গ্রামে বিদ্যা-বুদ্ধিহীন এক উন্মাদ ব্রাহ্মণ···ভারতের পুঞ্জীভূত তপঃশক্তির সেবতম আবির্ভাবস্বরূপ এলো এক অপরূপ মানুষ···পুঁথি সে জানে না, বিজ্ঞান জানে না, কি দিয়ে জলের উপাদান তৈরী তা সে জানে না। সে এলো, সঙ্গে নিয়ে ভারতের তপস্যার ঐশ্বর্যের বিভব। অন্ধকার বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে অন্ধের বাইরে মানব মনের মহারহস্যের জিজ্ঞাসা নিয়ে সে এলো আবার।

সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীর মহা প্রতিবাদ···ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি অবিশ্বাসী জগতে নতুন করে প্রমাণ করে দিলেন, ভেদ কোথায় নাই··সব পথ মিলেছে, একই মহাকেন্দ্রে···সব আচার, অনুষ্ঠান, তন্ত্র, মন্ত্রের ঊর্দ্ধে আবার তুলে ধরলেন, মানুষের অমর অন্তরকে···

বিভিন্ন ধর্মমত অনুসরণ করে ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মূল তত্ত্বটী আবিষ্কার করছিলেন, সেই সময় একদিন অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক ভৈরবী তাঁর নিকট আগমন করেন। তখন ঠাকুরের হাব-ভাব দেখে, অনেকের মনে বদ্ধ ধারণা হয়ে যায় যে তিনি হয়ত উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। এই ভৈরবী ব্রাহ্মণী শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের আহ্বান করে, তাঁদের সামনে শাস্ত্র থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত করে প্রমাণ করে দেন যে, এই মহাপুরুষ উন্মাদ নন, উন্মাদনার লক্ষণ বলে লোকে যা ধরে নিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ভগবৎ প্রেরিত পুরুষেরই লক্ষণ।

সে-কাহিনী অবশ্য এখানে বলতে চাই না···এখানে আমার বক্তব্য হলো, এই ভৈরবীই ঠাকুরকে প্রথমে তন্ত্রের আচার অনুযায়ী সাধনায় নিযুক্ত করেন। ভৈরবীর নির্দেশমত ঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনার একে একে সিদ্ধিলাভ করে যেদিন বীরাচারে পঞ্চ-মকারের সাধনায় বসলেন, সেদিন তাঁর মধ্যে দিয়ে বাংলার সাধনার বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ রূপ প্রকট হয়ে উঠলো। নারী মাত্রকেই তিনি জগন্মাতার অংশ বলে জানতেন এবং এই জন্যই তন্ত্রোক্ত যোনি সাধনার কোন প্রয়োজনই তাঁর হলো না। আসনে বসবার আগেই পূর্ণ সমাধিতে তিনি লীন হয়ে গেলেন। ভৈরবী সেদিন বুঝলেন, তন্ত্রের আচারের ঊর্দ্ধে এক অপরূপ শক্তি এই মহামানব তাঁর অন্তর ধর্ম অর্জন করেছেন।

সর্ব-সাধনার শেষে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এমনি এক অমাবস্যা রাত্রিতে শ্যামাপূজা উপলক্ষে সাক্ষাৎভাবে নিজের সহধর্মিণীকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করলেন, নিজের অর্জিত সমস্ত সাধনার ফল মাতৃ-রূপী নারীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। বিশ্ব-জগতের ইতিহাসে নারী পেলো তার চরম অর্ঘ্য···

দেবতা এবং উপাসক, দুইজনেই সমাধি-মগ্ন···

মাত্র কয়েক বৎসর আগে, এই বাংলাদেশে দক্ষিণেশ্বর দেখেছে এই মানবীয়তার মহালীলা। দেখেছে মানুষের দিব্যশক্তির প্রকাশ, যে-শক্তির বলে এই মানবের মধ্যেই জেগে উঠেন ভগবান, ঘুচে যায় স্বর্গ মর্ত্যের ভেদ।

কবি নিলমণি ফুকন

ডঃ অতিকলাল দাস

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া এই রচনাটী প্রকাশ করিতেছি। সে-উদ্দেশ্য কি, তাহা এই রচনা পড়িলেই বুঝা যাইবে। একান্ত দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে উৎকট প্রাদেশিকতা মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। এই পরস্পর-বিচ্ছিন্নতা এবং পরস্পর-বিরোধিতা হইল ভারত-ইতিহাসের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। ইহারই জন্য ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া বারবার বাহিরের যে-কোন-শক্তির নিকট মাথা নত করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহার ভাব-গত বিরাট ঐক্যকে কোনদিন রাজনৈতিক একত্বের দ্বারা সে ভোগ করিতে পারে নাই। অথচ, এই ভাব-গত ঐক্যের মূল এত সুদৃঢ় ও এত সুগভীর যে বারবার বাহিরের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মারাত্মক ক্রটী তাহাকে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ভারত-ইতিহাসের এই মূল-সূত্রটীকে আজ মনে-প্রাণে, বাক্যে এবং কর্ম্মে আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে। এই অভি-জ্ঞানের মূল্য এত বেশী যে, তাহার জন্য কোন প্রাদেশিক ক্ষতি মারাত্মক হইতে পারে না।

এই সূত্রে, আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, সংস্কৃতির দিক হইতে যদি কোন প্রদেশ নিজের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে আত্মবিকাশের পথ খোঁজে, তাহা হইলে তাহাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। যেখানে একটা ঐক্য ঐতিহাসিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, সেখানে পারস্পরিক উন্নতির পথ আপনা হইতেই সেই ঐক্যের দিকেই লইয়া যাইবে এবং শিথিল না করিয়া সেই মূল ঐক্যের ভিত্তিকেই আরো সুদৃঢ় করিবে। একই দেহের মধ্যে, যেখানে একই হৃদয় বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একই রক্ত পরিবেশন করিতেছে, সেখানে প্রত্যেকটী অঙ্গের বিকাশের সঙ্গে অপরাপর অঙ্গের বিকাশ স্বভাবতই জড়াইয়া আছে। তাই ভারতের ঐক্য-বোধকে

মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া যদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্ব বিকাশের চেষ্টা করে, তাহার মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতার বীজ থাকিতে পারে না। সংস্কৃতি স্বার্থ নহে, পণ্য নহে। ভেদকে দূর করে বলিয়াই তাহা সংস্কৃতি, অন্তত তাহাই হইল ভারতীয় সংস্কৃতি। স্বতন্ত্র পথকে ভারত-সংস্কৃতি কোনদিনই ভয় করে নাই, কারণ সে জানে পথ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যত বিভিন্ন দিক হইতেই তাহা আসুক না কেন, এক লক্ষ্যে আসিয়া তাহা মিশিবে। প্রদীপ সহস্র হইতে পারে, আলো কিন্তু এক।

একদিন এই বিরাট দেশের মধ্যে ভাবগত ঐক্যকে বজায় রাখিবার জন্য আর্য্যকবিরা পুরাণের কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তীর্থ-যাত্রার মধ্য দিয়া সেই একই পুরাণের শ্রবণ-মননের ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাবগত ঐক্য বজায় রাখা হইত।

আজ সেই প্রাচীন পৌরাণিক প্রচার-পন্থা উঠিয়া গিয়াছে। তীর্থ-দেবতারাও উপেক্ষিত। নূতন কোন পন্থা তাহার পরিবর্তে আমরা আবিষ্কারও করি নাই।

তাই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাব-গত আদান-প্রদান, আজ আমাদের জাতীয় কর্ম্মের সর্ব-প্রথম বিষয় হওয়া উচিত। একান্ত দুঃখের বিষয় রাশিয়া কি করিতেছে বা আমেরিকা কি ভাবিতেছে, তাহা আমরা রুষ বা আমেরিকান সাহিত্য হইতে জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব কিন্তু বিহার কি ভাবিতেছে তাহা বাংলা জানে না, বাংলা কি ভাবিতেছে, তাহা উড়িষ্যা জানে না। সাহিত্য একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে এই ত্রুটী সংশোধিত হইতে পারে। এবং এই ভাবেই আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ ও সাধনাকে সাহায্য করিতে পারে। সেই জন্য আমাদের লেখকবর্গের নিকট গল্প-ভারতীর বিশেষ অনুরোধ, যদি তাঁহারা ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের অন্তঃপুর পরস্পর-কুটুম্বিতার মধু-মন্ত্রে অনুরণিত হইয়া উঠুক।

প্রকৃতির রমা লীলানিকেতন আসাম গিয়েছিলাম। দেশের নিসর্গদৃশ্য দেখিলেই দেশকে দেখা হয় না। দেশের মানুষকে চেনা ও জানা চাই। আসামে শিবসাগর জেলার মুখ্য নগর জোড়হাটে কবি নীলমণি ফুকনের সহিত পরিচিত হইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করি। প্রতিবেশী অসমীয়াদের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে আমাদের আদৌ আগ্রহ নাই, কিন্তু ইহা আমাদের গৌরবের বিষয় নহে কলঙ্কের বস্তু। আসাম ও বঙ্গের যোগাযোগ অতি পুরাতন—সেই যোগসূত্র ছিন্ন করিলে আসাম ও বঙ্গ উভয়ের ক্ষতি হইবে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পৌহাটী হইতে নদিয়া পর্য্যন্ত আসাম ট্রাঙ্করোড চলিয়া গিয়াছে। এই সুবিস্তৃত রাজপথটী অতিশয় চমৎকার। ইহার কোথাও বনজঙ্গল, কোথাও শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, কোথাও ক্ষুদ্র পল্লীশোভা। কোথাও নগরীর জনাকীর্ণ সমারোহ। মোড়হাটে নিকেল সাইকেল মার্ট—সাইকেলের বড় দোকান। দোকানের মালিক আমার স্বগ্রামবাসী বন্ধু। তাঁহার নির্দ্দেশমত ৮ই কার্ত্তিক সকালে নীলমণি ফুকন মহাশয়ের বাসায় গেলাম।

সপ্ততিবর্ষ বৃদ্ধ, মুখে মৃদুমধুর হাস্য। আমি বলিলাম—"আপনি কবি, আপনার কবিতা শুনতে এলাম।"

কবির চিত্তে ভাবে সাড়া—স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে তিনি পাঠ আরম্ভ করেন :—

মনেরে গড়িলো
প্রতিমা তোমার
আপনা করিলো
হৃদয়ত ;
বরণ করিলো
প্রাণর মাজত
আরাধিলো রূপ
অন্তরত
সৃষ্টির একোতে
বিচারি না পালো
তোমার রূপর
তুলনা ;
না পালো একোতে
যদিও, তুমিহে
হৃদয়র মোর
কামনা।

আসামী ভাষার ঈকার লেখা হয় পেট কাটা ব দিয়া, আমি কেবল লক্ষণে রকার দিয়া দি এবং অন্যান্য বর্গীয় বর্ণের রূপ দিয়া আসামী কবিতাকে যথাযথ ভাবে লিখিয়াছি। রসজ্ঞ পাঠক দেখিবেন আসামী ও বাংলা ভাষার সাদৃশ্য কত ঘনিষ্ট এবং নিকট। আসামী ভাষার তিনটী বৈশিষ্ট্য মনে রাখা উচিত। অসমীয়ারা ম-কে হ-কার করিয়া উচ্চারণ করেন। মানুহ তাই আসামীর কণ্ঠে হয় মানুহ। অন্যান্য বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃত রীতি অনুসারে অসমীয়ারা "উজ" রচনা করেন। এবং রকারকে ছির রূপে লেখেন।

কবি নীলমণির কবিতার বাহির সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে অন্তর্দৃষ্টি নিহিত তাহার পরিচয় সুপরিস্ফুট। কবি জ্যোতিকণা, সাহিত্যকণা, চিন্তামণি, জয়াতীর্থ, মানসী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মানসীর ভূমিকায়

কবি নিজে লিখিয়াছেন : —'মানুষ চিরকাল সৌন্দর্য্যের উপাসক। মানুষে প্রথমতঃ প্রাকৃতিক জগতেতে সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখে। ওই সৌন্দর্য্যের উপাসনা করোতে করোতে অন্তর্মুখী মানুষে সেবিধলৈ কালে যে সৌন্দর্য্যর আধার দৃশ্যমান জগতের নহয়। সৌন্দর্য্য প্রকৃততে অতীন্দ্রিয় বস্তু, অনুভূতির বিষয়।'

ইহার বাংলা অনুবাদ দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সকল বাঙালীই ইহা পড়িয়া বুঝিবেন। বৃটিশ জাতির ভেদনীতি কাজ না করিলে হয়ত অসমীয়া নামে পৃথক ভাষার সৃষ্টি হইত না। অসমীয়া বন্ধুগণ আজ নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতবর্ষে যদি প্রাদেশিকতার তমোকাশে আচ্ছন্ন না হইয়া ভাবসমৃদ্ধ ও রসসমৃদ্ধ বাংলা ভাষার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে বাংলা ও আসামের সহযোগিতা কল্যাণ হইবে ইহাই আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস।

যোড়হাটে আমি বাঙালীদের নিজস্ব গৃহে ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেই, সেই সভার সভাপতি হিসাবে কবি বলেন—বাঙালীদের অসমীয়ার যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করা উচিত এবং অসমীয়ারা বাঙালীদের সংস্কৃতির যাহা প্রাণ তাহার আদর করিলে ভাল হইবে। আমি কবির এই ভাষণ সমর্থন করি। আসাম ও বাংলা বস্তুতঃ পৃথক দেশ নহে। উভয়ের সৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সভ্যতা পরস্পরের নিকট নানাদিক দিয়া ঋণী। ব্যবধান না বাড়াইয়া উভয়ের সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা উভয় দেশের কল্যাণ করিব।

কবি নীলমণি শিক্ষাব্রতী। তিনি বি, এ পাশ করিয়া আইন পড়িবেন, এমন সময় দেশমাতৃকার আহ্বান আসিল। ১৯১১ সাল হইতে বহুবর্ষ তিনি ডিব্রুগড় বর্ণ ইনষ্টিটিউশান নামক বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। তাহার পর আসামে শিক্ষা বিস্তারে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম নির্ব্বাহক সভার অন্যতম সভ্য। ১৯২১ হইতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি আসাম শাসন সভার সদস্য ছিলেন। সেখানে তিনি আপন বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া কীর্তিলাভ করেন।

আসামের বিখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রকান্ত আগরওয়ালা 'অসমীয়া' কাগজ প্রতিষ্ঠা করেন। নীলমণি এই প্রচেষ্টার অন্যতম কর্মী ছিলেন। তিনি 'দৈনিক বাতরি' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। অতঃপরতীত তিনি দুইখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনাও করিয়াছিলেন। সাংবাদিক সাহিত্যে তিনি যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

বাগ্মিতায় তিনি অপরাজেয়। নানা বিষয়ে নানা ক্ষেত্রে তিনি আপন অদ্ভুত বক্তৃতার শক্তি দেখাইয়াছেন। আসামে যে প্রাদেশিকতার উদ্ভব হইয়াছে অনেকে মনে করে তিনি তাহার উৎসাহদাতা। কিন্তু আসামীদের সর্ব্ববিধ উন্নতি হউক ইহা তাঁহার কামনার বিষয় হইলেও মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রশিষ্য নীলমণি বাঙালী-বিদ্বেষী নহেন, একথা নিঃসন্দেহ। আমার বক্তৃতা-সভায় সভাপতি হিসাবে তিনি যে চমৎকার ভাষণ দেন, তাহাতে তিনি এই প্রাদেশিকতার প্রসার এবং বাঙাল খেদা আন্দোলনকে সাময়িক বিবাদ ও বিরোধ বলিয়া বর্ণনা করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য ও মহিমার বোধকে শ্রোতৃবৃন্দের সঞ্চালিত করেন। আমি যে উদার সর্ব্ব-জনীনতার কথা বলিয়া ছিলাম, তিনি আন্তরিকতার সহিত তাহার সমর্থন করেন।

আসামের সাহিত্য-জগতে কবি নীলমণি ফুকন আপন স্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি দুইবার সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি সি, ই, এস ক্লাবের সভ্য এবং জয়পুরে অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক। কিন্তু নারীর মোহ তাঁহাকে বিচলিত করে নাই, তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী। ৬৫ বর্ষ বয়সের সময় তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জয়ন্তী উৎসব পালন করেন।

কবি আশাবাদী। তিনি চান আসামের অভ্যুদয়। আসামের প্রগতির চিন্তা তাঁহার সমস্ত চেষ্টায় দিয়াছে নূতন সুর ও প্রেরণা। তিনি গ্রামোন্নয়ন কর্মে বিশ্বাসী। তিনি চান সমবায়িতার পথে দেশের অভ্যুদয়। অধিকের ধনশোষণ তাঁহার মনে বেদনা দেয়। নিপীড়িত ও নিঃসহায়ের যদি শ্রীবৃদ্ধি হয় তবেই দেশের সমৃদ্ধি, এই বিশ্বাস তাঁহার কর্মে প্রেরণা জাগায়।

কবি নীলমণি বাংলাভাষা জানেন এবং রবীন্দ্রনাথের তিনি একজন ভক্ত। কবিগুরুর সাহিত্যরসে তাঁহার হৃদয় রসান্বিত। তিনি পশ্চিমের দৃষ্টিতে আপনাকে দেখেন না—তিনি ভারতের যে অধ্যাত্ম সত্তা তাহারই উপাসনা করেন। চিরসুন্দর ও চিরন্তনী এই বন্ধুর সহিত একদিনের পরিচয়মাত্র, তথাপি তাহা জীবনে অবিস্মরণীয় স্মৃতি হইয়া রহিবে।

কবি ফুকন সত্যকার সাহিত্যিক। সাহিত্যকলা নামক নিবন্ধপ্রন্থে তিনি লিখিতেছেন:—"জীবনর অমিতা বোলা বস্তুটো কি? এই অমিতা কোনো রকমর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নহয়। ই অতীন্দ্রিয় প্রাণর নির্ব্বাক নিস্পন্দ অবস্থাত পোওয়া এক গভীর অনুভূতি। এই অনুভূতির আত্মপ্রকাশর প্রয়াসতেই সাহিত্য আরু সুকুমার কলার উৎপত্তি। সাহিত্যই যেতিয়া অলঙ্কারর সাতসরী ধার পিন্ধি, সুন্দর নূপুর ধ্বনি বজাই, বিশ্ব বিমোহিনী রূপ ধরি দেখা দিয়ে, তেতিয়া সেই রূপত জগত মোহাক নহৈ আত্মহারা হয়। এই অবস্থাত ভোগের অবসাদ নাই, তৃপ্তির পরিপূর্ণতা আছে। এই প্রকাশ কল্পলোকর স্বপ্নরাজ্যত হলেও বাস্তব জগতের প্রতি অণুপরমাণুকে সি দীপ্ত করি তোলে। তারো প্রতিবিম্ব চিদাকাশত প্রতিফলিতাই যি এক রামধনুর সৃষ্টি করে; তার কমনীয়তা অবর্ণনীয়।"

কবি ফুকন তাঁর রচনার সর্ব্বত্রই এই রহস্যবাদী। ইন্দ্রিয়ের পিছনে যে অনির্ব্বচনীয় লোক তাহার রূপ রং ও রেখা কবিকে নন্দিত করে। তাহার রচনার ছত্রছত্র এই ভাবটি তিনি বিশদভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কবির "চির-সুন্দর" কবিতাটির মাঝে এইভাব রহিয়াছে।

হ'তে দেখো রূপ
ত'তে অপরূপ
হ'ই রেখা দিয়া
চির-সুন্দর;

সেই যে ঈমান
বিশ্ব-খনিত

সাধনা-বিকাশ

সৌন্দর্য্যের ?

শূন্য আকাশের

বিরহী নীলিমা

চক্ষেতে বেষ্টিয়া

তুলিকা তুমি :

সন্ধিয়া-সমস্ত

তপন-কিরণ

হেরুণ বরণ

ধ'ই যায় যামি ?

যাহা কিছু রূপ তাহার মাঝেই অপরূপ চিরসুন্দর আছেন—যাহা কিছু সাধনাময় তাহা তাহারই প্রকাশ, আকাশের নীলিমা তিনি—সন্ধ্যার অস্তরাগের বিসুঁশ বর্ণ তাহারই—এই মহাসৌন্দর্য্যরসে অনুপ্রাণিত হইয়া কবির দৃষ্টি ফুটিল। কবি গাহিলেন :—

হে চিরসুন্দর

বুঝিলো তুমি যে

প্রকাশিত হোয়া

রূপর অতীত ;—

প্রাণর দেবতা

আরাধি থাকিম

প্রাণর মাজত

হোয়া যেন স্থিত। ●

রূপাতীত চিরসুন্দর সমস্ত রূপের মাঝে প্রকাশিত, সেই রূপাতীত প্রকাশকে কবি দেবতারূপে স্বীয় অন্তরে ধ্যান করিবেন।

কবির অনেকগুলি পুস্তক গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক করিয়াছেন। কবি জ্যোতিকণার অনেকগুলি কবিতা আমাকে পড়িয়া শোনাইয়াছিলেন এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কবির নিকট মাত্র একখানি জ্যোতিকণা থাকায় এই পুস্তকখানি আমাকে দিতে পারেন নাই।

কবি তাঁহার প্রথম কাব্যসাধনার ইতিহাস আমাকে বলেন। তাঁহার সংবাদপত্র এক দিন ছাপা হইবে না—হাতে কাজ নাই বলিয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল তিনি কবিতা লিখিবেন—কলম ধরিলেন—কবিতা বাহির হইল। তিনি অনুভব করিলেন যে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মাধুর্য্যের পিছনে রহিয়াছে অপ্রাকৃত জ্যোতিকণা। তাঁহার রচনায় এই আলোর ইঙ্গিত তিনি নানাভাবে ফুটাইয়া তুলিলেন। সাহিত্যকলায় কবি

লিখিয়াছেন: —"উপনিষদের ঋষি সকলে এদিন কৈছিল তত্ত্বপর কিম? উত্তর পালে—'আনন্দম্'। আত্মার এটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য বোধ আছে বাবেই এই আনন্দ-বিহারের সৃষ্টি। মানবাত্মাতে সৌন্দর্য্যবোধ আছে বাবেই জগতখন ইমান সুন্দর, প্রতি কণ্ঠের সৌন্দর্য্যে একোখন বিচনী করি যৌ সঙ্গওয়ায়। মনোরাজ্যত সাহিত্যকলাই ইমান সুন্দর সুন্দর সৌধ তোলে। আধ্যাত্মিক জগতত পরমানন্দ—পদ স্পর্শ করি বৈ পাই আত্মাই তৃপ্তি লাভ করে।"

কবির মতে সাহিত্যই জাতির দর্পণ। বিশেষ দেশের বিশেষ পরিবেশে সাহিত্য আপনাকে বাড়াইয়া তোলে। সেই দেশের জলে সাহিত্য পুষ্ট হয়। সেই দেশের হাওয়া-পানি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে।

আসাম ও বাংলার ঐক্য ও যোগের কথা কবির সহিত আমার আলোচনা হইয়াছিল। কবি আমার মতে মত দেন নাই। তিনি অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। তাঁহার মতে অসমীয়া ও বাংলা উভয়েই সংস্কৃতমূলক। কিন্তু উভয়ের ধ্বনি রীতি বিভিন্ন, শব্দযোজনা, ব্যাকরণের বিভিন্নতা, বর্ণভেদ, অলঙ্কার ও রীতির ব্যবধান আছে।

কবির একথা স্বীকার করি—কিন্তু তথাপি আমার একান্ত অল্প পরিচয়েও এই ভাব মনে হইয়াছে অসমীয়া ও বাংলার স্বাতন্ত্র্য অত্যধিক নহে। অসমীয়াকে বাংলার একটী প্রাদেশিক রূপ বলিয়া মনে হয়। চট্টগ্রামের বাংলা আর বীরভূমের বাংলা এক নয়। যদি বৃটিশশাসকগণ ভেদনীতির সম্প্রসারণ না করিতেন তবে আসাম ও বাংলা এক ভাষাভাষী হইত।

ভবিষ্যতে ইহা বোধহয় আর সম্ভব হইবে না। আসামে অসমীয়া ভাষার প্রতি অত্যধিক প্রীতি জাগিয়াছে। প্রাদেশিক বচনরীতিকে নবপ্রতিভাসম্পন্ন কবি ও লেখক সাহিত্যে রূপ দিতেছেন, ইহাতে উভয় ভাষার স্বাতন্ত্র্য দৃঢ় হইয়া দিনে দিনে ব্যবধান রচনা করিতেছে। কাজেই অসমীয়া ও বাংলা ভাষার মিলন সম্ভাব্য বলিয়া মনে করা যায় না। তথাপি উভয় প্রদেশের লোকের পরস্পর যোগ ও প্রীতি থাকিলে উভয়ের কল্যাণ এই কথাটি আমাদের বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রচার করা উচিত।

কবিবন্ধু নীলমণির সমগ্র পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তাঁহার বিষয় অধিক জানি না—কিন্তু একটী মধুময় দিনের সংলাপ, প্রীতি ও মাধুর্য্য কখনই ভুলিব না।

কবির উদারতা প্রশংসনীয়। আমার আত্মীয় বোড়হাটের সর্ব্বজনপরিচিত ডাক্তার সুধাংশুকুমার মজুমদার সংসঙ্গী। তিনি বোড়হাটে সৎসঙ্গের এক অধিবেশন করান। কবি আপন উদারতায় সেই অধিবেশনে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা দেন। পূর্ব্ববর্ত্তীকে অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তীর আবির্ভাব। পরবর্ত্তী নূতন নহে—তিনি পূর্ব্বগের পরিণতি, এই তথ্যটি তিনি বিশেষভাবে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে প্রকটিত করিয়া পবিত্র জীবন যাপনের জন্য সকলকে উদ্যোগী হইতে বলেন।

কবি জোড়হাটের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—'দুর্দিনের কালিমা কেটে হইয়া যাইবে এবং আসামী ও বাঙালীর বন্ধুত্ব দীপ্ত ও উজ্জ্বল হইয়া রহিবে। আজ প্রাদেশিকতার কৌণিকতা যখন আসামে বিষবাষ্পের সৃষ্টি করিতেছে সেদিন নিকট প্রতিবেশী এই দুই দেশের অধিবাসীকে এই একান্ত ঐক্য ও প্রীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেই।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—কবি শতায়ু হইয়া নব নব ভাবধারায় অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন। তাঁহার সাহিত্য আত্মজ্ঞান চিন্তামণির স্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া আসামকে ভারতীয় পুরাণী প্রজ্ঞার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান করুক। তিনি আসামকে বিরাম-বিহীন প্রগতির পথে অভিযাত্রী হইতে উদ্বোধিত করুন।

দৃষ্টি-শক্তি :—

জগৎ খ্যাত চার্লি চ্যাপলিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করছেন। একটা মাছি কোথা থেকে বার বার চার্লির গায়ে এসে বসছে। কিছুতেই তাকে তাড়াতে না পেরে চার্লি একটা লোহার খোন্তা নিয়ে প্রস্তুত রইলেন, এবার মাছিটা এলেই তাকে বধ করবেন।

কিছুক্ষণ পরেই আবার মাছিটা তাঁর সামনে চেয়ারের হাতলের ওপর এসে বসলো। চার্লি মাছির দিকে নজর রেখে সন্তর্পণে ধীরে লোহার খোন্তাটা তুললেন কিন্তু মারতে গিয়ে, আর মারতে পারলেন না। খোন্তাটা সরিয়ে নিলেন।

একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো, কি, মারলে না যে?

চার্লি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, মারতে গিয়ে দেখলাম, ও-টা অন্য মাছি···আগেরটা নয়!

—o—

বাংলার নব-জাগরণের স্নাত

পরিশিষ্ট-অংশ

বর্ত্তমান বৎসরে শারদীয়া গল্প-ভারতী গ্রন্থে আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটী বিশেষ উদ্যোগ করি, আজিকার যুগের তরুণ-তরুণীদের নিকট বাংলার স্বর্ণ-যুগের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়া ধরিবার জন্য। বাংলার সাধনা ও সংস্কৃতি, বাংলার ঐতিহ্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আজ আমাদের একান্তভাবে সচেতন হইতে হইবে, নতুবা আমাদের সামনে যে মহাদুর্ভিক্ষ মুখব্যাদন করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহাকে কিছুতেই রোধ করিতে পারা যাইবে না। অন্ন ও বস্ত্রের দুর্ভিক্ষের চেয়ে শতগুণ মারাত্মক, জাতির এই মানসিক দুর্ভিক্ষ, একথা আজ আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে। সমগ্র জাতি আজ চরিত্রহীন হইয়া যাইতে বসিয়াছে, তাই আজ স্বাধীনতা পাইয়াও সে তাহা উপভোগ করিতে পারিতেছে না। কোন আইনের সাহায্যে জাতির এই মানসিক দৈন্য দূর করা সম্ভব নয় এবং জাতির এই মানসিক দারিদ্র্য দূর না করিলে, তাহার বাহিরের দারিদ্র্যও ঘুচিবে না, ইতিহাসের এই মহাসত্যকে আজ স্বীকার করিয়া লইয়া আমাদের

শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাকে অগ্রসর হইতে হইবে। নিজেদের বিরাট ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, কি বিরাট উত্তরাধিকারীর মালিক আমরা—সে-সম্বন্ধে নিজেদের চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলা, ইহাই হইল এই মানসিক দৈন্য দূর করিবার প্রথম উপায়। সেই উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা গল্পভারতীর পূজা-গ্রন্থে দেশের বিশিষ্ট কৃতী পুরুষদের সাহায্যে বাংলার নব-জাগরণ-যুগের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করি। এখনও পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে এমন অনেকে জীবিত আছেন, যাঁরা বাংলার সেই নব-জাগরণযুগের নায়কদের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যেই সেই অতি-নিকটবর্ত্তী স্বর্ণ-যুগের বহুকথা বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে, ইহার অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কিছুই নাই। এখনও চেষ্টা করিলে, সেই বিরাট সাধনাকে আবার অবলুপ্তির হাত হইতে উদ্ধার করা যায়। পূজা-গ্রন্থে আমরা তাহারই আয়োজন করি। স্থানাভাবে এবং সময়ের অভাবে পূজা গ্রন্থে সকলের কথা আমরা প্রকাশ করিতে পারি নাই। তাই শ্যামা-পূজা উপলক্ষে তাহার পরিশিষ্টস্বরূপ অবশিষ্ট স্মৃতি-কাহিনীগুলি এখানে সন্নিবেশিত হইল।

একথা আমরা বিশেষভাবে জানি আমাদের এই আয়োজন, ইহা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই। সেই বিরাট আন্দোলনের বহু কথা এবং বহু স্মৃতিই অলিখিত রহিয়া গিয়াছে। তবে আমাদের ভরসা, হয়ত এই ভাবেই এক প্রদীপের শিখা হইতে অন্য বহু প্রদীপের শিখা জ্বলিয়া উঠিবে, বাঙালী সাহিত্যিক এই মহৎ দায়িত্ব পালনে তাঁহাদের সমগ্র শক্তি সজাগভাবেই প্রয়োগ করিবেন। নূতন আর এক জাগরণের পর্ব্ব হয়ত এইভাবে অচিরকালের মধ্যেই দেখা দিবে। তাহার পদ-ধ্বনি কাণে আসিয়া লাগিতেছে।

আজ আমাদের জাতীয় জীবনের ধারা ম্লানগতি হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে ভূমির দাবীর প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজন হইয়াছে আমাদের অন্তরলোকের শূন্যতাকে ভরাট করিয়া তোলার। রাজনৈতিক আন্দোলনের আপাত প্রয়োজনীয়তার কোলাহলের মধ্যে অন্য আর সব প্রয়োজনীয়তার কথা নিঃশব্দে তলাইয়া গিয়াছে...যেন রাজনীতি ছাড়া জীবনে আর কিছুই নাই। এই শূন্যগর্ভ রাজনীতির গণ-উন্মাদনা হইতে জাতির সংস্কৃতিকে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রথম সাক্ষাতে

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতার এক আদালতে পুলিশের ডেপুটী কমিশনর সামসুল আলম নিহত হন। খবরটী ২৫শে জানুয়ারী দৈনিক জাতীয় পত্রিকাগুলিতে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ হয়। বাংলার বিপ্লবী-মনোবৃত্তিপরায়ণ লোকেরা আনন্দ প্রকাশ করেন। যাঁহারা যথার্থ বিপ্লবী তাঁহাদের সত্যই সেদিন আনন্দের অবধি ছিল না।

মানিকতলার বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিলাভ করিয়া দুইখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। একখানি বাংলা 'ধর্ম্ম' আর একখানি ইংরাজী 'কর্ম্ম-যোগিন'। ৺রামচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ কয়েকজন তরুণ তাঁহার সহকারী ছিলেন। সামসুল আলমের হত্যাকারী পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে ধর্ম্ম অফিসে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে এই কর্ম্মে শ্রীঅরবিন্দ সংলিপ্ত আছেন বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করেন, এবং শীঘ্রই তাঁহাকেও ধৃত করা হইবে। সংবাদটী নিষ্টার নিবেদিতা প্রথম পাইয়াছিলেন এবং তিনি এই কথা শ্রীঅরবিন্দকে জানাইয়া তাঁহাকে আত্মগোপন করিতে পরামর্শ প্রদান করেন।

শ্রীঅরবিন্দ কালবিলম্ব না করিয়া আহিরীটোলার ঘাটে এক পানসি ভাড়া করিয়া চন্দননগরে আগমন করেন। ৺রামচন্দ্র চৌধুরী এই কর্ম্মে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আসেন শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ওরফে মনি আর শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। তাঁহারাই শেষপর্য্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের এই অনির্দ্দিষ্ট যাত্রার সঙ্গী হন।

এইবার আমার কথা।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি। এবার সরস্বতী পূজা মাঘ মাসের গোড়ার দিকেই হইয়া যায়। ৺চারুচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে আমরা তখনীন্তন কয়েকজন বিপ্লবী সার্ব্বজনীন সরস্বতী পূজার আয়োজন করি। চারুচন্দ্র রায় আলিপুর বোমার মামলা হইতে মুক্তি পাইয়া সাধারণ কর্ম্মে এই প্রথম অগ্রসর হন। আমরা ৺চারুচন্দ্র রায়কে নেতৃরূপে পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ি। ৺কানাইলাল ছিল তাঁর প্রধান শিষ্য। কানাইলালের সহিত তাঁহার গভীর পরিচয়ের কথা পুলিশের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি মামলায় মুক্তি পাইয়াও বিশেষ সতর্কতার সহিত কালযাপন করিতেন। আমরা চাহিতাম পূর্ব্বের ন্যায় বিপ্লব-কর্ম্মে তাঁহার নেতৃত্ব; তিনি কিন্তু সর্ব্বদাই তাহা হইতে বিরত থাকিতেন। সেইজন্য আমাদের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। কিন্তু

সরস্বতী পূজার কাজে তিনি অগ্রণী হওয়ায় আমাদের আনন্দেরও পরিসীমা ছিল না। যদিও এই উৎসব শিক্ষাসম্বন্ধীয় হওয়াও এই ঘটনার সূত্র ধরিয়াই আমরা পুনশ্চ বিপ্লবের কর্মে তাঁহার নেতৃত্ব লাভ করিব, এই আশাও আমাদের হইয়াছিল। শুনিতে পাই, আমাদের এই সারস্বত উৎসবের কথা শুনিয়া কলিকাতার কোন কোন বিপ্লবী নেতা মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, চারুচন্দ্র অতীতের উপর চুনকাম করিয়া পুলিশের সন্দেহ হইতে মুক্তির পথ বাহির করিতেছেন। অবশ্য আমরা এই প্রলাপে কর্ণপাত করি নাই।

শ্রীঅরবিন্দ পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসরণ করিয়া চন্দননগরে উপনীত হন; এবং অতি প্রত্যূষে চারুচন্দ্র রায়ের নিকট শ্রীসুরেশচন্দ্রকে পাঠাইয়া দেন। শ্রীঅরবিন্দের ভরসা ছিল, চারুচন্দ্র নিশ্চয় তাঁহার আত্মগোপনে সুব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু চারুচন্দ্র শ্রীসুরেশচন্দ্রকে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন এখানে অরবিন্দের স্থান হইবে না। আত্মগোপন করার মত স্থানের অভাব কলিকাতায় নাই। সুরেশচন্দ্র ভগ্ন-মনোরথ হইয়া নৌকায় ফিরিয়া শ্রীঅরবিন্দকে এই কথা জানাইলে তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে নলিনী গুপ্তের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া রহিলেন।

আমার আজিও স্বভাব প্রাতঃকৃত্যাদির পর গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করা। আমি বাড়ীর বাহির হইবা-মাত্র বাংলার সর্ব্বজন-পরিচিত বিপ্লবী ৺শ্রীশচন্দ্র ঘোষ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীশচন্দ্রের উন্নত দেহযষ্টি, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল, কৃষ্ণবর্ণ দেহকান্তি যে দেখিয়াছে সেই তাহার মাধুর্য্য অনুভব করিত। শ্রীশচন্দ্র চিরদিন প্রসন্ন চিত্তেই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত। তাহার মিষ্ট স্বভাব ছিল মানুষকে প্রলুব্ধ করার মহা-অস্ত্র। ভিতরে ছিল আতঙ্কত্রাণ-বিনাশের সুকঠোর উদ্যতবুদ্ধি। সে যাহা সঙ্কল্প করিত তাহা হইতে তাহাকে বিরত করার সাধ্য কাহারও হইত না। মানিকতলার বোমার দুর্গ তাঙ্গিয়া পড়িলে চন্দননগরে যে বৈপ্লবিক সংহতি গড়িয়া উঠে শ্রীশচন্দ্রকে তাহার একজন প্রধান নায়ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীশচন্দ্র স্বভাবহাস্যে বলিল, আপনি তো গঙ্গাতীরে ভ্রমণে বাহির হইতেছেন, কলিকাতায় সানসুল আলম নিহত হইয়াছেন। আর তার চেয়েও বড় সংবাদ শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে আসিয়াছিলেন আত্ম-গোপন করার জন্য, কিন্তু আশ্রয় না পাইয়া তাঁহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে।

আমি স্তম্ভিত হইয়া শ্রীশচন্দ্রের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমার কেহ নহেন কিন্তু এই সংবাদে তাঁহার জন্য আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। আমি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক ইংরাজ সওদাগরের অফিসে চাকুরী করিতাম। সজীবনীর পর হিতবাদী পড়িয়া প্রচুর দেশপ্রীতি সঞ্চয় করিতাম। অন্যদিকে যুগান্তরের অগ্নিগর্ভ লেখাগুলি পড়িয়া ইংরাজ-বিতাড়নের প্রেরণাও পাইয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের বন্দেমাতরম মনের খোরাক জোগাইত। তাঁহার বন্দীকাল হইতে প্রতিদিন সংবাদপত্রের সাহায্যে তাঁহার চিন্তায় চিত্ত ভরিয়া থাকিত। ৺মৃণালিনী দেবীকে লিখিত পত্র তিনখানির সাহায্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন আদালতে শ্রীঅরবিন্দের মর্ম্ম পরিচয় ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহিত যুক্তির অপার্থিব আকর্ষণ অনুভব করিতাম। শ্রীঅরবিন্দের সহিত সম্মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আমি একপ্রকার উন্মাদ হইয়াই থাকিতাম। শ্রীঅরবিন্দের শুধু নাম শুনিয়াই ক্ষান্ত নাই, তাঁহার রূপ দেখিয়া তাঁহার সহিত

মিলনের প্রতীক্ষা করিতাম। তাঁহাকে একবার মাত্র দেখি চুঁচুড়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভায়। ফরিদপুরের ৺অম্বিকাচরণ মজুমদার এই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন একদল তরুণের সহিত। তরুণেরা গান গাহিতে গাহিতে সভাক্ষেত্রে যখন শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া আসিলেন তখন 'কর্ম্মযোগীন' ও 'ধর্ম্মের' ঋষি শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলাম।

শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে আসিলেন। তাঁহাকে সংগোপনে রাখার স্থানাভাব হইল—এ ব্যথা আমি অসহ্য মনে করিলাম। শ্রীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এখন প্রায় ৭টা। অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে শ্রীঅরবিন্দ চারুচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। চারুচন্দ্র স্থান দিতে অস্বীকার করায় সম্ভবতঃ তিনি অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

আমার মুখে বাণী সরিল না। শ্রীশচন্দ্রকে বিদায় দিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সূর্য্য দিকচক্রবাল হইতে অনেকখানি উপরে উঠিয়া অজস্র কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। উদ্ভাসিত গঙ্গাবক্ষে অনেক নৌকাই দক্ষিণা বাতাসে পাল তুলিয়া উত্তরের দিকে চলিয়াছে। আমি একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। স্বভাবতঃই নয়ন মুদিত। নির্দ্দেশ পাইলাম—উত্তরে নহে, দক্ষিণ দিকে চল—তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। আমি চিরদিন গঙ্গাতীরে উঠিয়া উত্তর দিকেই কিছুক্ষণ বিচরণ করি, আজ দক্ষিণ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গঙ্গাতীর বাহিয়া অগ্রসর হইলাম। অনেকগুলি খাল পার হইতে চরণ কর্দ্দমাক্ত হইল। জ্ঞানশূন্য আমি। কে যেন আমায় টানিয়া লইয়া যায়।

অর্দ্ধ মাইল দূরে চন্দননগরের প্রসিদ্ধ রানীর ঘাটে আসিয়া গতি স্তব্ধ হইল। অদূরে গঙ্গাবক্ষে দেখিলাম একখানি ভাউলিয়া নোঙ্গর করা রহিয়াছে। ছাদে একজন উপবিষ্ট। ভিতরে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ হইল। কি জানি কেন চিৎকার করিয়াই তাঁহাকে বলিলাম, "এই নৌকায় কি শ্রীঅরবিন্দ আছেন?"

মাঝিদের বলিয়া তরুণ তীরে তরণী ভিড়াইলেন। তারপর আমাকে বলিলেন, "নৌকায় উঠিয়া আসুন, কথা হইবে।"

নৌকায় উঠিয়া দেখিলাম—পূর্ব্বদৃষ্ট সেই মহাপুরুষ নলিনীর কোলে অর্দ্ধশায়িত। তিনি আমায় নিকটে ডাকিয়া বসিতে বলিলেন। পরিচয় হইল। পূর্ব্বে তাঁহার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল না, কেবল নাম শুনিয়াছি; দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি অতি-পরিচিতের স্বরে আমায় বলিলেন—"তোমার বাড়ী কত দূরে?"

তিনি উত্তর শুনিয়া পুনরায় বলিলেন—"তুমি কি আমায় কিছুদিন লুকাইয়া রাখিতে পারিবে?"

কে জানিত সেদিন লুকাইয়া রাখার ছিল শ্রীঅরবিন্দ প্রথম দিলেন আমায়! আত্মগোপনকারী বিপ্লবী বন্ধুরা আমার বাড়ীতে নিরাপদে ভবিষ্যতে স্থান লইয়াছে—শ্রীঅরবিন্দ দিলেন এই শিক্ষার হাতে-খড়ি।

বহু স্নানার্থি ঘাটে ঘাটে ভীড় করিয়াছে। পল্লীবাসীদের অপরিচিত আমি নহি। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন তাঁহাকে লুকাইয়া রাখার কথা। অতি গোপনেই তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইবে, যতদিন থাকিতে চাহি

তাহার ব্যবস্থা গোপনেই রাখিতে হইবে। আমি আঘাটায় আসিয়া নৌকা বাঁধিতে বলিলাম। একদিকে চন্দননগরের বিখ্যাত আইল দে রোড। অন্যদিকে শ্মশান। মধ্যপথ দিয়া একটী পোড়ো উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। সে উদ্যানে কয়েকটী ভগ্নগৃহ আর চারটী প্রাচীন শিব মন্দির। ভূতের ভয়ে সে বাগানে কেহ আসে না। শুষ্ক পত্রের উপর দিয়া আমরা কয়েকটী প্রাণী পথে আসিয়া পড়িলাম। তারপর গলি পথে প্রবেশ করিয়া স্ব-ভবনে তাঁহাকে আনয়ন করিলাম। তিনি একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া তরুণদ্বয়কে সহাস্যে বলিলেন—"তোমরা তার বাড়াইও না, আমি আমার নিজের মানুষের নিকটই আসিয়াছি।" সুরেশচন্দ্র ও নলিনী আমার মুখের দিকে চাহিল। এই চাওয়ার সূত্র ধরিয়াই হৃদয়ের বাঁধন এমনই শক্ত হইয়া গিয়াছে যাহা কেহই আর ছিঁড়িতে পারে না। ইচ্ছা করিলেও সে বাঁধন ছিন্ন করা আমার সাধ্যেও বুঝি নাই।

তারপর শ্রীঅরবিন্দ—আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত দেবতার চরণে প্রণত হইয়া দিনের পর দিন ধর্ম্ম, অর্থ, সমাজ ও রাষ্ট্রের—শিক্ষা ও সাধনা পাইলাম। আমার অতীত জীবনের সর্ব্বপ্রকারের সাধনার সমাপ্তির মন্ত্র তিনি আমায় প্রদান করিলেন। ইহার পর হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র-বিপ্লবের যে সুদীর্ঘ ইতিহাস তাহার রচয়িতা শ্রীঅরবিন্দ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমি হইয়াছিলাম উপলক্ষ্য। বস্তুতন্ত্র—তন্ত্র-সাধনার পর যে বেদান্তের সিংহ-গর্জ্জন আচার্য্য মহেন্দ্রের কণ্ঠে উঠিয়াছিল তাহার মর্ম্ম পরিচয় লাভ করিয়াই ভারতের অমর সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া জাতি-গঠনের পথে আমি আমার আত্মনিয়োগ করিলাম। দূরে—বহু দূরে—বহুদিনের ব্যবধানে তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়াছি যে লক্ষ্যে—তাহা যদি সিদ্ধ হয় তবেই এই চলা সার্থক হইবে। বাঙ্গালীর মন্ত্রদাতা সে যুগের শ্রীঅরবিন্দ। দেশ ও জাতির মর্ম্ম তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াই বাঙ্গালী জাতিকে অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। আজও আমাদের সেই পথই অনুসরনীয়।

মুক্তি-সাধনা

"আমার ধারণা, ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস, জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। • •বাঙালী শক্তি-সাধনা ছেড়ে দিয়েছে তাই শক্তিও তাকে ছেড়েছে। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নেই, সেখানে প্রেমও থাকে না। সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। • • সাথ সাথ শিষ্য চাই না, একশো ক্ষুদ্র আত্মিষশুক্ত পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপ যদি পাই, তাই যথেষ্ট। • •দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈরী হয় নি বলে নয়, আমি তৈরী হই নি বলে।"

শ্রীঅরবিন্দ

অর্দ্ধ শতাব্দীর জয়-গৌরব

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, যেদিন বাংলা দেশ প্রথম বিদেশী বর্জনের মন্ত্র গ্রহণ করে, সেদিন আমরা অন্তর দিয়ে সেই মন্ত্রকে জাতির জীবনে সার্থক করে তোলবার জন্যে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি।

এই দেশের জল-হাওয়ায়, এই দেশের প্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের [illegible] করে, বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে, দেশের স্বাস্থ্য ও শক্তি বর্ধনের জন্যেই আমরা আয়ুর্বেদোক্ত প্রণালী নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করে, দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতের এই বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি।

আজ এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত ঔষধ, শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতবর্ষের বাহিরে বিশ্ব-জগতেও আয়ুর্বেদের মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

তাই সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ ভারত-নায়কগণ প্রত্যক্ষভাবে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য-কারিতা পরিদর্শন করে সন্তোষ তাঁদের শুভাশিস্ দিয়ে ইহাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

শক্তি ঔষধালয়

ঢাকা

গ্রাহক ও জনসাধারণের সুবিধার জন্য আমরা সম্প্রতি চন্দননগরে একটী কারখানা খুলিয়াছি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন রায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে সব মনীষী বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, পুণ্যে প্রতিভায়, এবং ত্যাগে ও সেবায় বাংলাকে গৌরবমণ্ডিত করে গেছেন, প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। তাঁদের বাণী ও চিন্তাধারা বাংলার ঘরে ঘরে,—শুধু বাংলা কেন—ভারতের সর্ব্বত্র গেছে কল্যাণের বীজ ছড়িয়ে। তরুণ জীবনের অনুকূল আবহাওয়ায় অঙ্কুরিত হয়ে কালে কালে এরা পত্র পল্লবে, ফুলে ফলে সুশোভিত বিশাল তরুতে পরিণত হবে, তারই ছায়াতলে ক্ষুধা-ব্যাধি দুঃখ-দৈন্য নিপীড়িত বহু নরনারী আশ্রয় নিয়ে শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করবে। মহাপুরুষেরা মরিয়াই তাই অমরত্ব ও প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করেন। জীবদ্দশায় তাঁরা আমাদের বিতরণ করে গেছেন তাঁদের মহাপ্রাণের মানুষিক প্রেম, মৃত্যুর পর তাঁরা প্রজ্বলিত করে যান আমাদের প্রাণে দেবতার করুণা, দেহের অবসানে তাঁদের বাণীর অবসান হয় না; বরং উচ্চ হতে উচ্চতরে এবং দূর হতে দূরতরে তা পরিব্যাপ্ত হয়ে আমাদের দেয় ধর্ম্মে দীক্ষা, কর্ম্মে প্রেরণা ও জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা। তাই আজ প্রফুল্লচন্দ্রের কথা স্মরণ করবার আবশ্যকতা আছে। দেশব্যাপী দুর্য্যোগ, দুর্নীতি, হিংসাদ্বেষ ও অভাব অনটনের মধ্যে একমাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের মত মনীষিগণের জীবনী ও বাণী অন্ধকারে আলোর মত আমাদের পথ দেখিয়ে দেবে।

দেহ এবং মন নিয়ে মানুষ গড়ে ওঠে; আসল মানুষটি বাসা নেয় মনে। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে সে তার কল্পনা, আশা, সাধনা ও জ্ঞানকে দেয় রূপ। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন আমরা তা পরিচয় পাই তার বাক্যে, দৃষ্টিতে, চাল চলনে ও তার বিবিধ কর্ম্মকুশলতায়। দেহের অবসানে তাই সে মানুষ বাসা নেয় আমাদের মনে স্মৃতি হয়ে।

তাই প্রফুল্লচন্দ্রকে স্মরণ করতে হ'লে তাঁর চালচলন, অবয়ব, তাঁর দৃষ্টি ও তাঁর বাক্যের আলোচনা করতে হয়। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯০৬ ইংরাজীতে প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর শিষ্যরূপে। মফঃস্বল হ'তে এসে বি এ ক্লাসে ভর্ত্তি হই। ছেলেবেলা হ'তে শুনে এসেছি ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম। ভারতবর্ষের দুটি বিখ্যাত বিজ্ঞানী, যাঁদের কীর্ত্তি শুধু ভারতে নয়, সুদূর বিলাতেও ছড়িয়ে গেছে। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী বিলাতে সম্মান লাভ করেছে এ ভেবে কত গৌরব অনুভব করতাম। তাই প্রথম দিন তাঁর ক্লাসে উপস্থিত হয়ে তাঁর দর্শনপ্রতীক্ষায় ছিলাম। মনে মনে এত বড় বিজ্ঞানীর কত ছবি এঁকেছিলাম এডিনবরা হতে বিজ্ঞানের উচ্চ উপাধি নিয়ে এসে রসায়ন বিদ্যার গবেষণা করে নাম করেছেন। তখনকার দিনে বড় লোক বলতে যা বুঝতাম তারই অনুকরণে মনে মনে তাঁর প্রতিকৃতি গড়েছিলাম। কিটকাট সাহেবী ধরণের পোষাক, ইংরাজী ভাষা ভিন্ন বাংলায় কথা বলেন না, ভয়ে ভয়ে দেখা করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়, বসবার ঘরে বিনা কার্ডে প্রবেশ করা যায় না, এবং ঘরের সামনে সদাসর্ব্বদা তক্মা আঁটা চাপরাশী পাহারা দিচ্ছে,

ইত্যাদি বড়ত্বের আনুষঙ্গিক আরো কত কি অনুমান করে নিয়েছিলাম। প্রথম পরিচয়েই আমার সকল ধারণাই গেল ওলটপালট হয়ে। ক্ষীণকায়, উচ্চমুণ্ডো, রোগা, অনাড়ম্বর সাজ পোষাক, অর্দ্ধ মলিন ধেনী সস্তাদরের মযমাযতী ছিটের গলাবন্ধ কোট পেন্ট, কদাসীকেশনে অযত্নে কাটা দাড়ি, কানে ঝোলান একটি পকেট ঘড়ি,—এ হ'ল আমার কাল্পনিক প্রফুল্লচন্দ্রের বাস্তব জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! আমার কথা বলছেন সব সময়েই বাংলায়; এমন কি বক্তৃতার সময়ও অর্দ্ধেক কথা বুঝিয়ে দেন বাংলায়। পড়াবার সময় কত প্রকার হাসি ঠাট্টা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক দুর্ব্বলতা এবং কুসংস্কার নিয়ে। তাঁর চিত্তাকর্ষক, রসসহল ও সারগর্ভ বক্তৃতা শুনবার জন্য ক্লাস ঘরে রীতিমত ভিড় জমে যেত, বহু যন্ত্রপাতি দ্বারা নানাবিধ রাসায়নিক পরীক্ষা দেখিয়ে, হাস্য কৌতুকে রসাল করে, রসায়ন বিজ্ঞানের নীরস কঠোর তথ্য এবং তত্ত্বগুলিকে সহজ এবং মনোজ্ঞ করে বুঝিয়ে দেবার কি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর! শিক্ষকের অনুপ্রাণিত করবার জন্য রসায়ন বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক বড় বড় বিজ্ঞানীদের অপূর্ব্ব জীবনকাহিনীর বর্ণনা করাও তাঁর অধ্যাপনার ছিল একটি বিশেষত্ব। রসায়নের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ। তাই ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞান সমাজে তিনি রসায়নের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলে সম্মান লাভ করে এসেছেন। প্রাচীন রাসায়নিক গুরুদের জীবন-চরিত বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত জার্ম্মান রাসায়নিক তোলার জার্ম্মানী হতে পদব্রজে সুইডেনে যান, প্রবীন সুইডিস রাসায়নিক বার্জিলিয়াসের নিকট রসায়ন শিক্ষার জন্য। তখনকার যুগে বার্জিলিয়াস ছিলেন রসায়নবিজ্ঞানে একপ্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। বার্জিলিয়াসের পরীক্ষাশালা ছিল তাঁর গৃহের একটী ক্ষুদ্র অংশে; এবং তাঁর রাসায়নিক পরীক্ষার সহকারী ছিল—তাঁর রান্নাঘরের পরিচারিকা এনা। তীর্থযাত্রীর মত পরিশ্রান্ত তোলার দীর্ঘকাল ভ্রমণের পর বার্জিলিয়াসের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হন। তোলার দ্বারে এসে যখন ঘন্টাধ্বনি করলেন, দুজনার বার্জিলিয়াস নিজে এসেই দ্বার মুক্ত করেন। প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যাপনা কালে এঘটনাটি আমাদের ক্লাশে এমন জীবন্তভাবে অভিনয়ের মত বর্ণনা করেন যে তাঁর তখনকার অঙ্গভঙ্গী এখনো আমার মনে ছবির মত আঁকা রয়েছে। বার্জিলিয়াসের দরজায় ঘন্টাধ্বনি করবার সময় তোলারের মনে কি যে শ্রদ্ধা এবং পূজার ভাব জেগে উঠেছিল, এবং তার হৃৎপিণ্ড কিরূপ ভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল এসবই প্রফুল্লচন্দ্র পাকা অভিনেতার মত আমাদের নিকট অনুকরণ করে দেখাতেন। এরূপ সজীব স্পর্শের দ্বারা বিজ্ঞানের পাঠগুলিকে তিনি আমাদের নিকট প্রাণস্পর্শী করে তুলতেন। অধিকাংশ সময়েই এসব কাহিনীর বর্ণনা হোত বাংলাতেই। কোন কোন দিন ক্লাশে পড়াবার সময় আমাদের সামাজিক কুসংস্কার —যেমন জাতিভেদ, বালবিবাহ, পণপ্রথা, অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি করতেন। আধুনিক হিন্দুসমাজ গরুকে দেবতার স্থানে আসন দিয়ে থাকে, কিন্তু কলিকাতা সহরে সেই দেবতাস্থানীয় গাভী ও গোবৎসের উপর গোয়ালারা দাতের জন্য যে অমানুষিক অত্যাচার করে তা নিয়ে হিন্দুসমাজের উপর তাঁর কটাক্ষ ছিল কঠোর; এবং প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ যে নিষিদ্ধ ছিল না, তার প্রমাণ স্বরূপ "বৎসতরঃ মর্ষভায়তে" ইত্যাদি শ্লোক আমাদের শুনতে হোত পাঠের মত ঘাড় গোড়ালে তা অধ্যায় এবং ব্যাসসিয়াস কস্‌কে নামক সবগে পরিণত হয়। সে অধ্যায়ে এবং কাঠকয়লায় কোন প্রভেদ থাকে না। এ রাসায়নিক সত্যটি বোঝাবার সময় তিনি অনেক সময় খানিকটা

ঘাড় গোঁজান অভ্যাস নিজের মুখে নিক্ষেপ করে বলতেন, "হিন্দুসমাজে এমন সব কুসংস্কার এখনও প্রচলিত আছে যে ঘাড়ের কবলার সাহায্যে তিনি পরিষ্কার করা হয় বলে, অনেক নৈষ্ঠিক হিন্দু তিনিকে অশুদ্ধ ও অস্পৃশ্য মনে করে থাকেন।" আমাদের এসব অজ্ঞানতার জন্য যে সমাজে এখনো বহু কুসংস্কার চলতি রয়েছে এবং তার ফলে যে অনেক সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে—এ ছিল তাঁর বিশেষ করে বলবার কথা। তিনি বলতেন—এসব কুসংস্কারের মোহ হতে আমাদের বুদ্ধিকে মুক্ত করতে হবে বিজ্ঞানের সাহায্যে। আবার কোন কোন দিন রবীন্দ্রনাথের রচনা হতে "বালিকা বধূ" নামক কবিতাটি পাঠ করে শুনাতেন, এবং বিয়ের বাজারে আমাদের অভিভাবক কি ভাবে আমাদের বিক্রী করবার জন্য চেষ্টা করছেন সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা। রাসায়নিক তত্ত্ব সহজ ব্যাখ্যা করবার সময় আমাদের দৈনন্দিন জীবন হতে অনেক সহজ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা ছিল তাঁর অধ্যাপনার বিশেষত্ব। এখনও মনে পড়ে রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগের প্রণালী সহজ এবং সরল করে বোঝাবার জন্য তিনি বলতেন 'মনে কর রামভাব তোমরা দুই বন্ধু সন্ধ্যাবেলা গোলদিঘীতে হাতাহাতি করে বেড়াচ্ছ; এমন সময় বদু যাচ্ছিল তোমাদের পাশ দিয়ে। রামের সঙ্গে বদুর খুব ভাব। তখন রাম তাদের হাত ছেড়ে বদুর সঙ্গে জুটে পড়বে; এবং শ্যাম বেচারীর অবস্থা হবে—Separation বা বিরহ। এখানে বদুর রাসায়নিক আকর্ষণে রাম শ্যামের মধ্যে ঘটল বিয়োগ, এবং রাম বদু ঘটল সংযোগ।"

মাতৃভাষার উপর ছিল তাঁর বিশেষ জোর। মধুসূদন ছিল তাঁর প্রিয় কবি। লেবোরেটারিতে কাজ করবার সময় প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনেছি—"ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি; এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি।" একদিন এ পদ দুটি আবৃত্তি করে আমাদের এক বন্ধুকে উল্লেখ করে প্রশ্ন করলেন, "বল দেখি এ কোথায় আছে এবং কার লেখা?" বন্ধুটি বলেন, এ আবার কি? ফলে বন্ধুটিকে প্রফুল্লচন্দ্রের বহু কটু, অম্ল এবং তীব্র বাক্যবর্ষণ সহ্য করতে হ'ল; শুধু তাকা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কিছু চড় চাপড় ও কর্ণ মর্দনের মধুর অনুভূতিও তার কপালে ছিল। আমরা তখন এম এস্‌সি পাশ করে তাঁর লেবোরেটারিতে কাজ করছি। শিষ্যদের সঙ্গে তিনি নিকট বন্ধুর মতন আলাপ ব্যবহার করতেন। কাজ করবার সময় হাস্য কৌতুকে সবাইকে মশগুল করে রাখতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক গুরুতর বিষয়েও সহজভাবে আলোচনা করতেন। সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস সমাজ সংস্কার ইত্যাদি কোন বিষয় বাদ যেতনা। প্রায়ই তিনি আমাদের বলতেন, যতদিন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চ্চার ব্যবস্থা না হবে, ততদিন আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ, পঙ্গু ও অনুন্নত হয়ে থাকতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি সুবিখ্যাত রুশ রাসায়নিক মেণ্ডেলিফের দৃষ্টান্ত আমাদের দিতেন। মেণ্ডেলিফ যখন ১৮৬৮ খৃঃঅব্দে রসায়ন বিজ্ঞানের গভীরতম তত্ত্ব, 'পর্য্যায় সূত্র' (Periodic Law)," বিধিবদ্ধ করেন, বৈজ্ঞানিক জগতে তখন একটি প্রবল সাড়া সৃষ্টি হয়। এবং এ তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ জানবার জন্য সকল দেশের সকল বিজ্ঞানীই উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। মেণ্ডেলিফ কিন্তু তাঁর এ তত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করলেন রুশ ভাষায় তাঁর নিজের জাতীয় ভাষায়। ফলে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণকে বাধ্য হয়ে রুশ ভাষা শিখতে হল, বিজ্ঞানের এ মহান তত্ত্বটিকে আয়ত্ত করবার জন্য। যথাযথ এবং চর্বণ করবার ক্ষমতার অভাব সত্ত্বেও বাঙ্গালী ছাত্রেরা ইংরাজিতে বিজ্ঞানের

বিষয়গুলি গলাধঃকরণ করতে শুধু পটু হয়ে উঠছে ; এবং পরীক্ষাসূত্রে এসব হুশিয়ার ছিনিয়গুলি শুধু পুনরুদ্গীরণ করে ডিগ্রীলাভ করে বাহবা নিচ্ছে। এতে যে শুধু জাতীয় শক্তির এবং অর্থের অপব্যয় ঘটছে,—এবং প্রকৃত শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে না, এ তিনি বিশেষ করে প্রচার করে গেছেন।

স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর নজর ছিল প্রখর। কোন ছেলে লেবোরেটারিতে প্রথম কাজ করতে আসলে, তিনি তার স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করতেন বুকে পিঠে ঘুসি দিয়ে, হাতের ও বুকের মাংসপেশীর পরীক্ষা করে, কিম্বা তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে উঠে। ছেলেটি যদি হাসি মুখে এসব সহ্য করতে পারত—তবেই তার প্রার্থনা মঞ্জুর হত, এবং লেবোরেটারিতে কাজ করবার অনুমতি পেত। নিজে খুব রোগা ছিলেন বলেই স্বাস্থ্যের কদর ছিল তাঁর কাছে সব চেয়ে বেশি।

পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন তাঁর চিরকালই ছিল খুব সাদাসিধে—এবং বেহদ্দ বাঙ্গালী। পরে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের পর যখন খদ্দর প্রচারে মেতে যান, তখন হতে একমাত্র খদ্দরই ছিল তাঁর অঙ্গভূষণ—শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে। হাঁটু খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবী এবং খদ্দরের চাদর। শেষ বয়সে যখন ঘরে থাকতেন তখন তাঁর পোষাক ছিল খদ্দরের লুঙ্গী এবং পাঞ্জাবী। সাহেবিয়ানা ও বাবুয়ানা যেগুলোই ছেড়েছেন চটে। একদিন আমাদের এক এম এস-সি ক্লাসের ছাত্র—আমি তখন বিজ্ঞান কলেজে তাঁর সহকর্মী—বেশ ফিট্‌ফাট পাতিপুণ্ড ধুতি ও আদির পাঞ্জাবী পরিধান করে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে। তিনি তখন তাকে পাকড়ে ধরলেন এবং আমাদের বল্লেন, দেখ, একে মেয়েদের মত একটি সেফিজ পরতে বলে দাও ; না হলে তিনি যে রকম সাদা কাপড় পরে বেড়াচ্ছেন তাতে ভদ্র সমাজে লজ্জা নিবারণ হয় না। আর একদিন আমার মনে আছে কোন নামকরা সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাঁর বয়স প্রায় ৪০।৪৫—পরিধানে পুরো দস্তুর ইংরাজী পোষাক। আচার্য্য রায়ের সঙ্গে ভদ্রলোককে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আমি নিয়ে যাই। বিশেষ কোন আলাপের পূর্বেই তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ প্রেরণায় ভদ্রলোকের গলাবন্ধটিতে টান দিয়ে বললেন—গলায় ফাঁস লাগিয়েছ কেন? লজ্জা করে না? আমিত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ; ভদ্রলোক একেবারে স্তম্ভিত। সম্পূর্ণ অপরিচিতের সঙ্গে এরূপ প্রথম ব্যবহার আমাদের অপ্রত্যাশিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পর মুহূর্ত্তে ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করতে লাগলেন—বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে। শিক্ষার মত ছিল তাঁর স্বচ্ছ এবং সরল, তাতে বিরাগ ছোঁয়, কিন্তু কখনো বিদ্বেষ দেখা যায় নি।

বাঙ্গালী ছেলেরা যে শ্রমকাতর, এবং এজন্যই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত যুবকদের মধ্যে যে অন্নসমস্যার ও বেকার সমস্যার প্রাবল্য, এ ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। এ প্রসঙ্গে মাড়োয়ারী বণিকদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করবার জন্য প্রায়ই তিনি উপদেশ দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য বাঙ্গালী যুবকের যে মোহ, যাতে তারা পরীক্ষা পাশ করাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে—তাতেই হয়েছে তাদের দুঃখদৈন্যের সৃষ্টি। বাঙ্গালী যুবক এতেই হয় আরামপ্রিয়, এবং চাকুরীপ্রিয়, তাই জীবন-সংগ্রামে তার পরাজয় হয় অবশ্যম্ভাবী। এর প্রতিকারের জন্য তিনি সারাজীবন আন্দোলন করে গেছেন।

সময়নিষ্ঠা এবং মিতব্যয়িতা ছিল তাঁর স্বভাবের বিশেষত্ব। বাঙালী ছাত্রেরা যে তাস খেলে ও আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করে এ নিয়ে তিনি প্রায়ই তিরস্কার করতেন। কোন জিনিষের অপচয় তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ঘরে লোক নেই অথচ পাখা ঘুরছে, কিংবা আলো জ্বলছে,—তিনি যদি দেখতে পেতেন তা'হলে আর রক্ষা ছিল না। বেশ বকাবকি শুরু হ'ত—আর আমাদের কৈফিয়ত দেবার অবকাশ ঘটতনা। লেবোরেটারিতে কোন ছেলে শুধু শুধু গ্যাস বাতি জ্বালাচ্ছে, কিম্বা জলের কল খুলে তা ভাল করে বন্ধ করেনি এবং তা হ'তে অনাবশ্যক জল পড়ছে, এ সব বিষয় তাঁর নজরে পড়লে আমাদের সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে হত। বুড়ো বয়সেও তাঁর নিকট এ নিয়ে অনেক বকুনি খেয়েছি। ছেলেদের দোষ ত্রুটির জন্য তিনি আমাদেরও দায়ী করতেন। কেননা আমরা তাদের ভাল করে শিক্ষা দিতে পারিনি।

তিনি এত মিতব্যয়ী এবং আত্মনির্ভর ছিলেন যে কারো সেবা বা পরিচর্য্যা সহজে গ্রহণ করতেন না। বৃদ্ধ বয়সেও নিজের কাপড় নিজে কেচে তাঁকে রোদে দিতে দেখেছি। বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায় বসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই বৈজ্ঞানিক নাইট যে অনেক সময় নিজের জুতোতে নিজে কালি লাগাচ্ছেন, কিম্বা চরখায় সুতো কাটছেন, এ সব দৃশ্য মোটেই বিরল ছিল না। যাঁরা বিজ্ঞান কলেজে তাঁর নিকট সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করেছেন, তাঁরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন।

নিজের জন্য কোন আবশ্যকীয় ব্যয় করতেও তিনি কুণ্ঠিত হোতেন। রুগ্ন শরীরে অজীর্ণ ও অনিদ্রা রোগে ক্লিষ্ট হয়েও তাঁকে সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। তাই তাঁর সময়নিষ্ঠা ছিল প্রবল এবং স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে নজর ছিল প্রখর। সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে বেড়াতে যাওয়া ছিল তাঁর একটি প্রাত্যহিক অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে। সেখানে মাইল দুই বেড়িয়ে এসে রোডু রোডের ধারে লবেলমূর্ত্তির তলায় সভা বসত অনেক বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যদের নিয়ে। এ অভ্যাসটি তিনি শেষ বয়স অবধি যতদিন কর্ম্মক্ষম ছিলেন ব্রতের মতন পালন করে গেছেন। এ সভায় নানাবিধ গল্পগুজব ও আলোচনা চলত। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি কোনটাই বাদ পড়ত না। কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, প্রিন্সিপাল গিরিশচন্দ্র বসু, সত্যানন্দ বোস প্রভৃতি বাংলার গণ্যমান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সে সভায় নিয়মিত সভ্য ছিলেন। এ ছাড়া অনেক আগন্তুকও এসে জুটত আচার্য্য রায়ের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। আমরা তাঁর শিষ্য এবং সহকর্ম্মীরাও প্রায়ই সঙ্গে থাকতাম। একদিন ময়দান থেকে তাঁরই সঙ্গে গাড়ীতে আসছিলাম। গাড়ীখানি (ঘোড়ার গাড়ী) বউ বাজারের মোড়ের নিকট আসলে তিনি আমাকে বললেন, ওহে কিছু আঙ্গুর কিনে দিতে পার? আমি নেমে চার আনা দিয়ে প্রায় এক পোয়া আঙ্গুর নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, কত আঙ্গুর কিনলে। বললাম, একপোয়া। একটু যেন বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, তুমিত দেখছি বাপু, একটি ডাকাত; এত আঙ্গুর কিনলে কিসের জন্য—মিছি মিছি অর্থব্যয়। আমি আর কি বলি? বললাম, এ পাকবে ২।৪ দিন। নিজের সুখ সুবিধা ও ভোগের জন্য সামান্য মাত্র অতিরিক্ত ব্যয়কেও তিনি মনে করতেন যেন তাতে তাঁর দরিদ্র দেশবাসীকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। যা উপার্জ্জন করেছেন তা সব গরীব ছাত্র ও দীন দুঃখীদের দান করে গেছেন। ত্যাগের দ্বারাই তিনি ভোগের আনন্দ

উপভোগ করতেন। বাংলা দেশে যখনই কোন দৈব দুর্বিপাক ঘটেছে—বন্যা বা দুর্ভিক্ষ—তার প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হয়েছেন সর্বাগ্রে প্রফুল্লচন্দ্র—সেবাদল গঠন করে ও সাহায্য ভাণ্ডার খুলে। খাবার জিনিষ নষ্ট হচ্ছে দেখলে তিনি ক্ষেপে যেতেন চটে। বাঙালীর বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে যে পরিপাটি আহারের আয়োজন হয়, এবং তাতে আহার্য্যের ও অর্থের যে অপচয় ঘটে, তা নিয়ে তিনি প্রায়ই কঠোর মন্তব্য করতেন। নিজে খুব স্বল্পাহারী ছিলেন; তাই কেউ কোন খাবার তাঁকে দিতে গেলে তা হতে তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন, কিম্বা কলেজের ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করতেন। অধ্যাপক রমণের অভ্যর্থনা উপলক্ষে (অধ্যাপক রমণ তখন F. R. S. হয়েছেন এবং মাত্র কিছুদিন আগে লণ্ডন হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন) তিনি বিজ্ঞান কলেজে একবার প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। আমাদের উপর হুকুম হোল যে খাবারের ব্যবস্থা হবে শুধু মুড়ি এবং বাতাসা। তিনি প্রায়ই বলতেন, "বাঙালীর ছেলেগুলো বাপের পয়সা খরচ করে হাটলি পামারের বিস্কুট কিনে খাবে, অথচ খৈ মুড়ি ইত্যাদি যা খাদ্য হিসাবে অনেকাংশে শ্রেয় তা এত সস্তা সত্ত্বেও বর্জ্জন করবে। একেই বলে দাসমনোবৃত্তি। আজ যদি এই চিড়ে মুড়ি টিনে পুরে বিলেত থেকে কোন কোম্পানি চালান দিত, তখন এ চিড়ে মুড়িরও কদর ঘোড় কত বেশী। বাঙালী বাবুরা তখন দুপয়সার মুড়ি দু'টাকা দিয়ে কিনতেন।" তাঁর একথার প্রমাণ এখন আমরা দেখতে পাই। আমেরিকা হতে আমদানী বাজারে কাগজের প্যাকেটে Kellog কোম্পানির যে Rice Crispies বিক্রি হয়, তা হচ্ছে শুধু ভাজা মুড়ি। প্রত্যেক প্যাকেটে মাত্র ৫ আউন্স ওজনের মুড়ি থাকে, এবং তার দাম হচ্ছে এক টাকা। এ জিনিষ এখন বাজারে আসা মাত্র বিক্রি হয়ে যায়।

দেশের প্রতি তাঁর মমতা ছিল গভীর। ভারতীয় রাসায়নিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁরই প্রেরণায়। তিনি যে ভারতীয় রাসায়নিক কর্ম্মীদলের গঠন করেছেন, তাদেরই উদ্যোগে এ সমিতির কাজ কর্ম্ম পরিচালিত হয়। কতিপয় বিলাত প্রত্যাগত বিশিষ্ট রাসায়নিক এ সমিতির উপর প্রায়ই কটাক্ষ করতেন। এবং তাঁদের নিজের কাজ কর্ম্ম ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির মুখপত্রে প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করতেন। এমন কি, সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়াও তাঁদের কাছে ছিল অগৌরবের বিষয়। এসব কথা আচার্য্য দেবের কাণে যায়। তিনি একদিন বিজ্ঞান কলেজে এঁদেরই এক গর্ব্বিত যুবককে ডেকে সকলের সাক্ষাতে বললেন—"শুনেছি বর্ম্মায় নাকি এমন অনেক বর্ম্মান আছে যারা কোন ইংরাজকে সিংহাসনে বসিয়ে পরিচয় দিতে পারলে গৌরব অনুভব করে। বাংলা দেশে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেও যে এরূপ মনোবৃত্তি থাকতে পারে—এ আমার ধারণা ছিল না।" এর পর হতেই এ সব পণ্ডিতেরা ভারতীয় রাসায়নিক সমিতিতে সত্যরূপে যোগ দান করেন।

একবার তাঁকে লাহোরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু রসায়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করা হয়। সেখানে বক্তৃতা দেবার সময় তথাকার একজন নবাগত অল্পবয়স্ক ইংরাজ অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। এ ইংরাজ যুবকটী রসায়নেরই অধ্যাপক; তাঁকার হাত প্রাচীন যুগের হিন্দুদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির বর্ণনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। যুবকটি আধুনিক রসায়নে শিক্ষা লাভ করেছিল—তাই প্রাচীন যুগের সাধারণে, সহজ সরল যন্ত্রপাতির বর্ণনা ও অনুন্নত রাসায়নিক জ্ঞানের কথা শুনে মৃদু মৃদু বিদ্রূপের হাসি হাসছিল। আচার্য্যদেব যুবকের ঐরূপ উদ্ধত ব্যবহার লক্ষ্য করেন। একটু পরে একটি মকরধ্বজের শেলা হাতে নিয়ে তিনি বলতে

লাগলেন—"বন্ধুগণ, প্রায় ২০০০ বছর আগে সেকেলে মৃত্তিকা নির্মিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতীয় রাসায়নিকগণ এই মকরধ্বজ নামক পদার্থটি প্রস্তুত করেছিলেন। বিবিধ রোগে একে ঔষধ হিসাবে তাঁরা প্রয়োগ করতেন। এখনও এ ঔষধটির বহুল প্রচলন আছে। এ হচ্ছে আধুনিক রসায়নের ভাষায় বিশুদ্ধ Resublimed mercuric sulphide—পারদ-গন্ধক ঘটিত একটি যৌগিক পদার্থ। এর বিশুদ্ধতা বর্তমানে আধুনিক প্রণালীতে ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত এরূপ পদার্থ হতে কোন অংশে কম নয়। হিন্দুরা যে সময়ে এ ঔষধটি প্রস্তুত করেছিলেন তখন আমার ঐ যুবক বন্ধুটির (ইংরেজ অধ্যাপকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) পূর্বপুরুষেরা বনে জঙ্গলে পশু-চর্ম পরিধান করে, পশুপক্ষী শীকার করে ও বন্য ফল আহার করে জীবন রক্ষা করতেন।" তরুণ অধ্যাপকটি এই তিক্ত তিরস্কারে ঘর হ'তে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

শিষ্যদের কৃতিত্বে ছিল তাঁর অসীম আনন্দ। কোন শিষ্যের কোন বিশেষ গবেষণা ইউরোপের বিজ্ঞান সমাজে সমাদৃত হয়েছে, এ খবরে তিনি একপ্রকার আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন। তখন আমরা দেখেছি সেই বয়স্ক শিষ্যটিকে জড়িয়ে ধরে হয় তিনি আনন্দে নৃত্য করছেন কিম্বা তাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন—"সর্বত্র অন্বেষিবেৎ পুত্রাদ্ শিষ্যাদ্ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্।"

বাঙালী ছাত্র বা যুবকগণের কোন কাজে উদ্যম ও উৎসাহে যে ঘাটী হয় না, তারা যে সহজে উত্তেজনার ও উদ্দীপনার মেতে উঠে আবার সহজেই অবশ হয়ে পড়ে, ধৈর্য্যের সঙ্গে স্থির ভাবে দীর্ঘকালব্যাপী কোন কঠোর কাজ করতে তারা যে সাধারণতঃ অক্ষম, এ নিয়ে তিনি প্রায়ই দুঃখপ্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন—সিদ্ধি পেতে হলে কঠোর সাধনা চাই। বাঙালী যুবকেরা খড়ের আগুনের মত ফস্ করে জ্বলে উঠে এবং আবার ফুস করে নিভে যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই প্রাচীন যুগের রাসায়নিক নাগার্জুনের সাধনার গল্প আমাদের বলতেন। রসযোগ যখন শ্রীশৈলনিবাসী সিদ্ধপুরুষ রসশাস্ত্রবিদ্ মহামতি নাগার্জুনের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে রসায়ন প্রক্রিয়ার জ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করেন, তখন নাগার্জুন তাঁকে বলেছিলেন—

"সত্ত্বানাং তোজনার্থায় সাধিতা বটবক্ষিনী
দ্বাদশানি চ বর্ষাণি মহাদেবঃ কৃতো ময়া।
দিব্যা বাণী ময়া শ্রুতা।

"জীবের কল্যাণার্থে আমি দ্বাদশবর্ষব্যাপী বটবক্ষিনী দেবীর পরিতোষের জন্য মহাসাধনা করেছিলাম। তার ফলে আমি এক দিব্যবাণী শ্রবণ করি।"

"সাধু সাধু মহাসিদ্ধ ... ...
কিঞ্চিৎ প্রার্থয় যে সিদ্ধ তৎসর্বং প্রদদাম্যহম্।"

দেবী যেন বলেন—"হে মহাসিদ্ধ, সাধু, সাধু; আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তা সবই প্রদান করছি।'

তখন তিনি বলেছিলেন—

"যদি তুষ্টাসি মে দেবি সর্ব্বদা ভক্তিবৎসলে।

দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু রসবন্ধং দেহি মে॥"

"হে সর্ব্বকাম প্রদায়িকা ভক্তিবৎসলা দেবি, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাক, তবে ত্রিভুবনে দুর্লভ রসবন্ধ (পারদকে ঘনীভূত বা কঠিন করা) বিদ্যা আমাকে দাও।"

প্রফুল্লচন্দ্র এ সব শ্লোক আবৃত্তি করে প্রায়ই ছাত্রদের বলতেন, রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শী হ'তে হলে নাগার্জ্জুনের মত সাধনা চাই। একনিষ্ঠ ভক্তি না হ'লে রসায়নাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রসন্ন হন না। বলা বাহুল্য প্রফুল্লচন্দ্র হিন্দু রসায়নের যে ইতিহাস প্রণয়ন করে গেছেন তা বিজ্ঞান-জগতের একটি প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এখনও বর্ত্তমান লেখকের নিকট আমেরিকা চীন ও অন্যান্য দেশ হতে ঐ গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানার জন্য পত্র আসে। দুঃখের বিষয় এখন গ্রন্থখানি বাজারে অপ্রাপ্য। এ গ্রন্থখানি আমাদের একটি জাতীয় সম্পত্তি ছিল। এর সংশোধন, সংবর্দ্ধন ও পুনর্মুদ্রণ বিশেষ আবশ্যক। একে জাতীয় কর্ত্তব্য বলে গণ্য করতে হবে।

পূর্ব্বে বলেছি, প্রফুল্লচন্দ্রের সাজপোষাক ও চালচলন ছিল নিতান্ত দেহাতে ধরণের ও সাদাসিধে। তাঁকে দেখতে কোন গ্রাম্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মত দেখাত। এনিয়ে অনেকবার বহু মজার ঘটনা ঘটেছে। তার দু'একটির কথা এখানে বলছি।

আচার্য্যদেব অনেক সরকারী কমিশন ও কমিটির সভ্য নিযুক্ত হ'তেন। একবার এরূপ একটি কমিশনের সভ্য হিসাবে উক্ত কমিশনের বৈঠকে উপস্থিত হবার জন্য তিনি গ্রাণ্ডহোটেল যান; চৌরঙ্গীরাস্তার উপর গ্রাণ্ডহোটেল; তার উপরের তলায় বৈঠক বসবে। আচার্য্যদেব তাঁর অশ্বশকট হ'তে অবতরণ করে হোটেলের গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধু এবং বৈঠকের অন্যতম সভ্য দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। মাঝে মাঝে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় হোটেলের জনৈক খানসামা বারান্দায় আসে। সে কোন সাহেবকে ভিতরে পথ দেখাতে গিয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখে সে মনে করল এ হয়ত কোন সাহেবের আর্দ্দালি, সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছে। এরূপ অনুমান করা তার পক্ষে বিশেষ কিছু বিচিত্র নয়। কারণ, তাঁর সেই উস্কোখুস্কো দাড়ি, এলোমেলো রুক্ষ চুল, বেঁটে অর্দ্ধময়লা কাপড় জামা,—এরূপ ব্যক্তির গ্রাণ্ডহোটেলে আসবার অন্য কোন কারণ থাকা ত সম্ভব নয়। তাই সে আচার্য্যদেবকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করল—"তোমারা সাহেব কব আয়গা?"—আচার্য্যদেব উত্তর দিলেন—"এতি আয়গা।" সে আবার জিজ্ঞাসা করল—"কেত্তনা ওলব মিলতা?" এমন সময় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এসে পড়লেন, কাজেই এ মজার অভিনয়টির এখানে যবনিকা পতন হ'ল।

আর একবার ঐরূপ এক কমিশনের সভ্য হিসাবে তিনি বাংলা গভর্ণমেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রির অফিসে ঐ কমিশনের বৈঠকে যোগদান করবার জন্য উপস্থিত হন। অফিসে প্রবেশ করে যখন উপরে উঠবার জন্য লিফ্‌ট্ (Lift) ঘরের সম্মুখীন হন, সেখানকার বেয়ারাটি তখন তাঁকে বলে উঠল, "আরে ইধার কেউ আয়তা? সিঁড়ি পর উঠকে চলা

যাও।" অর্থাৎ নিকট্ কক্ষে সাহেব লোক ও বড় বাবুদের জন্য। সাধারণ লোক সিঁড়ি দিয়ে যাতায়াত করবে। এ ব্যাপারটি নিয়ে বেথাটিকে দেখে অনেক বিব্রত হতে হয়েছিল। কারণ, গভর্ণমেণ্টের কোন দরোয়ান বা বেয়ারা দেশী পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি যেন ভবিষ্যতে কোন অসম্মান প্রদর্শন না করে, এরূপ আদেশ গভর্ণমেণ্ট হ'তে জারী করিয়ে তবেই আচার্য্যদেব ক্ষান্ত হয়েছিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিজ্ঞানকর্ম্মী। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে তিনি শুধু তাঁর পরীক্ষাগৃহের দেওয়ালে ঘিরে কিংবা তাঁর ধ্যান ধারণার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন নি। তিনি তাঁর বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কর্ম্মে পরিণত করে প্রতিষ্ঠা দান করে গেছেন—যাতে দেশের কল্যাণের পথ গেছে উন্মুক্ত হয়ে। এর নিদর্শন হচ্ছে তাঁর গঠিত "বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মেসিউটিকেল ওয়ার্কস।" এ ছাড়া বাংলার বহুবিধ কুটীর এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন উদ্যোক্তা, পরামর্শদাতা এবং সহায়ক।

প্রফুল্লচন্দ্রকে বাংলার বড়লোকের মধ্যে গণ্য করা হয়। বড় বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় সেরূপ বড় তিনি ছিলেন না। তাঁর বড়ত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর ধন ছিল না, বাড়ী ছিল না, জমিদারী ছিল না—পৈতৃক জমিদারী তিনি ভাইদের দান করেছিলেন, নিজের গাড়ীঘোড়া ছিল না (তিনি যে অশ্বশকটে যাতায়াত করতেন তা ছিল বেঙ্গল কেমিক্যালের সম্পত্তি), তিনি বড়লোকের সঙ্গে মিশতেন না, তাঁর দরজায় পাহারা বা বেয়ারা থাকত না, আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের কাছেই তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। অর্থাৎ তাঁর বড়ত্বের কোনপ্রকার বেড়া ছিল না—সে বাহ্যিক হউক বা আন্তরিক হউক। তিনি প্রাণখুলে পরিচিত অপরিচিত সকলের সঙ্গেই মিশতে পারতেন, বিশেষতঃ সাধারণ লোকের সঙ্গে। পল্লীগ্রামে পল্লীবাসীদের সঙ্গেই তিনি বিশেষ আনন্দ পেতেন। যতদিন কর্ম্মক্ষম ছিলেন প্রতিবৎসরেই ছুটির সময় তাঁর জন্মভূমি রাঢ়ুলী গ্রামে গিয়ে তিনি মাসাবধিকাল কাটিয়ে আসতেন। অনেক সময়ে তাই তিনি আপনাকে সাধারণের সম্পত্তি বলে পরিচয় দিতেন। প্রীতি দিয়ে, দরদ দিয়ে তিনি সাধারণের হৃদয় জয় করেছিলেন, ঐশ্বর্য্যের, জ্ঞানের বা শক্তির প্রভাব দিয়ে নয়। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাই বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন সাধারণের মধ্যে ও আপন শিষ্যদের মধ্যে—সেবা দিয়ে এবং জ্ঞান দিয়ে। এ জন্যই বলতে হয় তিনি শুধু বড় ছিলেন না, বড় হতেও ছিলেন আরো কিছু বেশী। তিনি ছিলেন মহৎ। সে মহত্ত্ব ছিল দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য তাঁর অকৃপণ আত্মত্যাগে।

রবীন্দ্রনাথ

ডাঃ কালিদাস নাগ

'গল্প ভারতী' থেকে অরুণী তাগিদ এল কবিগুরুকে নিয়ে দুচারটে গল্প পরিবেশন করতে হ'বে—"এই ধরুন না কেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীনে ও জাপানে স্বশরীরে বেড়িয়েছিলেন ত ? সুদূর-প্রাচ্য নিয়ে কিছু লিখুন না ?" —"আরে মশাই—আসল গল্প লেখা যে কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া আটকুলের ছাত্রেরা— দেখছেন ত—ওরে নিয়ে যেতে এসেছে তাদের শারদীয় প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করতে—সময় পাব কোথায় !"

—কিন্তু পরিচালক নাছোড়-বান্দা ! "আচ্ছা রবীন্দ্রযুগের শিল্পীদের নিয়েই দু'চারটে গল্প ছাড়ুন না আমাদের শারদীয় সংখ্যায়।"

মনে পড়ে গেল "রক্ত কবরীর" যুগ ; ৬৩ বছরের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জেনেছি আমরা—অর্থাৎ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু ও আমি। সেই ১৯২৪ সালে ভারত মহাসাগর পার হয়ে চীনের দিকে, ব্রহ্ম, মালয়, পরিদর্শন করে, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনকে পাশ কাটিয়ে, তিন সপ্তাহ জাহাজে ভেসে তবে চীনে নামা। ভাগ্যিস্ আজকালকার হাওয়াই-জাহাজে তিন দিনেই চীন দেখে ফিরে আসিনি আমরা ! আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে চীনা ব্যাপারী, শিক্ষক, সৈনিক, কুলী—কত রকমের মানুষ ; সবার কাছ থেকেই কিছু কিছু সংগ্রহ চলছে ; খোলা আকাশের নীচে—ডেকে বসে—'গাল-গল্প'—জীবন্ত করে তুলছে চীনের বাস্তব ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ সারাদিন সমুদ্রের ঢেউএর সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়েই কত কিছু রচনা করে যাচ্ছেন—সন্ধ্যা হলেই ডেকের উপর আমাদের কাছ ঘেঁসে বসেন—আর নানা হাস্য-পরিহাসের মধ্যে আমাদের কাছ থেকে অতি তুচ্ছ মানুষদের কত ছোট-খাটো গল্প কাহিনী সংগ্রহ করেন।

নন্দলাল রেখা-মহাকাব্যের বিরাট স্রষ্টা। তবে তুলি ছাড়লেই তিনি প্রায় নীরব কবি ! তাঁর সেই গভীর নীরবতার মর্য্যাদা দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব্ব আলাপ-নৈপুণ্যে নন্দলালের কাছ থেকেও অনেক শিল্প-রহস্য টেনে আনতেন। সেযুগে কবি রবীন্দ্রনাথ যে শিল্পী-রবীন্দ্রে রূপান্তরিত হচ্ছেন। সেই মৌন-গভীর ইতিহাস আজ মনের মধ্যে সরব হয়ে উঠ্‌ছে....."গুরুদেব ! আপনার লেখার খাতার উপরে কাটাকুটি-গুলো রেখার রূপ নিয়েছে যে,—একি ব্যাপার ?"

"পদাবলীর ছন্দের মতন রেখার টানেও যে একটা ছন্দ আছে। তোমরা মনে কর আমি বুঝি কেবল ভাষার রচনা নিয়েই যাত্ত ? রেখায় কাটাকুটি খেলাতে আমার খুব আনন্দ—তাই ত তোমরা

দেখছ এই খাতাটার পর পর নানা ছাঁদের লেখার উপর কাটাকুটি করতে গিয়ে অন্যমনস্কে এঁকেছি কি একটা অসম্ভব গোছের প্রাগৈতিহাসিক জীব....."

এই ধরণের অনেক জীব জন্তু—নরনারীর ছবি রেখায় ও রঙে এঁকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীদের ও বিশ্ব-শিল্পী মহলকেও অবাক করে দেবেন;—কিন্তু সে ত ৮।১০ বছর পরে। তখন তাঁর সত্তর বৎসর পূর্ণ হওয়ার আয়োজন চলছে; ১৯৩০-৩১ সালে আবার তাঁর সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার কিছুদিন কাটিয়ে দেখেছি সে দেশের শিল্পী-মহলে শিল্পী-রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কি বিরাট চাঞ্চল্য।

কিন্তু ১৯২৪ সালের আগে আমাদের ছঁসই ছিল না যে রবীন্দ্রনাথ শুধু ছবি বোঝেন ও ভাল বাসেনই না,—তিনি শেষ জীবনে ছবির বন্যা বইয়ে দেবেন—অন্ত রবির বর্ণচ্ছটায় শিল্প জগতটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে! অথচ প্রাচ্য শিল্পের আড়তদার যে চীন; সেই দেশের নিমন্ত্রণ পেয়ে, ধাবার পথেই কি সাড়া জেগেছিল, কবি-শিল্পীর মনের অন্তস্তলোকে? তাই কি মুক্তোর মত লেখাগুলি কেটে রূপরেখার জাল বুনেছিলেন—অজান্তে এই চীন যাত্রী জাহাজে?

কিছুই জানি না। জানতে চেষ্টাও করিনি; শুধু গল্প-প্রসঙ্গে হঠাৎ একদিন কবি নিজেই বলে বসলেন—"পিতৃদেব আমার অনেক আগে চীন-যাত্রা করেছিলেন—তোমরা জান কি? আমি তখন খুব ছোট—তিনি ফিরে আসবার পর তাঁর মুখে চীনের কথা অনেক শুনেছি..... ..নিজে এমনি করে সত্যিই চীনে আস্‌ব ত আগে ভাবিনি।"

দেশে ফিরে এ বিষয়ে খোঁজ করেছিলাম; রবীন্দ্রনাথ তখন ১৩ বছরের কিশোর—১৮৭৭ সালে—অর্থাৎ আজ থেকে ৭০ বছর আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঠিক আমাদের এই পথ ধরেই ব্রহ্মদেশ ও মালয় দেখে, হংকং পার হয়ে কানটনে (Canton) আসেন; তার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অজিতকুমার চক্রবর্তী মহর্ষির জীবনীতে দিয়েছেন; কিন্তু আরো ভাল করে দলিলপত্র খুঁজে বিশ্বভারতী থেকে এ বিষয়ে কিছু প্রকাশ করার অবকাশ রয়েছে (আমার "Tagore and China" দ্রষ্টব্য) ১৮৭৭ সালের আগে বহু ভারতবাসী বিলাত গিয়েছেন—কারণ সেকালে বিশ্ব-ভ্রমণ মানেই ছিল বিলাত-ভ্রমণ অর্থাৎ প্রধানত "মনিব"দের দেশ ইংলণ্ড ভ্রমণ। মহর্ষি দেবেন্দ্র "হিন্দুমেলা" ও "National Paper"এর পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথের জন্ম-কাল থেকে। তাই, সেকালের কাগজপত্রের অভাব হইনি যে দেবেন্দ্রনাথ বিলাত যেমটা বর্জন করে কেন চীনের ধর্ম ও সংস্কৃতির সন্ধানে [illegible] (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্রষ্টব্য) সেকালে ঐ দিকে ঝুঁকেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ও "চীন-ভবনের" প্রতিষ্ঠার দেবেন্দ্র-সাধনার পরিপূর্ণতা।

২১ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ইউরোপ প্রবাসীর পত্র" শেষ করেই "ভারতী" পত্রিকায় (১৮৮২) যে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার নাম "চীনে মনুষ্যের ব্যবসা।" আমাদের দেশের লোক ভুলে গিয়েছে—কেন তিনি আফিম খাইয়ে মানুষ হত্যাকে 'ব্যবসা' বলে চীনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তখন জগৎবরেণ্য Sun Yat Sen (১৮৬৬-১৯২৫) ১৬ বছরের কিশোর। আজ সগর্বে স্মরণ করি যে স্বাধীন

চীনের জন্মদাতা Dr. Sun. নিজে দূত পাঠিয়েছিলেন কবিগুরুকে সদলবলে Canton-এ সাদরে নিয়ে যাবার জন্যে। Hongkong-এতে আমাদের জাহাজ যখন ঠেকল তখন সে বিপদ্বর পেয়ে কবি সাংহাই-প্রোগ্রামের তাগিদে তখুনি না গিয়ে পরে আসবেন জানান। কিন্তু ১৯২৫ এর গোড়াতেই Dr Sun পরলোকগমন করেন। ভারত ও চীনের দুই মহামানব চীনের এক যুগ-সঙ্কটে পরস্পরকে শুধু অভিনন্দন করলেন—ইহজীবনে আর মিলন হ'ল না। আজ চীনের ও এসিয়ার আর এক মহাসঙ্কটে দুই দেশের ৭০ কোটি মানুষ এই দুই যুগ-প্রবর্তকদের নাম নীরবে জপ করছে।

বিলাতী ইস্কুলমাষ্টারের দান তাঁদের কেতাবে কেতাবে রেখে গেলেন শতাব্দী পরিহাস—সুদূর প্রাচ্য! (Far East) অর্থাৎ যারা আসলে আমাদের মনের মানুষ, ঘরের মানুষ তারাই হল সুদূর আর যাঁরা এলেন ঘর ভাঙতে তারাই বললেন ঘর দোর ছুড়ে! সাধে কি রসিকরা বলেছেন, ইতিহাসটা বিধাতার প্রচণ্ড পরিহাস? চীন জাপান হয়ে গেল সুদূর-প্রাচ্য অথচ দু'হাজার বছর ধরে তাদের সাথেই ভারতের আত্মীয়তা। রবীন্দ্রনাথ গেয়ে উঠলেন—

আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী—

১৯ শতকের শেষ দশকে দেখি আর একজন "বিশ্ব-বাঙালী" বিবেকানন্দ ভেসে চলেছেন প্রশান্ত মহাসাগর বেয়ে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের দিকে। ১৮৯৩ সালের সে ঘটনা হয়ত সবাই মনে রেখেছে; কিন্তু ভুলে গেছে সেই যুগেই চীন-জাপানের চিত্রকলায় ভারতের প্রভাব সুস্পষ্ট করে বুঝিয়ে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর চিঠিতে ভাষণে ও লিখনে। তিনিই ভগ্নী নিবেদিতাকে ভারতে এনে ভারতের তথা প্রাচ্য শিল্পের মর্মোদ্ঘাটনে নামিয়েছিলেন; তখন না ছিল ভারতের শিল্প-পরিষদ বা কোনও শিল্প-পত্রিকা। এই অজানা ইতিহাসের দু'এক পাতা খুলে দেখাতে চেষ্টা করেছি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় (ভারতের শিল্পে বিবেকানন্দ নিবেদিতা অধ্যায়)।

সেই যুগেই (১৮৯৬-১৯০৫) দেখি মনীষী হ্যাভেল—E B Havell কলিকাতা Art School-এর অধ্যক্ষ হয়ে আছেন এবং আধুনিক জগতের প্রথম সাধক-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনিই টেনে আনছেন আমাদের নব-শিল্প-জাতক রচনায়। পাশ্চাত্য শিল্পরীতি বর্জন করে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বড় বড় ক্যানভ্যাসের ছবি বিসর্জন দিলেন (Mackenzie Lyal) এর নিলামে। নতুন তুলি দিয়ে নতুন প্রেরণায় ছবি লিখতে সুরু করলেন: "কৃষ্ণ লীলা" অভিসারিকা, বেতাল পঁচিশী, শুভ সংহার, মেঘদূত, বুদ্ধ-সুজাতা, ও ভারত-মাতা (১৯০৫) এই দশ বছরের ১৮৯৫-১৯০৫ সৃষ্টি—শুধু ছবিতে নয় জীবনেও এক বিরাট বিপ্লব-যুগেরই সূচনা করছে। এর মধ্যেই দেখি, চীনা-শিল্পের প্রবীন সমঝদার জাপানী মনীষী ওকাকুরা কাকুজো (Okakura) বাঙলায় এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সন্ধানে। ১৯০২ সালে দীপ-নির্বাণের কয়েক মাস পূর্বে দেখি স্বামী বিবেকানন্দ জীর্ণ শরীরে নিজেই ওকাকুরাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন বৌদ্ধ-এসিয়ার প্রাণ-কেন্দ্র বুদ্ধগয়ায়

বুদ্ধ-বোধি তীর্থে। সেই প্রেরণায় ওকাকুরা লিখলেন "Asia is one" তাঁর Ideals of the East গ্রন্থে। রুশ-জাপানের যুদ্ধ শেষ হবার আগেই দেখি ওকাকুরা দুজন প্রসিদ্ধ জাপানী শিল্পী টাইকোয়ান ও হিসিদাকে পাঠালেন ভোডাসাকোয় অবনীন্দ্রনাথের দরবারে; তাঁর অনেক রচনায় সেই সময়ের কাহিনী অবনীন্দ্রনাথ কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করে গেছেন; কিন্তু আরো অনেক কিছু আবিষ্কার করবার আছে; তার আভাষ পেয়েছিলাম সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করে (বিশ্বভারতী Quarterly দ্রষ্টব্য)।

জাপানে গিয়ে পরলোকগত ওকাকুরার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে আলাপ হয়। বিশ্ব-বিখ্যাত Kokka পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের প্রিয়তম শিষ্য নন্দলালের "সতী" চিত্রখানি যেমন নিখুঁতভাবে ছাপা হয়েছিল (১৯০৮) তেমন কোন বিলাতের পত্রিকায় ছাপা সম্ভব হত না। নন্দলাল ও আমি যখন জাপানে শিল্পমহলের পরিক্রমা সুরু করে অতীত কালের শিল্পিরা তখন অনেকেই মৃত বা নিখোঁজ; কিন্তু মনীষী টাইকোয়ানই তখন শিল্পিদের "গোষ্ঠীপতি"—কী তাঁর প্রভাব আর সমাদর। রবীন্দ্রনাথ সদলে পৌঁছবামাত্র টাইকোয়ান তাঁর শিষ্যমণ্ডলীসেবিত সঙ্গে যে বিরাট কবি-সম্বর্ধনা ও প্রাচীন নৃত্যসভার আয়োজন করেছিলেন সে আজও ছবির মত চোখে ভাসছে। নন্দলাল চীনদেশে বেড়াবার সময় আধুনিক চীনা-শিল্পী মহলেও মিশেছেন তাদের studioতে বসে ছবিও [illegible]ন। কিন্তু জাপানের বড় শিল্পীরা তাঁকে যে গভীর প্রেমের বাঁধনে বেঁধেছিলেন দেখে মুগ্ধ হয়েছি। প্রবীনদের মধ্যে শিমোমুরা (Simomura) ও টাইকোয়ান (Tikwan) এবং নবীনদের মধ্যে আরাই কাম্পো (Arai Kampo) ও তাঁর সহযোগীরা। হোটেল থেকে টেনে বার করে ওদের ছবির মত ছোট্ট ঘরের মধ্যে আমাদের অতিথি করে রেখেছেন—সে শুধু আতিথ্য তোলবার নয়। নন্দলালের উপযুক্ত পুত্র শিল্পী বিশ্বরূপ বসু ও তাঁর প্রিয়-শিষ্য বিনোদ মুখোপাধ্যায় শিল্প চর্চা করতে জাপানে গিয়ে এই আত্মিক সম্বন্ধের কিছু আভাষ পেয়ে এসেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শেষে স্বাধীন ভারত এসিয়ার নিমন্ত্রণ পাঠাল। জাপানী ছাড়া এসিয়ার অনেক দেশের মানুষ এল। সেই Asian Relations Conferenceতে বসে বক্তৃতা, তর্ক বিতর্ক শুনতে শুনতে বার বার মনে হল সেই অতীত যুগের কথা: ১৮৭৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতের তথা এসিয়ার জীবন-পটে কত উঠা পড়া, ভাঙা ও গড়া চলেছে; ভারতবাসী কি সেদিকে সজাগ হয়েছে? তাদের সজাগ হবার শিক্ষা দেওয়া কি হচ্ছে?—আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, আমাদের অবনীন্দ্র ও নন্দলাল—শুধু ভারতের নয়—সারা এসিয়ার নব জাগরণের অগ্রদূত ও স্রষ্টিক। স্বাধীন শিল্পী রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত কিন্তু এই এসিয়ার আত্মিক ঐক্য সাধন নিয়ে সজাগ হয়েছে বলে মনে হল না। শিল্প ও সংস্কৃতি নিয়ে যারা ঘামাবার মত বেশী মানুষ দিল্লীতে দেখিনি;—হয়ত সময় লাগবে—ভাব-প্রাণ নূতন কর্মীদের জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। কিন্তু বাঙালী আমরাই বা কতটুকু সজাগ, কতটুকু চেষ্টা করছি—ইস্কুলে কলেজে—আধুনিক যুগের পথিকৃত শিল্পী ও সাধকদের চিনতে বা জানিয়ে দিতে—আমাদের ছেলে মেয়েদের প্রাণে তাঁদের অমর মূর্তির প্রতিষ্ঠা করতে? রাজনীতি নিয়ে যতই উন্মত্ত বা বিব্রত থাকি না কেন, মানব-নীতির দাবী এড়িয়ে যাওয়া চলবে না—চলতে পারে না। এই কথাটাই গভীর বেদনার সঙ্গে আজ মনের মধ্যে জাগছে বলে খোস-গল্প করে গল্প-ভারতীর পাঠক পাঠিকাদের ভুষ্ট করা হল না—ক্ষোভ রয়ে গেল। যাঁরা তাঁদের সব দিয়ে গড়ে গেলেন স্বাধীনতার ভিত্তি—স্বাধীন ভারত মনে রাখবে না তাঁদের সাধনা তাঁদের আত্মোৎসর্গ, তাঁদের সৃষ্টি?

———

কবি-কঙ্কাবর্ত্তন

গল্প-ভারতী বৈশাখী গ্রন্থে লেখিকা এই অপরূপ কাহিনীর প্রবর্ত্তক লিখেছেন—

সম্পাদক

শ্রীমতী রাণী চন্দ

গুরুদেব বলেন,—এ' চমৎকার জিনিষ হবে। নতুন একটা এক্সপেরিমেণ্ট। দেয়াল তো মাটির হবেই—ছাদও মাটির হবে। মাটির দেয়াল কি কম শক্ত হয় ভেবেছিস? কত [redacted] বৃষ্টির ধারা এর উপর দিয়ে যায়—তাতে কি? তবে ছাদই বা মাটির হতে পারবে না কেন? একটু ঢালু করলেই তো হ'ল; জলটা গড়িয়ে যাবে। আর ভয়ের কিছু থাকবে না। সুরেন বলছেন—তাই ও' চেষ্টা করে দেখবে এ' বাড়ীতে। এ' যদি সাক্সেসফুল হয় তবে কত লোকের উপকার হবে। গ্রামের লোকেরা কত সহজে বাড়ী তুলে ফেলতে পারবে; বাঁশ খড়ের জন্য ভাবতে হবে না।

মুখে মুখে কথা রটে যায়—মাটীর ঘরে মাটীর ছাদ তোলা হচ্ছে। হাটের পথে যেতে আসতে গাঁ-বাসীরা এসে ভীড় করে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, মাঝে মাঝে বাবুদের এটা ওটা শুধোয়। ঘুরে ফিরেই আসে যায় তারা। সকলেই এক অপেক্ষায় আছে—কবে বাড়ী শেষ হবে, কবে মাটীর ছাদ দেখবে।

গুরুদেব বলেন—আমার এত আনন্দ হয়—যখন ওদের দেখি; কত আগ্রহ নিয়ে এসে দাঁড়ায় বাড়ীর সামনে। কত উৎসুক ওরা—বাড়ীটা কতক্ষণে শেষ হবে—মাটীর ছাদ উঠবে। একটা যেন কী আশা মনে ওদের। না, সুরেনকে বলতে হবে যে করে হোক্ মাটীর ছাদ টাঁকসই করে তুলতে হবে। মাটীতে গোবর মেশালে, কাঁকড় মেশালে, তুষ মেশালে—চাই কি আলকাতরাও মেশানো চলে; এইসব মেশানো মাটীতে ছাদ মজবুত হবেই। বড় ছাদে যদি ফাটবার ভয় থাকে—ছোট ছোট ছাদ করলেই হবে। আর তা'ছাড়া আমি ছোট ঘরই ভালোবাসি যে। বেশ ছোট ছোট ঘর হবে—এক জায়গায় বসেই হাত বাড়িয়ে এদিককার ওদিককার জিনিষ নাগাল পাবো। ঘরের জিনিষপত্র কাছে কাছে থাকলে মনে হয় যেন ঘরটী আমার আপন ঘর। নীচু ছাদ কাছে নেমে আসে—চারদিকের দেয়াল কাছাকাছি ঘিরে থাকে—বড় আরাম লাগে। নয়তো,—কি বড় বড় ঘর, উঁচু উঁচু ছাদ—ঘরের জিনিষপত্র ঐ কোথায় কোথায়—একটা বই দরকার তো উঠে গিয়ে সেল্‌ফ্ থেকে পেড়ে আনো—সে যেন নিজের ঘরেই পর হয়ে থাকা। আমার এই-মাটীর ঘরে তা' হবে না। ছোট ছোট ঘর হবে সব।

মাটীর বাড়ীর কোথায় একটা ঘরে থাকে থাকে মাটীর হাঁড়ি সাজিয়ে দেয়াল উঠেছে। ছাদেও মাটীর হাঁড়ি সার সার উপুড় করা। গুরুদেব অনেকবার অনেককে বুঝিয়েছেন, গ্রীষ্মকালে ঘর গরম হয়ে যায় বলে

তোমরা,—একটা কাজ করলেই তো হয়। অতি সহজ উপায়। ঘরের চারদিকে মাটীর হাঁড়ি সাজিয়ে তার উপরে চুণ বালির আস্তরা দিয়ে দাও। দেয়ালের মাঝখানে হাওয়া থাকার দরুণ ঘরের ভিতরটা আর গরম হবে না। তোমরা একজন কেউ প্রথমে করে দেখ—পরে অনেকেই করতে পারবে।' কিন্তু 'প্রথম একজন' আর কাউকে পাওয়া যায় না। সকলেই মন দিয়ে শোনেন, কথায় সায় দেন, যুক্তিগুলো মানেন; কিন্তু বাড়ী তোলবার বেলায় পূর্বপুরুষের ঠিক মেনে চলেন। এবারে গুরুদেব নিজেই 'এক্সপেরিমেণ্ট' সুরু করলেন।

বল্লেন,—বেশ তো সুরেন,—সব ঘর যদি না করতে চাও তবে একটী ঘর অন্ততঃ আমার মাটীর হাঁড়ি সাজিয়ে করে দাও। বলছি আমি—খুব ভালো হবে।

নন্দদা আসেন—গাছতলায় বসে 'আকবরী' নক্সা কাটেন; কলা-ভবনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে মাটির দেয়াল দিয়ে মাটীর মূর্ত্তি গড়েন। দক্ষিণ, পূব, পশ্চিমে ছোট বড় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে খোলা বারান্দা। সামনেটী ঘর থেকে ধীরে ধীরে নেমে রাস্তার সঙ্গে মিশে গেছে। ঘরে উঠতে সিঁড়ি ভাঙতে হয় না আর।

বাড়ী শেষ হ'ল। সে বছর পঁচিশে বৈশাখ গুরুদেব সেখানে ঢুকলেন; বল্লেন,—'শ্যামল মাটীর বাড়ী—ঐ আমার 'শ্যামলী—আমার শেষ আশ্রয়।'

বাড়ীর টুকিটাকি আরও কিছু কাজ বাকী, সেগুলি সারা হলেই সম্পূর্ণরূপে বাসোপযোগী হয় শ্যামলী। গুরুদেব অধৈর্য্য হয়ে উঠছেন। বল্লেন,—'এখানে থাকলে কেবলই মনে হ'তে থাকবে কাজ আর এগুচ্ছে না। তার চেয়ে গরমের সময়ে চন্দননগরে গঙ্গার ধারে যাই চল্। বোট আছে ঘাটে বাঁধা—দু'মাস গঙ্গায় সচ্ছন্দে কাটানো যাবে। ফিরে এসে নিশ্চিন্তে শ্যামলীতে থাকতে পারবো।'

চন্দননগরে গঙ্গার উপর এগিয়ে আসা লালবাড়ীতে গুরুদেব আছেন আমাদের দু'জনকে নিয়ে। হুহু ক'রে গঙ্গার হাওয়া ব'য়ে যায় মুখের উপর দিয়ে; খোলা বারান্দায় গুরুদেব শোফার উপর গা এলিয়ে শুয়ে,—পাশে আমি বসে গল্প শুনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা—সকালে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায়। গল্প শুনি সেকালের—যে কালে ঠিক সামনের বাড়ীটিতেই থাকতেন তিনি—নতুনবৌঠান আর জ্যোতিদা'র কাছে। তখনকার গঙ্গায় সাঁতার কাটা—নতুনবৌঠানের সঙ্গে খেলা করা, বিদ্যাপতির গান সুর দিয়ে গাওয়া—সে কত গল্প কত স্মৃতি। গুরুদেব যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতেন সব, সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পেতুম কিছুটা তার। মাঝে মাঝে বলছেন,—কি কুঁড়েমী করে দিন কাটাচ্ছি—লোকে যে অকেজো বলে গাল দেবে আমায় শেষে। আর ঐ দেখ আমার সেক্রেটারী, সকাল থেকে খটাখট্ টাইপ ঠুকে চলেছে ঘরে বসে। কী কাজের মানুষ গো। বাহবা বলতে হয়। যা' তো—এক কাজ কর—একটা কোন ইংরেজী বই নিয়ে আয় বরং,—দু'জনে পড়ি জোরে। পড়বো—আমারও পড়া হবে তোরও শোনা হবে। এ' কয়টা দিন কোনও মতে কাটিয়ে দিয়ে একেবারে শ্যামলীতে গিয়ে কাজ সুরু করবো। ওখান থেকে লিখেছে—শ্যামলীর প্লেট হয়ে গেছে—চারদিকে কঞ্চির বেড়াও দিয়েছে। বেড়ার গায়ে গায়ে বেল যুঁই লাগিয়ে রেখো ফিরে গিয়ে এই বর্ষাতেই।

কিছুদিন বাদে গুরুদেব লেখা আরম্ভ করলেন। দুপুরে রাত্রে লিখে চলেন—বাকী সময়টা গানে গল্পে হাসিতে কেটে যায়। দেখতে দেখতে গরমের ছুটী শেষ হ'ল। শান্তিনিকেতনে ফিরে এলাম। গুরুদেবের আনন্দ আর ধরে না। শ্যামলীকে সাজাতে উঠে পড়ে লাগলেন। বেতফুল সমেত মাটীর কলসীগুলি চলে গেল শ্যামলীর সামনে। গুরুদেব বল্লেন,—'আমার বাতাবীলেবুর গাছটীও চাই—সে আমার কাছেই থাকবে। শ্যামলীর সামনে এনে লাগিয়ে দাও—যেতে আসতে দেখবো পাশে।'

শ্যামলীর চারদিকে পাতিলেবু গাছ লাগালেন, বল্লেন, লেবুফুলের গন্ধ আমি বড় ভালবাসি। যখন লেবু ফুল ফুটবে—দেখিস কী সৌরভ।

বর্ষায় যেখানে যে চারা উঠেছে কিছুতেই তা' সরাতে দেবেন না। বলেন,—'থাক, থাক,—ওরা ঠিক জায়গা দেখেই উঠেছে।'

একপাশে উঠলো জাম, বেল, মাদার, কুরুচি; আর পাশে উঠলো চেঁতুল, আত'; ইউকেলিপটাস। ভিতরের উঠোনে আম গাছ—তলা তার গোবর মাটীতে নিকানো। গুরুদেব কখনও তার তলায় বসেন, কখনও বাতাবীলেবু তলায় চা খান, কখনও গোলকের নীচে ছড়িয়ে-পড়া সাদা ফুলের মাঝে বসে বই পড়েন। শ্যামলীর চারদিক ঘিরে সে যেন এক ছোটছেলের খেলা। আজ দেখি গুরুদেব এখানে সকালে বসে চা' খেয়ে লেখায় মন দিয়েছেন—চন্‌মন্ করে মাথার উপরে সূর্য্য না ওঠা পর্য্যন্ত লিখেই যাচ্ছেন। কাল দেখি আমতলায় আশ্রয় নিয়েছেন। কচি পাতার ডাল মুখে এসে লাগছে হাওয়ার দোলায়। আমের বোল ঝরে পড়েছে মাথার উপরে—ভোঁ ভোঁ করছে ছোট ছোট মৌমাছি হাজারে হাজারে। ঘরেও তাই। দুপুরে এ'কোণায় আছেন তো বিকেলে ঐ কোণায়। ছবি আঁকতে হলে আর একদিক বেছে নিয়েছেন। সারা দিন চলে এমনি। সন্ধ্যে হ'লে এসে বসেন শ্যামলীর সামনে খোলা বারান্দায়। কত রাত অবধি থাকেন সেখানে চুপ করে চোখ দু'টী বুজে। কত কী ভাবেন হয়তো। শুদ্ধ হয়ে পাশে বসে থাকি—ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলিয়ে দিই—শেষে একসময়ে চোখে ঘুমুনী আসে—পা' টিপে টিপে নিজের ঘরে চলে আসি।

একদিন গুরুদেব বল্লেন,—'মেলা এলে আমায় কিছু মাটীর ঘড়া কিনে দিস তো এবারে। শ্যামলীতে মাটীর ঘড়াই মানায়; তা'তেই ফুল সাজানো থাকবে।' সেবারে মেলায় লাল মাটীর কত হাঁড়ি সরা লেলাম কিনে কিনে গুরুদেবের ঘর বোঝাই করলাম। কতক ফুল-সাজানোর কাজে লাগলো, কতক লাগলো ঘর সাজাবার কাজে। ঘরের কোণায় কোণায়, দোরগোড়ায়, কুলুঙ্গিতে জানালাতে মাটীর ঘড়া শোভা বাড়ালো। বসবার ঘরে মাটীর বেদীর উপর তালপাতার তালাই পড়লো। বাঁশের মোড়া, সরুকাঠির চেয়ারে বসে গুরুদেব এপাশ ওপাশ দেখেন আর খুসী হয়ে ওঠেন। মনের সুখে শ্যামলীতে দিন কাটান। খাওয়া শেষে আস্তা বীচি আমের আঁঠি শ্যামলীর চারদিকে ছড়িয়ে ফেলেন—একদিন তা' থেকে গাছ হবে। বলেন—'এত সহজে এখানে আস্তা হয়—আগে জানা ছিল না। এবারে আস্তার বন করে তুলবো চারদিকে—গোরুরা খেয়ে বাঁচবে।'

নানারকম অতিথি অভ্যাগত আসেন দেশবিদেশ হতে—তারা শ্যামলীর ফটো তোলেন—ঘুরে ঘুরে দেখলের কাজ দেখেন—মাটীর ছাদের কথা শুনে অবাক হ'ন।

দেখতে দেখতে বারো মাস পূর্ণ হ'ল। এক বর্ষা গিয়ে আর বর্ষা এলো। এবারে বর্ষা বড় ভীষণ। বৃষ্টির বিরাম নেই—তার উপরে এলোমেলো হাওয়ার দাপট্। মাটীর ছাদে ফাটল ধরেছিল—একদিন বর্ষার জলে তা' ভিজে ভিজে উঠলো। হ'তে হ'তে গোটা ছাদটাই ভিজে গেল। উপরে অবিশ্রান্ত ধারা—আরও কিছুক্ষণ এই চললে ছাদ গ'লে ধসে পড়বে। সকলেই ভয়ে ভাবনায় অস্থির। গুরুদেব একমনে লিখেই যাচ্ছেন, কারও উৎকণ্ঠার কান নেই। বিকেলের দিকে আর চলে না। আকাশ আরও ঘন হ'য়ে এলো—মেঘে বিদ্যুতে, বৃষ্টিতে হাওয়াতে। বহুলোক বোঠানেরা পর পর আসেন—গুরুদেবকে বোঝান, কাকুতি মিনতি করেন—অন্ততঃ আজকের রাতটা যদি উনি 'উদয়নে' থাকেন। গুরুদেব নিশ্চিন্ত মনে তাঁদের কথা শোনেন—ছাদের দিকে তাকান আর মৃদু মৃদু হাসেন। কিছুতে নড়ানো গেল না তাঁকে শ্যামলী থেকে। রাত এলো—গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী সবাইকেই চলে আসতে হল শ্যামলী ছেড়ে। গুরুদেব একা।

সারারাত চমকে চমকে উঠি—বারেবারে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করি। ভয়—কি জানি কি দেখবো সকালে! যেভাবে গলেছে ছাদ—কতক্ষণ আর থাকবে।

ভোর না হতে ছুটে গেলাম শ্যামলীতে। গুরুদেব মাঝের ঘরে দাদামশাই বসে। হেসে বল্লেন,—'জানিস, কাল রাত ছাদ চাপা পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এতবড় খবরটা খবরের কাগজে উঠতে উঠতে ফসকে গেল—কী দুঃখের কথা। আচ্ছা, কাল যে এত ভয় পেয়েছিলি সবাই—ছাদ ভেঙে পড়বে মাথায়, এই হবে, সে হ'বে;—কি হ'ল? কিছুই নয়। বেশ আছি, আমার জায়গায় আমি, ছাদের জায়গায় ছাদ। মিছেমিছি কী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলি আমার জন্য।

সেদিনের তাঁতা কাটলো। গুরুদেব বোঠানকে খুসী করবার জন্য দু'দিন উদয়নে গিয়ে থেকেও এলেন। ছাদটা খানিক ধরলো—খানিক চাকাচুকি দিয়ে সে বর্ষা কাটলো। পরে ফিরে মেরামত করা হ'ল।

এবার আবার বদলাবার পালা। গুরুদেব দেখলেন শ্যামলীর গেট-টা কাজে লাগে না—বরং দূরের পথ দেখতে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং তা ভেঙে ফেলা হোক। বাঁশের বেড়া তুলে ফেলা হ'ল—ওটা অকারণ। মাটীর কলসীর বেরসুল গাছ মাটীতে ছাড়া পেল।

গুরুদেব বল্লেন—চারদিকে জিনিষে পত্রে ঠাসা—এর মাঝে আমি বন্দী হয়ে আছি। একটু হাত পা ছড়াবার জায়গা নেই। আমি চাই খোলা মেলা একটী ঘর; তা' নয়—সেখানেই রাখো—এগুলি সব আমার চারদিক ঘিরে থাকবে। বনমালী বলে 'এগুলো সবই যে আপনার দরকার লাগে; সরাবো কি করে?' কী মুস্কিল, ছোট ছোট ঘরে জিনিষ পত্র বই টেবিল বোঝাই—তার মধ্যে থাকতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠি। সুরেন, আমায় একটী ঘর করে দাও—পাশেই। একখানা শুধু ঘর আর চারিদিকে খোলা বারান্দা। জিনিষ-পত্র কিছু থাকবে না তা'তে। আমার বইএর দরকার পড়বে—বলবো কাউকে 'যাও তো—

আমার অমুক বইটা এনে দাও দেখি শ্যামলী থেকে। হং এর দরকার—শ্যামলী থেকেই নিয়ে আসবে; আবার কাজের শেষে যেখানকার জিনিষ সেখানে রেখে আসবে। নতুন ঘরে থাকলো শুধু আমি আর আমার হাতের একটী খাতা—কি বই।

ঘর আরম্ভ হ'ল—শ্যামলীর প্রায় লাগা। কারণ শ্যামলীতেই সব জিনিষ থাকবে—দরকার মতো এনে এনে দিতে হবে। গুরুদেব বল্লেন,—'এই নতুন ঘরে বিছানাও থাকবে না। কি, ঘরের মেঝে-কোড়া শোবার খাট, দিনরাত বিছানা পাতা—ভালো লাগে না দেখতে। এবারে খাট হবে—তিন টুকরো তক্তা দিয়ে। রাত্রে টুকরো কয়টী জোড়া দিয়ে তার উপরে বিছানা হবে; সকালে আবার তা' আলাদা করে সেই দিয়েই ঘর সাজানো চলবে। কত সহজ ব্যবস্থা! রাতের খাট সকালে ভেঙে ঘরের তিন দিকে ঠেলে দাও—বসবার 'সিট' হ'য়ে গেল। যারা দেখা করতে আসবে—তারা তা'তেই বসতে পারবে। মিছিমিছি কতকগুলি আসবাব পত্রের কিছু দরকার নেই।'

ঘর তৈরী হল—খাটও হ'ল, তিনটে বড় বড় কেরোসিন কাঠের সিন্দুক; গায়ে খোপ কাটা কাটা। সিন্দুকের ভিতরে থাকবে রাতের ওয়াক বালিশ, খোপে খোপে থাকবে বই খাতা পত্তর হাতের কাছের দরকারী জিনিষ।

দেখে গুরুদেব বল্লেন,—'এই এতদিনে ঠিকটী হল যেমনটী আমি চেয়েছিলুম। এ' ঘরে আর ভিড় নয়। পালাও সব। কেউ ঢুকতে পাবে না; ঐ শ্যামলীতে গিয়ে দেখাশোনা করবো দু'বেলা সকলের সঙ্গে। তবে, হাজির থেকো কাছাকাছি—শ্যামলী থেকে বইটই এনে দিতে হবে মাঝে মাঝে।'

খানকয়েক বই নিয়ে গুরুদেব নতুন বাড়ী 'পুনশ্চ'তে ঢুকলেন। বল্লেন,—'টেবিলটাও না হয় আন। ওষুধের শিশিগুলিওতো চাই। আচ্ছা, ছবির রংগুলো যে ওখানে রইলো আমার যদি রাত্রে ছবি আঁকতে ইচ্ছে যায়, তখন তো ঘুম ভাঙিয়ে তোমায় তুলে আনতে পারি নে,—আমার অমুক অমুক রংটা দিয়ে যাও ব'লে।'

কয়েক দিনের মধ্যেই শ্যামলী খালি হয়ে গেল। গুরুদেব বল্লেন, সুরেন—এই 'পুনশ্চ'র পূবের বারান্দাটা যদি কাঁচ দিয়ে ঘিরে দাও তবে কাঁচের ভিতর দিয়ে আমার দেখারও কোন অসুবিধে হবে না, উপরন্তু আমার কিছু কিছু জিনিষ সেখানে রাখতে পারি।

পূবের বারান্দা কাঁচ দিয়ে ঘেরা হল। গুরুদেব বল্লেন,—'দক্ষিণের বারান্দায় বৃষ্টির ছাট আসে—সারাদিন সেখানে বসে লিখি—জলের ছাটে অসুবিধা হয়।'

দক্ষিণের বারান্দাও কাঁচ দিয়ে ঘেরা হ'ল।

পশ্চিমের বারান্দায় উত্তরে হাওয়া লাগে—তা'তেও কাঁচ ঘেরা হ'ল।

গুরুদেব বল্লেন,—একটী ঘরে ভদ্রতা বজায় রাখা যায় না। কেউ এলে বসতে জায়গা দিতে পারিনে। এই দিকে একখানা ঘর যদি তুলে দেয় তবে কেউ এলে অনায়াসে সেখানেই দেখাশোনা কথাবার্ত্তা হ'তে পারে।

পশ্চিম দিকে ঘর উঠলো। গুরুদেব ঢাকা বারান্দা ছেড়ে সামনের খোলা বারান্দায় এলেন। সকালবেলা কিছুক্ষণ যেতে না যেতে মাথায় রোদ উঠে পড়ে; গুরুদেবের বাইরে রোদে বসে থাকতে কষ্ট হয়। বল্লেন, —সুরেন, বারান্দার পূর্বদিকে যদি একটা খাড়া দেয়াল তুলে দাও তবে রোদ আটকায় খানিকটা। সকালে বেশ কিছুক্ষণ তা'হলে এখানে বসেই কাটিয়ে দিতে পারি। নয়তো তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকতে হয়—আমার ভালো লাগে না।

বারান্দার পূর্বদিক জুড়ে খাড়া দেয়াল উঠলো।

পশ্চিম দিকের রোদ সারাটা বিকেল বারান্দা তাতিয়ে রাখে। বিকেল বেলাটা বাইরে এসে বসা হয় না। ওদিকেও এম্‌নি দেয়াল তুললে ক্ষতি কি?

তাই হ'ল। পশ্চিম দিকেও খাড়া দেয়াল উঠলো। গুরুদেব সকাল বিকেল দু' দেয়ালের ছায়াতে আশ্রয় নিলেন, দিন যায়।

হঠাৎ একদিন বলে উঠলেন,—'একি হ'ল? আমি কি এ-ই চেয়েছিলুম? আমি কবি মানুষ—খোলামেলা নীল আকাশ দেখতে ভালোবাসি; আর আমাকেই কিনা এমনি করে ঘিরে রেখেছে, একটু নীল আকাশ দেখতে পাইনে আমি—এমনি দুরবস্থা হ'ল আমার! রথী, এবারে আমার একটা ঘর করে দে—যা'তে করে আমার আকাশ দেখায় বাধা না পড়ে, এক কাজ কর,—চারটা উঁচু থামের উপরে একটা ঘর তুলে দে। আমি সেখানে বসে শুধু চারদিক দেখবো।

বিকেল বিকেল গুরুদেব পায়চারী করেন—উত্তরায়ণে আশে পাশে জায়গা খুঁজে বেড়ান। শেষে বল্লেন,—'না, এবারে জায়গা খুঁজে বাড়ী করবো না। বাড়ী তুলে তারপর জায়গা ঠিক করবো। এই কঙ্কর-কুঙ্কই ভালো; —কি বলিস? কত গাছ—এর কয়েকটা গাছ কাটা পড়বে; তা'আর কি করা যাবে! অগুণতি বাড়ীর গায়ে গায়ে থাকলেই বা—মন্দ কি?'

চার থামের উপরে ঘর উঠলো। সেঁজুতি বই বের হ'ল। গুরুদেব বল্লেন,—'এ বাড়ীর নাম হবে সেঁজুতি। 'পুনশ্চ' বই-এর সঙ্গে 'পুনশ্চ' বাড়ী হ'ল। সেঁজুতির সঙ্গে সেঁজুতি বাড়ীও হবে। এক একটা বই-এর সঙ্গে এক একটা বাড়ী। বিশ্বভারতী কতদূর হয়ে যাবে তবে—কি, বল্ না?'

পরে সেঁজুতি নাম বদলে বাড়ীর নাম দিলেন 'উদিচী'। বল্লেন,—পূবদিকের বাড়ী আমার—এই নামই ঠিক।

উদিচীতে গিয়ে গুরুদেব খুব খুসী। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—চারিদিক অনেকদূর অবধি দেখা যায়। বল্লেন,—'এত ব'লে ব'লে ঠিক বাড়ীটী হ'ল এতদিনে।'

গুরুদেব নেমে এলেন নীচে—বাগানে বেড়াবেন। খানিক পায়চারী করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। থামের পাশে বসে পড়ে বল্লেন—'শুধু শুধু চারটে থাম পড়ে আছে—কোনও কাজে লাগছে না। অথচ এই থাম কয়টাকে ঘিরে দিলেই তো বেশ একখানা ঘর হয়ে যায়। তা'হলে আর কষ্ট করে বারে বারে আমায় উপরে উঠতে হয় না। কোন দিন ইচ্ছে হল নীচে নামলুম—নীচেই র'য়ে গেলুম।

কয়দিন বাদে নীচের ঘরখানাও তৈরী হ'ল। উপরে নীচে দু'খানি ঘর। যখন ইচ্ছে গুরুদেব নীচের ঘরে থাকেন—যখন ইচ্ছে উপরে ওঠেন।

মনে মনে অপেক্ষা করছি—'উদিচী'ও তাঁর পুরোনো হয়ে এলো বলে। দেখি—এবারে কি অনুজ্ঞা তোলেন গুরুদেব।

সময় পেলেন না।

সেই বছরই—যে বছর শ্যামলীর ইউকেলিপটাসে থোকা থোকা ফুল এলো, নেবু গাছে নেবু ধরলো, জামের বোলে গাছ ভরলো—ডালে ডালে আতা ফললো—গাছ ছেয়ে তেঁতুলের ছড়া নামলো—গুরুদেব একদিন কালিংপঙে রওনা হ'য়ে পড়লেন।

কি রেখে এলুম

আজ পায়ের দিকে যাত্রা করেছি পিছনের ঘাটে কী রেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো। আশা করবো মহাপ্রলয়ের পরে তৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটী নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।

রবীন্দ্রনাথ

—মৃত্যুর তিন মাস আগে লিখিত

ভিজে খড়

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চারদিকে চাপা অসন্তোষ যেন থম থম করে।

মনে হয়, মেঘ আছে অথচ বিদ্যুৎ নেই। মড়ের নিশানা নিয়ে এক একবার দেখা দিতে থাকে, পরক্ষণেই উড়ে যায় এক একটা দমকা হাওয়ার ঝাপট লেগে। চোখের নীচে চকমকির স্ফুলিঙ্গ উঁকি দিয়েই আবার হারিয়ে যায়—মিলিয়ে যায় পাথরের মতো নিরন্ধ্রাপে শক্ত কঠিনতার আড়ালে।

মাকড়সার জালে আটকে-পড়া মাছির অশ্রান্ত পাখনা নাড়বার মতো মাথার ওপর ঘুরতে থাকে পাখা। শুধু পাখাগুলোই নয়—সমস্ত হলঘরটাই যেন একটা বিরাট জাল—লালাসিক্ত ফাঁস টেনে টেনে শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চায়।

লিখতে লিখতে হঠাৎ কলম বন্ধ করে হর্ষনাথ। ঘুম জড়িয়ে আসবার মতো চোখ দুটো আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ঘুম নয়, ক্লান্তিও নয়। তার চাইতে বেশি—বেশি বেশি। ঘাড়ে তীব্র একটা যন্ত্রণা মোচড় খেয়ে ওঠে, টনটন করতে থাকে মেরুদণ্ডটা। মনে হয় যেন তেতলার এই ঘর থেকে চেয়ারটা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে—নেমে যাচ্ছে—ক্রমশ পাতালের একটা কালো অন্ধকারে যেন তলিয়ে যাবে।

পারা যায় না—আর পারা যায় না।

খস্ খস্ করে কাগজ ওড়বার শব্দ আসে, আসে ফাইল-ফিতে কার্বনপেপার কালির গন্ধ। হলঘরের ওপ্রান্ত থেকে চারটে টাইপ-রাইটারের আওয়াজ ওঠে—আচমকা হর্ষনাথের মনে হয় তাদের দেশের বাড়িতে টিনের চালের ওপর অমনি শব্দ করেই নামে বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টির ধারা।

বাঁ দিকের টেবিলগুলো থেকে চাপা অথচ তীব্র আলোচনার ঝাপটা আসছে। হৃষীকেশ সেন, দীপেন মল্লিক আর শঙ্কর মৈত্র। আরো জনকয়েক আছে বটে, কিন্তু এই তিনজনই প্রধান। এরা তর্ক করে, তর্ক করে অশ্রান্তভাবে। নতুন ছোকরাদের মধ্যে হালে পার্মানেন্ট্ হয়েছে দীপেন, কিন্তু হৃষীকেশ আর শঙ্করের আগামী রিট্রেঞ্চমেন্টে যে চাকরী যাবে এ প্রায় অবধারিত। ইউনিয়ান গড়বার কাজে এ দুটিই প্রধান পাণ্ডা—এ্যাকাউন্ট্স্ সেক্শনের এ দুটি বিষবড়ির অস্তিত্ব সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ পুরোমাত্রায় সচেতন।

—সোজা কথায়, তোমরা তাহলে আমতে চাও ইউনিয়ান।

—মোটেই না। তোমরা একটা পার্টির ডিক্টেশানে চালাতে চাও ইউনিয়ানকে। আমাদের আপত্তি সেইখানে।

তোমাদের ওই রেড্ বগিই একমাত্র সবল। কিন্তু পরিণামটা ভেবে দেখেছ? সমস্ত ট্রেণ্‌টাকে শেষ করে দিচ্ছ। একবার যদি আমরা হারি তাহলে চিরদিনের মতো শেষ করে যেবে, আর মাথা তুলতে হবেনা কখনো।

সভ-পার্লামেণ্ট-হওয়া দীপেন একটা কিল বসিয়েছে টেবিলে: হারব কেন? Slow and steady wins the race। তোমরা সবসময়েই একটা গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টায় আছো। Remember, it is national-Government—and—and—

আরো কী বলতে চায় দীপেন। কিন্তু কথাটা শেষ হওয়ার আগেই শঙ্কর হেসে ওঠে হো হো করে। তার ফাঁকে ফাঁকে দীপেনের ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যায়: সব জিনিস হেসে উড়িয়ে দিলেই চলেনা, জেনো। তোমরা যখন তখন অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে চাও। কিন্তু সকলে ও রিস্ক নিতে পারে না। তাদের ছেলেপুলে আছে, সংসারের দায়িত্ব রয়েছে—তা ছাড়া it is—it is—

কোথায় প্রবল শব্দে একটা কলিং বেল বেজে ওঠে, তার কাঁপা কাঁপা বিশ্রী আওয়াজে বাকী কথাটা শোনা যায় না দীপেনের। কিন্তু শোনা না গেলেও জানে হর্ষনাথ। দীপেনের তর্ক শুনতে শুনতে প্রায় মুখস্থ হয়ে যায়। It is national Government—

তা বটে। স্বাধীনতা পাওয়া গেছে নিঃসন্দেহ। বহু কষ্টে চোখ দুটো মেলে ধরে হর্ষনাথ, দৃষ্টি পড়ে লালদীঘির ওপারের বড় গথ্‌টার দিকে। প্রকাণ্ড ঘণ্ডের সঙ্গে প্রকাণ্ডতর পতাকা উড়ছে একটা। এককালে ইউনিয়ান জ্যাক্ ছিল, এখন তিনরঙ্গা। রঙ্ বদলের পালা প্রথম প্রথম নেহাৎ মন্দ লাগেনি—বেশ নতুন রকমের লাগত। কিন্তু জলে-বৃষ্টিতে পতাকাটার রঙ্ ফিকে হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একঘেয়ে হয়ে গেছে। সেই মেরুদণ্ডের টনটনে যন্ত্রণা, ঘাড়ে সেই তীব্র যন্ত্রণার অনুভূতি—চোখ বুজে আস্তে আস্তে চেয়ারটার পীঠের দিকে তলিয়ে যাওয়ার সেই পুরোনো আর উদ্ভট কল্পনা, এদের সঙ্গে সঙ্গে পতাকাটাও একাকার হয়ে গেছে, লিখতে লিখতেচশমার কাচে যখন ঘোঁয়া ঘোঁয়া কী জমে উঠতে থাকে, তখন কেমন যেন ওটাকেও ইউনিয়ান জ্যাক্ বলে মনে হতে থাকে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটাকে একবার মুছে নেয় হর্ষনাথ। নাঃ—বসে থাকলে চলবেনা। হাতে কাজ—জরুরী কাজ। আবার কাইলের কাঁটাবনে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হয়।

অ্যাকাউণ্ট্‌স সেক্‌শন। যোগ-বিয়োগের অঙ্কগুলো মাইক্রোস্কোপিক ছবির একরাশ ব্যাক্‌টিরিয়ার মতো কিলবিল করে। যেন জীবন্ত হয়ে কাগজের ওপর নড়ে নড়ে বেড়ায়।

কত টাকা—কত লাখ লাখ টাকা। মাথা ঘুরে ওঠে। এতগুলো টাকাকে একসঙ্গে সামালে কতটা উঁচু হয়ে উঠবে? মনুমেণ্টের মতো? কী জানি—ভাবতে পারা যায় না। কেমন যেন মাথা গুলিয়ে ওঠে হর্ষনাথের। পকেটে রুমালটা রাখতে গিয়ে ট্রামে ভাড়া আর বিড়ির বাকর চৌদ্দটা পয়সা ঝিন ঝিন করে সাড়া দেয়।

বাঁদিকের টেবিলে আবার তর্ক উঠেছে নতুন করে। বিরক্তি বোধহয়, অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়। নিজেরা কাজ করবেনা, আর কাউকে করতেও দেবেনা নাকি ওরা? এতকথা বলবার উৎসাহ কোথা থেকে যে পায় আশ্চর্য! অথচ বাড়িতে ফিরে অন্ধকার ছাতের ওপর যখন শরীর মেলে দেয় হর্ষনাথ, তাকিয়ে থাকে নক্ষত্রগুলোর দিকে, তখন মাধুরী একটা কথা বলতে এলেও অসহ্য বিতৃষ্ণায় পিত্তি পর্যন্ত জ্বালা করে ওঠে তার।

খেঁকিয়ে বলে, আঃ—বকর বকর থামাও একটুখানি, একটু চুপ করে থাকতে দাও।

তবু চুপ করে থাকা যায় না। বাকটিরিয়ার মতো আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে আবার তৃষ্ণি কাপসা হয়ে আসে হর্ষনাথের।

—রেশনের চাল থেকে আধসের কাঁকর বেরুল—মাধুরী এসে জানায়।

—তবে কি সোনার দানা বেরুবে?—হর্ষনাথ খিঁচিয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মাথার ওপরে নক্ষত্রগুলো ঝলমল করে—কোলে হতে মাথা সাদা কাঁকরের মতো মনে হয় ওগুলোকে। বাতাসে পাশের বাড়ির ছাতের টবে রাখা কার্ব-পাতার খস্ খস্ আওয়াজ ওঠে, যেন অফিসে ফাইলের পাতা উল্টছে।

—শুনছ, এ কী তেল আনলে? সবটাই যে পাস।

—ওই দিয়েই পেটের পাপ ভরাতে হবে—রাগের চোটে এবার অনুপ্রাস বেরিয়ে আসে হর্ষনাথের।

খানিকক্ষণ আবার চুপ করে থাকতে চেষ্টা করে হর্ষনাথ। অত্যন্ত বিশ্রীমুখ করে একটা হাসির কথা মনে করতে চেষ্টা করে। কী যেন—কী যেন একটা কথা। ওদের ডেপুটি কন্ট্রোলারের পেটমোটা কুকুরটাকে নিয়ে কী যেন মারাত্মক একটা হাসির কথা—

কিন্তু মনে পড়ে না। নীচ থেকে কান্নার শব্দ আসে। একটানা কান্না, অস্বস্তিকর কান্না। এবার মাদুরের ওপর থেকে ভেঙে-পড়া অনিচ্ছুক শরীরটাকে টেনে তুলে উঠে বসতে হয় হর্ষনাথকে। রক্ত গরম হয়ে ওঠে অমানুষিক বিরাগের আবেগে।

—কী হল, অত চেঁচাচ্ছে কেন খুকি?

হর্ষনাথ চেঁচিয়ে ওঠে নিজেও। তীক্ষ্ণ আনুনাসিক স্বর, হুইশিলের ভেতরকার ছুচির টুকরোর মতো কী একটা সে চীৎকারের সঙ্গে ঘষ্ ঘষ্ করে মাড় বাধিয়ে ওঠে।

—পেট কামড়াচ্ছে—এবার ঝাঁকালো জবাব আসে মাধুরীর। সয়ে সয়ে তারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে।

—কেন পেট কামড়ায়?—তেম্নি হুইশিলের মতো আওয়াজ করে হর্ষনাথ: ওই ঘরের ওপর আবার খানিকটা ভেজে-ভাজা খেয়েছে বুঝি? খেয়েছে ঘুগ্নি-দানা?

—না—শক্ত আর তিক্ত শোনায় মাধুরীর স্বর: তুমি দোকান থেকে যে বিস্বাদ আটা এনেছ, তাই খেয়ে।

হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায় হর্ষনাথ। হইশিলের আওয়াজ থেমে আসে।

—কেন, ছেলে নিতে পারোনি?

—আধাআধি ছেলে তো বার দিয়েছি, ঝাড়তে ঝাড়তে হাত ব্যথা হয়ে গেছে। আর চালা যায় না, সবটাই ফেলে দিতে হয় তা হলে।

নাঃ, অসম্ভব। মেয়েলোকের সঙ্গে তর্ক করে পারা যায় না। পরাজিতের মতো চুপ করে যায় হর্ষনাথ, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যেতে হয় ওই কান্নার শব্দটা।

ওপাশের টেবিলে দীপেন আবার উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

—বড্ড বাড়াবাড়ি করছ তোমরা, তোমরা বড় বেশি বাড়িয়ে ফেলছ।

—নইলে তোমার মতো দালালী করে পার্মানেণ্ট হওয়ার চেষ্টা করব নাকি?—শঙ্করের একটা বিষাক্ত টিপ্পনী।

—আমি বলে দিচ্ছি—ক্রুদ্ধ দীপেন টেবিলে কিল বসায় একটা: পাখা উঠেছে তোমাদের, পুড়ে মরবে এইবারে।

আঃ, খালি তর্ক করে, খালি কথা বলে ওরা। ভালো লাগে না হর্ষনাথের। কথার যুদ্ধ করে যাক, আসুক ছুটো একটা ধর্মঘটের বান, কিন্তু কী হবে তাতে? আবার যে-কে সেই। কিছু হবে না, কিছু হয় না। লিখতে লিখতে ঘর্মাক্তমুখে চশমার কাচে ধোঁয়া জমে উঠবে, চেয়ারটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকবে পাতালের দিকে, হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়ে আর প্রভেদ বোঝা যাবে না জাতীয় পতাকার সঙ্গে ইউনিয়ন জ্যাকের।

খাতার ওপর কুণ্ডলী পাকাতে থাকে একরাশ ব্যাকটিরিয়ার মতো অতিকায় টাকার অঙ্কের সংখ্যাগুলো।

ও কী? ও কীসের শব্দ?

অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়বার মতো মুহূর্তে সমস্ত অফিসটা দাঁড়িয়ে উঠেছে।

—রেশন বাড়াতে হবে—

—আরো চাল চাই—

—আমাদের দাবী মেটাতে হবে—

—আমাদের বাঁচাতে হবে—

বাঁচতে সবাই চায়, দাবীও করে অনেকেই। কিন্তু কজনের অধিকার আছে, কজনের আছে সুযোগ? এমন অনেক দাবীরই পরিণতি চোখের সামনে দেখেছে হর্ষনাথ। লাঠি এসেছে, টিয়ার-গ্যাস এসেছে, ইট-পাটকেল আর সোডার বোতল ছুঁড়ে মেরেছে ওরাও। নিজের চামড়া বাঁচিয়ে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে নিরাসক্ত দর্শকের দৃষ্টিতেই দেখেছে হর্ষনাথ। এমন হয়, হয়েই থাকে। তিরিশ সালে যখন কলেজে পড়ত হর্ষনাথ, তখন আইন অমান্য করে পুলিশের লাঠি সেও খেয়েছিল। কিন্তু কী আসে যায়। অনেক তদ্বির করে চাকরী জুটেছে, বুকের রক্ত কলমের কালির মুখে ঢেলে দিয়ে সে চাকরী বজায় রাখতে হয়।

কিন্তু আজ নতুন রকম। আজ আলাদা। আজ হর্ষনাথেরও বিস্ময় বোধ হচ্ছে। ঝড়ের ঝাপটা ঘরের মধ্যে দিয়েও পৌঁছেছে।

মেয়ে। ভদ্রঘরের মেয়েরা। বোবা আর ক্লান্ত যাদের চোখের দৃষ্টি, আরের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য করে সংসার-চালানোর সাধনায় যাদের অষ্টপ্রহরের ব্রত।

তারাই শোভাযাত্রা করে এসেছে! এসে পৌঁচেছে ড্যালহাউসি স্কোয়ারে!

ডেপুটি কন্ট্রোলার আফিস থেকে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে কী বললেন একটা, কেউ শুনল এমন কি, এমন কি দীপেনও নয়।

শুধু বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সকলে। স্তব্ধ হয়েই দাঁড়িয়ে আছে তেতলার করিডোরে রেলিং ধরে। শুধু কথা নয়, শুধু তর্ক নয়। সত্যিই ঝড় এসেছে তা হলে। বাসা-ভাঙা কবুতরের মতো সেই ঝড়ে বেরিয়ে এসেছে—ছাঁা—মেয়েরাও!

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টাইপিষ্ট্ ডি কস্টা প্যাণ্টের পকেটে দু'হাত পুরে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে মজার মৃদু হাসি। অত্যন্ত কৌতুকবোধ করছে লোকটা।

একটা অশিষ্ট মন্তব্য করে বসে ডি-কস্টা। করে অবশ্য চাপা গলাতেই। কিন্তু কথাটা শুনতে পায় হর্ষনাথ। মেরুদণ্ড শক্ত হয়ে ওঠে—কী যেন তার ভেতর দিয়ে বয়ে চলে যায় বিদ্যুৎ চমকের মতো। কাপসা ঘোলাটে চোখে চক চক করে ওঠে ছাই-চাপা আগুন।

—শাট্ আপ্!—বাঘের মতো গর্জন করে ওঠে হর্ষনাথ।

নীচের শোভাযাত্রার দিকে নয়, এবার সমস্ত চোখগুলো ফিরে আসে করিডোরে।

এগিয়ে যায় হর্ষনাথ, শিথিল পেশী হাতটাকে একটা আকস্মিক শক্তিতে লৌহ-কঠিন করে চেপে ধরে ডি-কস্টার টাইটা।

—আবার বলো কথাটা—সোজা নীচে ফেলে দেব এখান থেকে।

সকলের আশ্চর্য দৃষ্টি এসে পড়ে হর্ষনাথের ওপরে। এমনকি কস্টাও ভয় পায় তার চাইতেও বেশি বিস্ময় বোধ করে ডি-কস্টা। রুগ্ন, জীর্ণ, দালটানা গাড়ির হাড়-বের-করা গরুর মতো হর্ষনাথ। হঠাৎ কোথা থেকে পেল এই সিংহের শক্তি—এই দুর্জয় সাহস!

নীচে থেকে সোডাওয়াটারের স্বর আসে—শরীরের ভিতর উনিশ শো তিরিশ সালের বন্যার ডাকের মতো কী যেন দুলে দুলে যায় হর্ষনাথের। টাইটাতে এমন টান পড়ে যেন দম আটকে আসে ডি-কস্টার। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, এক্সকিউজ্ মি।

—এক্সকিউজ্ মি! রাস্কেল,—কুকুর দিয়ে খাওয়ানো উচিত—ভাঙ্গা উইণ্ডশিল্ডের আওয়াজটা যেন আহাজের গম্ভীর বাঁশির মতো শোনায়: ভেবেছ এদিন থাকবে—হিংস্র উত্তেজনায় হর্ষনাথ হাঁপাতে থাকে:

অভিভূত অবস্থাটা কেটে গেলে হৃষীকেশই এসে ছাড়িয়ে নেয় ডি কস্টাকে।

—যেতে দিন হর্ষদা—যথেষ্ট হয়েছে—

—তুমি বুঝতে পারছনা···এরাই—হর্ষনাথের দম আটকে আসে: এরাই, এরাই আমাদের—

—বুঝেছি।—প্রশংসাভরা দৃষ্টি হর্ষনাথের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে হৃষীকেশ বলে, কিন্তু ছুঁচো মেরে আর হাত গন্ধ করে কী হবে হর্ষদা?

ফিরতি-ট্রামের দুঃসহ ভিড়ে বাদুড় ঝোলা হয়ে, দুলতে দুলতে রামমোহন সাহা লেনের আরো ছোট অন্ধকার গলিপথটায় যখন পা দেয় হর্ষনাথ, তখন কল্পনার ধোঁয়া জমাট বিষ-বাষ্পের মতো সে জায়গাটা আচ্ছন্ন করে আছে।

জ্বালা-ধরা চোখে, কাশি চাপতে চাপতে আর অসহ্য অবসাদে ভেঙে-আসা শরীর নিয়ে দোতলায় ওঠে হর্ষনাথ। একগ্লাস জল চাই, এক কাপ চা চাই।

হাতের ছাতাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হর্ষনাথ চেঁচিয়ে ওঠে: আঃ, গেল কোথায় এরা সব? নিরুদ্দেশ নাকি?

ছাত থেকে মাধুরী নেমে আসে।

—কোথায় থাকো? অফিস থেকে সবে ফিরলাম, এখন আড্ডা দিতে না গেলেই চলেনা?

—না, আড্ডা নয়, নয়।—মাধুরী কৈফিয়তের স্বরে বলে, ও বাড়ির ছোড়দির সঙ্গে কথা কইছিলাম। আচ্ছা—মাধুরীর গলায় একটা উৎসাহিত জিজ্ঞাসা: হ্যাগা, আজ নাকি সব মেয়েরা মিছিল করে গিয়েছিল ডালহাউসি স্কোয়ারে?

—হ্যাঃ—হ্যাঁ—গিয়েছিল।—হর্ষনাথ আবার দপ করে জ্বলে ওঠে: কিন্তু তাতে তোমার কী? অফিস থেকে এসে চেঁচিয়ে মরছি—চা দিতে পারো না এক কাপ?

—কিছু জিজ্ঞেস করলেই অমন খেঁচিয়ে ওঠো কেন বল তো?

—নাঃ, খিদে নেই! একেবারে সুখের দোলা চৌবলায় চেপে বসে আছি কিনা!—বর্ধনাথ বিশ্রী বিতৃষ্ণ মুখ করে বলতে থাকে: বুড়ো বয়সে সখ হয়ে থাকে তো তুমিও যাও না।—তাড়া হুইশিলের মধ্যেকার কাঁকরটা খুব খর করে ওঠে: তারপর পুলিশের লাঠি খেয়ে লালবাজার ঘুরে এসো। যত সব—

আবার অন্ধকার—আবার ছাত। মানুষে শরীরটাকে নিশ্চিন্তভাবে এলিয়ে দিয়ে নক্ষত্র-বিলাস। কিন্তু নক্ষত্রগুলোর রং ঝোল-মাখা সাদা সাদা কাঁকরের মতো।

গলির মধ্যে তখনো পাক খাচ্ছে কয়লার ধোঁয়া। উঠে এসেছে ছাতের ওপরেও—এখানেও চোখ জ্বালা করছে।

কালই একটা কাকে নিরিবিলিতে সাপ চেয়ে নিতে হবে ডি-কস্টার কাছে। লোকটা ডেপুটি-কন্ট্রোলারের অত্যন্ত পেয়ারের লোক—ওকে চটানোর সত্যই কোন মানে হয় না।

প্রচ্ছন্ন ভোগাসক্তি

আমাদের কর্ম-অনুষ্ঠান বারবার কেন দুর্বল হয়ে গেছে, তার কারণ কি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো না? তার একমাত্র কারণ এই যে, উত্তেজনাকে সম্ভোগ করবার জন্যে আমাদের এত বেশী উৎসাহ যে, কাযটাকে সিদ্ধ করার জন্যে সে উৎসাহ বেশী বাকী থাকে না। বস্তুত এটা সাধনার ছদ্মবেশে ভোগসুখে মত্ত হওয়া। তপস্যায় যে কর্ম যোগ বলেই সিদ্ধ হতে পারে, সে কর্ম ভোগাসক্তের দ্বারা হতে পারে না। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ত্যাগের ভেক ধারণ করা, জেলখানার অভিমুখে হল্লা করে ছুটে যাওয়া, ধুন্ধুমার করে দুঃখ পাওয়া, অবশেষে সেই দুঃখের পরিমাণ ও অন্যায়তা নিয়ে খবরের কাগজে—কোন্সল করা অবস্থা বিশেষে এ সমস্তও ভোগাসক্তি, এতেও শক্তিনাশ হয়, কর্মনাশ হয়।

রবীন্দ্রনাথ

সন্তান

জ্যোতির্ময়ী দেবী

সুমন্ত চক্রবর্তীর পিতামহের ছিল একটি প্রকাণ্ড টোল, একটী পরিপুষ্ট শিখা আর একগাছা সাদা উপবীত। সে আজ প্রায় একশো বছর আগের কথা। তাঁর ছেলে সুমন্ত চক্রবর্তীর পিতার আমলে সে টোল গেল উঠে। তাঁর রইল যজনযাজন ও আনুসঙ্গিক মাঝারি রকমের একটি টিকি আর পৈতা। তাঁর ছেলে সুমন্তর নিজের জীবিকা হ'ল সরকারী বড় চাকরী, তার ঠেলায় টিকি হয়ে গেল ছাঁটের তলায় অদৃশ্য রকমের ছুঁচ, প্রকাশ্যে রইল শুধু উপবীত। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য খাদ্য-অখাদ্য তিনি সুবিধামত মানতেন এবং মানতেন না।

তারপর দিনকাল যাচ্ছে বদলে নিত্যই। সময় হয়েছে খারাপ বা আর এক রকম। কয়েক বছরের মধ্যেই এটা সেটা বিল বা আইন পাশ হচ্ছে, হচ্ছে, হচ্ছে না। আবার আসছে হাতবদল হয়ে আর এক হাত দিয়ে। এমনি করে প্যাটেল বিল, গৌরী বিল এলো, গেলো, আবার এলো। সারদা বিল পাশ হয়ে গেল। তারপর এলো সেদিন দেশমুখের বিল। সেও গেল। রূপান্তরিত হয়ে এলো রাও বিল।

আর সুমন্ত চক্রবর্তীও এতদিনে রিটায়ার করেছেন। এবং উদ্বিগ্ন, উন্মনভাবে একবার উঙ্কন সেই কোন্ পিছনে? একবার অন্ধকার সামনে চাইছেন। কিন্তু তার মাঝেই ছেলের জন্য জোগাড় হয়েছে ভাল সরকারী চাকরী। মেয়ের আসছে ভালো সম্বন্ধ। মেয়েকে গৌরীদান বা কন্যা দান করেননি। বলেন, সারদা বিলের জন্য। কিন্তু তার সীমা তো ষোল বছর। আসলে তা নয়, পড়ানোর প্রকাণ্ড ইচ্ছা গৃহিনীর, উহ্য ইচ্ছা নিজের এবং স্পষ্ট আধুনিক ইচ্ছা ছেলের। তাছাড়া বিয়ের বাজারের যাবতীয় সৎপাত্রগুলিরও তাই মনের ভাব। তা' যার সঙ্গে বিয়ে হোক না কেন।

ছেলে তাঁর একটী, মেয়েও একটী। ছেলে বুদ্ধিমান, জানে, কিছুই ভাবনা নেই। বাবা তার জন্য সব ভেবে রেখেছেন। বাড়ী, গাড়ী, চাকরী, ব্যাঙ্কের খাতা, কোম্পানীর কাগজ সব ঠিক আছে। মেয়ে সুমিতাও বুদ্ধিমতী। সেও জানে বাবা তার জন্যও ভেবেছেন। কিন্তু কি ভেবেছেন তা সে অত জানে না, বা ভাবে না। সে শুধু ভাবে, বাবা আর মা তার জন্য ভাবেন। কোম্পানীর কাগজ—ব্যাঙ্কের টাকা বুঝেছিল যে সে ভাবনার নেই তা সে বুঝতে শিখেছে। কিন্তু ভালো বর বা জীবিকা তারও ঠিক করা আছে তো। অবশ্য তখন সে 'জীবিকা' বলে ভাবেনি, 'ভালো বর' বলেই ভেবেছিল।

সেই ভালো ঘরকে সে একটু একটু চেনে। তার বাবা ওসব বিষয়ে হঠাৎ আধুনিক হয়ে গেছেন। সম্ভবত পাত্র সংগ্রহার্থে।

সুমিতা পড়ে ফোর্থ ইয়ারে। আজ স্বপ্ন দেখে, ভাবে, এমন চমৎকার জীবন, এত ভালবাসা স্নেহ-আত্মীয়-স্বজনের এত আদর মা-বাপের আর কোনো মেয়ে পায় কি? আর ভাবে সেই ভালো বর সুসীমের কথা। কি সুন্দর মার্জিত তার ব্যবহার। আর মনে হয় যেন তাকে কি ভালোই বাসে। এত প্রেম আর কোনো মেয়ে পেয়েছে কি? আর তার মত এত ভালও বেসেছে কি? পুরাণের প্রেম আধুনিকা প্রেমের কথাও ভাবে। অমন যে শকুন্তলা তিনিও প্রত্যাখ্যাতা হয়েছিলেন বিনা দোষে। সীতাও পরিত্যক্তা হয়েছিলেন চিরকালের মত আর জীবনে শ্রীরামের দেখা পাননি। দময়ন্তীকেও তো নল রাজা ফেলে চলে গিয়েছিলেন। দময়ন্তী ফিরিয়ে এনেছিলেন নিজের চেষ্টায়। অবশ্য নল ভালো লোক ছিলেন। আবার স্বপ্নের ঘরে ফেলেও দময়ন্তীকে ত্যাগ করেননি। এখনকার কেউ হলে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য একটা স্বয়ম্বর সভায় গিয়ে বসত। আর সোনার সীতা? লোকে ভাবে রাম সোনার সীতা বানিয়ে রেখেছিলেন ঘরে। মুহূর্তকাল সুমিতার মনে হয়, তার মানে সোনার জন্য স্বর্ণসিংহাসনের জন্যই তো নিরপরাধী সীতা পরিত্যক্তা হয়েছিলেন। সোনার সীতা প্রেমের প্রতীক না ত্যাগের সুবর্ণমূর্তির কারণের প্রতীক?

এই সব পৌরাণিক প্রেম ও আরো যে সব ভালবাসা আছে আলোচনা করে কলেজের বান্ধবীদের সঙ্গে। বেশ মার্জিত ভাবে সুসীমের সঙ্গেও। রামসীতা, রাধাকৃষ্ণের ভালবাসার কথাও হয়। সুমিতা নিজের মত বলে। সুমিতা কোনো প্রেমকেই মহৎ বলে না, গভীর বলে না, শিবের সতীর ওপর প্রেম ছাড়া। আর মন আচ্ছন্ন করে ভাবে নিজেদের কথা। স্বপ্নের মত কি এক অপূর্বতায় অভিভূত সে ভালবাসা। তার মনে হয় আসলে যত মানুষ তত প্রেম। যতদিন জগৎ ততদিন ভালোবাসা। কিন্তু মানুষ যেমন কেউ কারুর মত নয়, সুমিতা মনে মনে বলে নিজেকে, তাদের প্রেমও কারুর মত নয়।

যেন মনে হয় কত দুঃখ কত অপরাধ কত বিচ্ছেদের ভার বহন করেও তাদের দুজনের সে প্রেম তাদের উজ্জ্বল মহান মধুর থাকবে। কোনো দুর্দিনেই সে ম্লান হবে না। ক্ষিপ্ত হবে না কোন দুঃখেই।

আর মন যেন কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে বাবার ওপর—সুসীমের ওপর। তার জন্য কত তাঁদের ভাবনা ভালবাসা, কত আয়োজন সুখের স্বাচ্ছন্দ্যের। এবং জানে, পরীক্ষাও শেষ হবে বিয়েও হবে।

হঠাৎ নানাদেশ বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে জনমত সংগ্রহ করতে করতে রাও কমিটি সদলবলে কলিকাতায় এসে পড়ল।

'গেল রাজ্য, গেল মান' বলে সাড়া পড়ে গেল। যে ঝুনোরা মাকড়িটা ইয়ারিংটা যেন তাদের হলেও সাড়া পড়ল। যে বোঝে না, যে বোঝে সকলেই সচেতন সজাগ হয়ে উঠল, খবরের কাগজের কৃপায়, আলোচনা সমালোচনার জোয়ার।

কথা শুনো আলোচনা শুনো কমিটির প্রশ্নোত্তর শুনতে হবে, দেখতে হবে।

মহাসভার দল, বর্ণাশ্রমীর দল, উদারনৈতিক দল, জমীদারদের দল, বিশিষ্ট ঘরের মেয়েদের দলের চিঠি, প্রবন্ধ, মতামত, অভিমত কমিটিতে তার বাইরে দৈনিক মাসিক পত্রে বেরুতে লাগল।

একটা চিঠি বেরুল দৈনিক একটা ইংরাজী কাগজে লেখক এস, চক্রবর্ত্তী।

সুমিতাদের এস চক্রবর্ত্তীর চিঠিটা পড়ে খুব মজা লেগেছিল। বন্ধুরা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করল, কে এই-চক্রবর্ত্তী?

সুমিতাকে বলে, "তোদের বাড়ীর কেউ নাকি?" বলে, "চিঠিটা যেন আলোচনা নয় আস্তরু।"

সুমিতা হাসে, জবাব দেয়, "বাংলাদেশে কি আর চক্রবর্ত্তী কেউ নেই?"

কমিটির বৈঠক শেষ হয়ে এলো। সেবাসেমি আরো দর্শক প্রতিনিধিতে ঘর ভরে যায়।

সহসা সুমিতার চোখ পড়ল একদিন দর্শকদের মধ্যে বাপের দিকে। আনন্দিতগর্ব্বে সে পার্শ্ববর্ত্তিনী বন্ধুকে দেখালো, তার বাবাও এবিষয়ে কত উৎসাহী। বাবাও সুমিতাকে দেখলেন।

সন্ধ্যাবেলায় বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল সুমিতার।

সহাস্যে বাবা বল্লেন, "খুকি, তোকে দেখলুম। কার সঙ্গে গিয়েছিলি?"

পরমোৎসাহে সুমিতা বল্লে, আমরা যে ওয়াই, ডব্লু, সি'এ মেয়ার হয়েছি। আমাদের কমিটির মতামতও জানানো হলো।"

টেবিলের ওপর পড়েছিল নতুন মাসের বাংলা একটা মাসিক। সেটা খুলল, সুমিতা কথা কইতে কইতেই। প্রথমেই একটি প্রবন্ধ পুরোনামে সুমন্ত চক্রবর্ত্তীর।

সে একটু থমকে গিয়ে লেখাটার দিকে চেয়ে রইল।

বাবাও থমকে গিয়েছিলেন, বল্লেন, 'তুমি ওখানকার মেম্বর হয়েছ আমাকে বলনি তো? তোমাদের মতামত তো জানলাম।"

"না, আপনাকে বলা আর হয় নি" অবাকভাবে মেয়ে বল্লে।

"বলা উচিত ছিল।" গম্ভীর মুখে পিতা বল্লেন।

সুমিতা অপ্রস্তুত মুখে মাসিকটার পিতার লেখাটির পাতা উল্টে যাচ্ছিল। সেই দৈনিকে প্রকাশিত আর অক্ষর স্বাক্ষরিত চিঠিখানারই যেন বাংলা।

বাবা আবার বল্লেন, "আমি মোটেই ওসব মত পছন্দ করি না। সমাজ একেবারে ওলটপালট করে দেবার মত আইন। হিন্দু মেয়েদের কি মেয়েত্ব থাকবে ও বিল পাশ হলে।"

সুমিতা মৃদুস্বরে বললে, "কিন্তু বাবা, অনেক পণ্ডিত বিদ্বানরাতো ওর পক্ষে মত দিয়েছেন। ওসব অধিকার তো থাকা উচিত!"

আশ্চর্য হয়ে পিতা বলেন, "অধিকার তোমাদের নেই নাকি? বাপ মা না করে কি? সর্বস্বান্ত হয়ে বিয়ে দেয় না? যৌতুক দেয় না? সৎপাত্র খুঁজে বেড়ায় না? কম টাকা লাগে তাতে? অধিকারের চেয়ে বেশীই পাওয়া হয় কত সময়। এগুলো অধিকার নয়?"

সুমিতা বলে, "কিন্তু তাতে তো মেয়েদের জোর নেই, দাবী নেই। নাও পেতে পারে, নাও দিতে পারেন সকলে। আইন হলে সকলে সব সময়ে পেতে পারবে।"

বাপের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বলেন, "ও, তোমাদের অবরদস্তির অধিকার চাই।"

সুমিতা অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে রইল।

বাবা বলেন, "ওসব বলে বোগ দিলে আর ঐরকম মত মানলে আমি তোমার জন্য একটি পয়সাও খরচ করব না। জানো, কত খরচ হচ্ছে আর হবে? জানো, তোমার জন্য সুশীলদের কত দিতে হবে? অমনি দিয়ে দিচ্ছে না তারা।"

মেয়ের মুখ পাঙাশ হয়ে গেল।

তার বিবর্ণ নিচু মুখের দিকে চেয়ে এবারে একটু স্নিগ্ধভাবে পিতা বলেন, "ওই বইটা নিয়ে যাও। ভালোকরে পোড়ো। ওতে সব বুঝিয়ে দেওয়া আছে।"

পিতার আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে মাসিকপত্র খানা হাতে নিয়ে সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু পড়ে বোঝবার আর দরকার ছিল না। পিতার কথাতেই বোঝা হয়ে গিয়েছিল সব কথা।

নিতান্ত অন্ধকার ছাতের কোণে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অভিমান তার হল না। চোখে জলও এলো না। তার কানে বাজতে লাগল, 'তোমার জন্য যে কত খরচ করতে হয়েছে, অমনি দিয়ে দিচ্ছে না তারা।'

শক্তিহীনের ব্যাকুল লজ্জায় দাহহর রাত্রি তার কেটে গেল। নিয়মমত স্নানাহার করে কলেজে গেলো।

সুশীলের সঙ্গে দেখা হ'ল বাড়ীতে ফিরে।

সুশীল জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে আপনার? জ্বর? মুখ চোখ বসে গেল কেন এত?"

"ও কিছু না" বলে শুষ্কভাবে হাসল। তার মনে হচ্ছিল, বাপের কথা, সুশীলদের কত দিতে

তাহলে ঘুষ দিতে হচ্ছে সকলের মতই? নইলে বিয়ে হত না

একটা নিষ্ঠুর কৌতূহল জাগে, বাপের ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা মনে হয় থাক্, সেও হয়ত উত্তর দেবে, সে সব তার বাবা জানেন!

যেন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় একবারটী—এই টাকা না পেলেও তুমি আমাকে চাইবে? চাইবার হয় ভরসা রাখবে?

কিন্তু তার মন সব কথার উত্তরই কেমন করে যেন জানতে পেরেছে।

মাথা ধরার ছল করে সে শুতে চলে গেল। শুধু হাসিতে তার মন ভরে যায়। হাঁা, স্নেহ ভালবাসায় স্রোত প্রেমের ধারা তাদের জন্য চিরদিনই একইভাবে বইছে। অথবা বাবা সীতাতেই শেষ হয়ে যায়নি। যুগে যুগে তারা আবার জন্মাচ্ছে নতুনভাবে সেই সমাদর পাবার জন্য। কন্যায়, বিদ্যায়, পরিত্যাক্তায়, পতিতায় তাদের পরম্পরা বজায় আছে।

রাত্রি গভীর হল। আজ আর লজ্জার ধিক্কারের সে বাধ নেই। মনের একটা চিঠি লিখতে হবে। কাকে? মাকে না বাবাকে? আবার হাসল মন। বাবাকেই। মা আবার কে? কি তাঁর প্রতিষ্ঠা ক্ষমতা!

লিখে,

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, আপনার কথা শুনে কাল বুঝতে পারলাম, আমরা সন্তান হয়ে জন্মাই বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি সন্তান নই। আসলে একটা ঢেরের মাত্র। সেই জন্যই আমাদের জন্য ধরচ করাটাকে আপনারা ভুলতেও পারেন না, সইতেও চান না।

তবু যে আমাকে শিক্ষা দিয়ে বড় করে দিয়েছেন সেইটা নিয়েই কৃতজ্ঞ হয়ে আমি আজ গেলাম। আর আমার কাছে এ শিক্ষা অমূল্য। এতে 'শুধু মেয়ে' হয়েই থাকতে পারব কারুর 'ভার' না হয়ে। প্রণাম। ইতি—

পুনিতা

সকালে চিঠি পড়ল বাবার হাতে। ডাক পড়ল সুমিতাকে। কিন্তু পাওয়া গেল না। সারাদিন ধরে বাবা খুব রাগ করলেন। তার পর 'অকৃতজ্ঞ' বল্লেন। শিক্ষার দোষ বল্লেন।

খেতে না পেলেই ফিরে আসতে হবে, বারবার বল্লেন। মা কাঁদলেন সন্তরে কদিন ধরে। আর শিক্ষার দোষ দিলেন।

কয়েক দিন পরেই রাণু কমিটি অন্যত্র চলে গেল। বিল তারপর গেল দিল্লেই কমিটিতে ধাষাচাপা থাকতে কিছুদিনের জন্য।

শেষ অবধি পিতাদের তদারক হ'ল সেটা পাশও হবে না।

বাবার রাগ পড়ে এলো। মার কান্না শুকিয়ে এলো। বছর খানেক বাদে সুনীলেরও অনভিশিক্ষিত একটি ভালো মেয়ের সঙ্গে ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল।

শুধু সুমিতা আর ফিরে এলো না।

ভিখারী তপস্বিনী

একজন দরিদ্রলোক, ভীষণ দরিদ্র, সংসারে সকল রকমে হতাশ হয়ে, ঠিক করলো দেবতার শরণাপন্ন হবে। কোন্ দেবতার শরণাপন্ন হওয়া যায়, ভেবে চিন্তে সে ঠিক করলো মহাদেবেরই তপস্যা করবে। আশুতোষ তাঁর নাম, শিগগিরই সন্তুষ্ট হ'য়ে যাবেন।

লোকটী কঠোর তপস্যায় বসলো। তপস্যায় সন্তুষ্ট হ'য়ে মহাদেব দেখা দিলেন, বল্লেন, আমি তোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি—কি বর প্রার্থনা করিস্?

লোকটী অবাক হয়ে দেখে, যে-দেবতার কাছ থেকে সে বর চাইবে, তারই গায়ে কাপড় নেই। সে তবে তাকে কি দেবে?

তাই সে বল্লো, বাবা, প্রার্থনা করি, যেন তোমার কাপড় জোটে!

সত্যন্তু মে রক্ষ্যতমং •

শ্রীদিলীপকুমার রায়

[ভূমিকা : ছায়া কলিকাতার ধনিকন্যা—অসিতের গানের ছাত্রী—অসিত মাঝে মাঝে হুমেল যোগাশ্রম থেকে এসে তাকে গান শেখায়। ছায়ার সঙ্গে অসিতের নানা আলোচনা হ'ত হাল্কা তথা গুরুগম্ভীর। সেসব কথা আমার "ছায়ার আলো" উপন্যাস প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হয়েছে ছায়ার জীবনকে কেন্দ্র ক'রে। এটি একটি সম্পূর্ণ গল্প "প্রবল"-এর কথা আমার "আশ্চর্য্য" উপন্যাসে আছে। ইতি—লেখক।]

ছায়া রুখে ওঠে : "এ তোমার অন্যায় অসিদা—বলবই বলব। তুমি যখন তখন শুধু শুধু আমাকে রাগাতে চাও—নৈলে—"

অসিত হেসে ফেলে : "নৈলে—? কী!"

ছায়া মুখ ভার ক'রে বলে : "থাকগে—কাজ কি ভাই?"

অসিত আদর ক'রে বলে : "না বল্ দিদি লক্ষ্মীটি! অত রাগ করলে পেরে উঠব কেন?"

ছায়া একটু নরম হয়, বলে : "এ রাগের কথা নয় অসিদা। মুখোমুখি কথা বলার তুমি অধিকার দিয়েছ ব'লেই যে সে-অধিকার আমার পাওয়া হ'য়ে গেছে তা তো আর নয়। তুমিই সেদিন বলছিলে না তোমার গুরুদেবের একটি কথা যে, যেনেওয়ালা দান করতে চাইলেই তো আর হয় না—লেনেওয়ালারো নেওয়াও চাই। কথাটি আমার খুব মনে লেগেছে। আরো এইজন্যে যে দেখেছি তোমার অনেক কিছু দান তো পেয়েও পাই নি। জানে ভুক্তভোগীই।"

অসিত ওর বিদ্রূপিতে টান দিয়ে বলে : "একে কি বলে মুখ কোটা না খই কোটা?—অথচ বলাটি চাই মিষ্টি দিয়ে যে উনি যো—খাতে পারেন না।"

"পারি? তুমিই বলো। আমার মনের ভাবটা বুঝলে কি পুরোপুরি?"

অসিত হাসে, কিন্তু একটু যেন আবছা হাসি, বলে : "দিদি, মহাভারতে পড়ছিলাম কালই অর্জুন-যে-অর্জুন তিনি বলছিলেন দ্রৌপদী-যে-দ্রৌপদী তাঁকে যে :

• যুধিষ্ঠির বলেছিলেন দ্রুপদকে "সত্যন্তু মে রক্ষ্যতমং ন ধনম্" (বনপর্ব ১৩০.৩৭) অর্থাৎ সত্যই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি রক্ষণীয়—ধনও নয়।

ন চ কেনচিদত্যন্তং কস্যচিদ্ হৃদয়ং ক্বচিৎ
বেদিতুং শক্যতেঽন্যেন তেন মাং নাববুধ্যসে।

অর্থাৎ, একজন কখনই আর একজনের হৃদয় পুরোপুরি বুঝতে পারে না তাই তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। নরনারায়ণের পূর্ণ নিটোল নরের মনে যখন এহেন ভাবোদয়, তখন আমার মতন সামান্য আধা-নরের বেলায় কা কথা। তবে ভরসা এই যে তোর মনটায় জল অতল হ'লেও তাতে ঢেউই আছে আবর্ত নেই—তাই ডুব দিতে চাইলে অন্তত অনেকটা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। নৈলে কি আর তোতে আমাতে যখন তখন এত মনের কথা হতে পারত?"

ছায়া শুধু নাছোড়বন্দ, বলে: "কী বুঝেছ বলো তাহ'লে। নৈলে আড়ি।"

"যা বুঝেছি তার সবটা খোলানো হয়ত আমার সাধ্যের বাইরে। তবে এইটুকু হয়ত বলতে পারি সত্যকথার নৌকাডুবি না ক'রে যে, 'নৈলে' ব'লে তুই যেটা চেপে গেলি সেটা মুখ ফুটে বললেই যে সত্য বনে যে'ত তা নয়। সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখলেই কিছু গিল্টি সোনা রাতারাতি গিনি সোনা হয় না।"

"কী কথা মুখ ফুটে বলি নি শুনি—যেটা গিল্টি?"

"যে, কেউ মিথ্যে বললেই তার নাম মিথ্যাবাদী দেওয়া চলে—যা নিয়ে তর্ক।—না দিদি। ছেঁয়ালী নয় এ। আমার বলার উদ্দেশ্য যে মিথ্যাবাদী লেবেল যদি কারুর কপালে মারতেই হয় তবে যারা হোক তার কপালে যে অনেক ভেবে চিন্তে—যাকে সাহেব পুরাণে বলে 'ঠাণ্ডামাথে'—কাজ হাসিল করার চেষ্টা' করে। এরকম লোক সংসারে নেই—বলি না। কিন্তু ঠিক্ তেমনি এমন লোকও কি নেই যে, যারা কিছু কোথায় বেধে মিথ্যা বলতে আসেনি অথচ দেখা গেল যে তার যা বলল তা সত্যি নয়। আমার মনে হয় এদের কপালে মিথ্যাবাদী লেগে দিলে তাদের কপাল পুড়তে পারে—কিন্তু লোকে ব'লেই কি তাতে ক'রে একটু অবিচার হয় না বেচারিদের উপর?"

ছায়ার ডাগর চোখ দুটি আরো যে ডাগর হ'য়ে ওঠে অসহিষ্ণুতায়, তার মাথার ঝাঁকুনীতে দুটি এলায়িত বিনুনিই ওঠে দুলে! "বেচারি? না অসিদা, আমাদের তো নয় তোমার মত গণ্ডার শরীর—কালেই ব'লে কী হবে?"

অসিত ছড়া কাটে ওর বিনুনিতে একটা টান দিয়ে:

"বলতে যা চাই বলাই ভালো,
হবার যা তা হবে।
না বলা সব মনের কথা
চাপা কি আর রবে?"

ছায়ার মুখ ভার: "যে—র? জানো, ঐ ছড়া কেটে কেটেই তুমি আমার এই হাল করেছ—মানে আমাকে বোকা বানিয়ে যাও।"

অমিত এবার ধরে নয়ন সুর :

"বুদ্ধিমতী স্বভাবে যে
অবোধ সে কি হয়?
মনকে যদি থাকেও চোট
ঘমাট সে তো নয়।"

ওর কাঁধে হাত রেখে : "সোন্ দিদি, তোকে অপ্রতিভ করার কোনো দুরভিসন্ধিই যে আমার নেই একথা তামা তুলসি গঙ্গাজল নিয়ে হলপ করে বলতে পারি। তবে কি জানিস? এখানে দোষটা ঠিক তোর নয়? দোষটা আমাদের মনে গ'ড়ে-ওঠা হাজারো ধারণার বেসর সংস্কারকে আমরা পরখ ক'রে দেখি নি—কি না অভিজ্ঞতার নিকষে ক'ষে নিই নি। এই অন্যেই চলতি ধারণার গলতি আমরা সচরাচর দেখতে পাই নে। তাছাড়া এখানে আরো একটা কথা আছে—যার জন্যে মিথ্যে কথা কেউ বলছে দেখলে তোর মন এত অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে, সেটা এই যে, তোর প্রকৃতিটা একটু উল্টো তুই চাস্ না নামডাক। কিন্তু যারা চায় তাদেরকে তুকার জল পাবার জন্যে অনেক তদ্বিই করতে হয়। আমি নিজে এ বিষয়ে ভুক্তভোগী যে দিদি, জানি তো অনপ্রিয় ওরা আর শ্রদ্ধেয় হওয়া এককথা নয়। যারা পাঁচজনের কাছ থেকে শ্রদ্ধার খোরাক যোগাড় করে তাদের মনটা একটু উপুসিই থেকে যায়, কেন না শ্রদ্ধার একটা চাপ আছে যা বেশিক্ষণ সওয়া কঠিন। অনপ্রিয় যারা তাদের এই উপবাসটি করতে হয় না—কারণ পাঁচজনের কাছে বাহবা হাততালি পেয়ে মন না ভরলেও পেট ভরে। তাই মিথ্যাবাদীরা—মানে যারা ভদ্রি করে—কিছুতেই মানবে না যে খাঁটির বিতল সত্যবাদীই।"

ছায়ার মুখ কালো হ'য়ে আসে অভিমানে : "যাও অমিদা। তুমি কেবল আপাবেই আপাবে আমাকে।"

"আপাবো!"

"নয়ত কি? নৈলে এমন কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুল যে মিথ্যাবাদীরা মিথ্যে ব'লে ঠকে না?"

"এই দেখ, কের কী ফ্যাসাদ হ'ল সত্যি কথা বলতে গিয়ে। খোলাখুলি কথা বলতে মানুষ ডরায় কি সাধে? মিথ্যা বলেও তো লোকে এই অন্যেইরে!—এই রকম হাজারো ভুল বোঝার ফ্যাসাদ থেকে বাঁচতে।"

"বলে তো বটেই। কিন্তু তাই ব'লে কি বলব সেটা ভালো?"

অমিত ওকে কাছে টেনে বলে : "কে বলেছে? ছায়া হ'লে বুঝি ছায়ার সঙ্গে লড়াই চাইই চাই? আমি শুধু বলেছি যে মানুষ স্বভাবে কম বেশি সুবিধাবাদী বলে সেখানে সত্যিকথার অসুবিধে খুব বেশি সেখানে একটু বুদ্ধি ছুঁয়ে—অর্থাৎ মুখে সত্যি ব'লেও কাজে মিথ্যাবাদী হ'তে পেছপাও হয় না।"

ছায়া অনুযোগের সুর ধরে এবার: "এসব তুমি কী বলছ অসিত। লোকে অমুক করে তমুক বলে—এ তো জানাই। যুদ্ধের সময় পরিবের মুখের গ্রাস নিয়ে তো কারবারিরা লাখপতি হয় রাতারাতি। কিন্তু তা থেকে কি প্রমাণ হয় যে এ সব কাজ যারা করে তারা ভালো লোক, না তাদের শ্রদ্ধা করা সম্ভব?"

অসিত একটু হাসে: "মানুষ যা করে তাই-ই যে ভালো এমন কথা কেউই বলবে না। তবে মানুষ কোন্ কাজ কেন করে সেটা বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যায়—আর একবার বোঝা গেলে দেখা যায় দুষ্কর্মও মানুষ করে অনেক সময়ে দশচক্রে প'ড়ে। তবে আমি তো বলেছি ভেবে চিন্তে শুনে গেঁথে যে-কর্মচক্রে আমরা প'ড়ে তুলি তার সম্বন্ধে একটু জোর ক'রে বলা গেলেও যেতে পারে। কিন্তু তবু বলব: মানুষ নানা পাকে চক্রে প'ড়ে নানা অকাজ ক'রে বসে, আর বসার পর কুকীর্তিতে ঠিক তেমন অকীর্তি দেখে না। অবিশ্যি এ তর্কে যদি তুই কাউকে শ্রদ্ধা করতে না চাস—সে তোর রুচি, কিন্তু"—বলেই হঠাৎ থেমে গেল: "রোস্, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি এখানে। [illegible]? মানে, করলে সত্যি জবাব দিবি?"

ছায়া ভয়ে ভয়ে বলে: "কী?"

অসিত হেসে বলে: "ঐ দেখ্, এতবড় সত্যবাদিনী বীরবালাও আগে থাকতে সাবা চেকে সই করতে নারাজ: একটা প্রশ্নের সত্যি জবাব দিবি এ ভরসা দিতেও তুই শিউরে তুলছিস। এরই নাম সত্যের চাপ—এরই ফলে অনেকে মিথ্যাবাদী না হ'য়েও মিথ্যাচারের পাকে প'ড়ে যায়—এইটি ছিল আমার বক্তব্য।"

ছায়া বলে রুখে উঠে: "আচ্ছা, করো কী প্রশ্ন। দেব সত্যি জবাব।"

অসিত বলল: "মিথ্যে কথা বলেও যারা তেমন অনুতপ্ত হয় না তাদের শ্রদ্ধা করা চলে না তো? আচ্ছা। এখন আমার প্রশ্ন এই যে আমি যদি এদেরই দলে পড়ি তা'হলে আমাকে শ্রদ্ধা করা চলে কি না, চললেও সেটা উচিত?—তোর মত কী?"

"যা—ও!"

"না, যাব না।" অসিত ওর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে বলে: "শোন্ মিনি, একটা ঘটনা বলি। একটু চা, আনা।"

চায়ে চুমুক দিয়ে অসিত সুরু করে:

"আমি তখন জার্মানিতে—বার্লিনে—১৯২১ সালে। সেখানে একটি রুষ মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়। খুব ধনী পরিবারের মেয়ে। ১৯১৮ সালে বার্লিনে আসে গান শিখতে। চমৎকার গলা। তোর মত একেবারে কোকিল পুড়িয়ে খায় নি অবিশ্যি—"

"এবার উঠে যাব কিন্তু—"

"যাঃ, সত্যি কথা যে বলবে না তাকে তুই করবি নে শ্রদ্ধা—আবার যে বলবে তারও ছায়া মাড়াবি নে। তবে ঘর করবি কাকে নিয়ে শুনি? না, শোন্ শোন্—ঠাট্টা আর করব না কথা দিচ্ছি। কী বলছিলাম? হ্যাঁ মেয়েটির নাম নাকাশা। তার ব্যক্তিত্বে রূপ বুদ্ধি ও সুকণ্ঠ এই ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছিল। আমার কাছে গান শিখত বলে বেশি বলা হবে—তবে সুর শিখত টুক টুক ক'রে। আর এই সব বাংলা সুদ্ধ নিয়ে সে বলাত রকমারি রবাসী ভর্জন রূপ প্রভৃতি গানে। সে এক চমৎকার ব্যাপার।"

ছায়ার মুখ মুহূর্তে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠে: "বলো বলো অসিধা। আঃ চা খাওয়া পরে হবে। সে কি খুব সুন্দরী ছিল না কি?"

"অমন রূপসী মেয়ে আমি জীবনে কম দেখেছি। কারণ তার রূপ ছিল তো শুধু মুখ বা অঙ্গ-সৌষ্ঠবের নয়—তার উপরে ছিল একটা বিশেষ ভাবের পালিশ—ঝিকিমিকি—যেটা সচরাচর শিল্পীদের খানিকটা সহজাত বলা যায়। তার উপরে তার ছিল বহুমুখী প্রতিভা: সে গান করত চমৎকার, আবৃত্তি করত চমৎকার, আর—last though not least—নাচত সবচেয়ে চমৎকার। আমাকে তার নাচের সহযোগী করবে তাতে ছিল তার দারুণ আগ্রহ। বলত আমার পক্ষে নাচ সহজ—এবং এ সহজ-পটুতা যাদের আছে তাদের পক্ষে সেটার বিকাশ না করা মহাপাপ। মহা মুস্কিল! আমি যে পরিত্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি তিনটি কাজ করব না—তাকে বলি কী ক'রে?—এদের মধ্যে দুটির কথা হয়ত বললেও বলা যেতে পারত: যথা, মদ খাব না কোনদিন আর নাইট ক্লাবে যাব না কোনো দিন। কিন্তু নাচব না কোনোদিন একথা বলি কি ক'রে বল্ দেখি ধী ক'রে?"

"সে বুঝি তোমাকে খুব বেশি পীড়াপীড়ি করত নাচতে?"

"করত না তো কি? হয়েছিল কি, সেতো আমার কাছে শিখত নানা সুর—কাজেই আমার কাছে একটু ঋণী বোধ করত। ওদেশে favour কেউ বড় একটা নিতে চায় না—এক তবলা। তাই সে ঋণ শোধ করতে চাইত আমায় নাচ শিখিয়ে, বুঝলি?

ছায়া মাথা নেড়ে বলে: "তুমি তাকে কী বলতে?"

আমার মাথা আর মুণ্ডু: নাচতে আমার ভালো লাগে না—বিলিতি বলডান্স হ'ল ছ্যাপ্‌লামি—এই ধরণের অজুহাত।"

"মানে, তোমার তাকে বলতে বাধত যে পবিত্র বাবুর কাছে নাচবে না কথা দিয়েছ বলেই তোমার এত অনিচ্ছা?"

"অবিকল। আর এর নামকরণ কী করবি শুনি!—সত্যকথন? না সত্যগোপন?"

ছায়া প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল: "কিন্তু কথাটা তোমাকে লুকতে হ'ল কেন?"

"ওরে সেটা হ'ল কালাপানির পারে 'সব ভেড়েছির দেশ'। সেখানে নরনারী সব তেড়ে ভাঁক করে তাদের স্বাধীনচিন্তা individuality নিয়ে। মারা, এমন কি গুরুজনের কথাও বেশি শুনে চলে তাদের নিয়ে পাঁচজনে করে হাসাহাসি। এহেন দেশে যদি ব'লে ফেলতাম মুখফুটে যে, আমি নাচতে চাইনি অমুকের মানা ব'লে তাহলে ও কি আর রক্ষে রাখত?—সদলবলে দিনের পর দিন ঠাট্টাবিদ্রূপ ক'রে আমায় এমন অবস্থা করত যে বাপিনে আমার আর যাই শেখা হোক গান শেখা যে হ'ত না এ ধ্রুব। কাজেই সত্যিকে করতে হ'ল জবাই।"

"কিন্তু এখানে মিথ্যার প্রশ্ন জোর ক'রে আনছ কেন অসিদা! তুমি উৎসাহ বোধ করতে না নাচতে এটা তো দেখাই যাচ্ছে।

"কিন্তু ভেবে দেখ একটু তলিয়ে। ও বলয় প্রায়ই—দুদিন নেচেই দেখ না—উৎসাহ আসবেই আসবে—বিশেষ যার তালজ্ঞান এমন পাকা। বিপন্ন হ'য়ে তখন তার দেখাতে হ'ত উৎসাহ-বোধ-না-করবার: বলতে হ'ত উৎসাহবোধই করছার ভালো লাগে না ব'লেই। কথাটা মিথ্যে কিন্তু জোর দিয়ে বার বার বলায় পালিশ দিতে দিতে গিল্টিতে ধরল প্রায় নিখাদ সোনার রঙ আর কি।"

"এ তোমার বাড়াবাড়ি অসিদা। কারণ নাচো নি তো আর তুমি, জানবে কেমন ক'রেই বা—নাচলে ভালো লাগবে কি লাগবে না?"

"মানুষ বোকা হ'লেও তো বুদ্ধি ধরে দিদি! সব কিছুই কি হাতেকলমে করে তবে চলতে হয়? কল্পনা জিনিসটা অদ্ভুত হ'লেও তো আর তাই বলে কল্পনা নয়। নাচ দেখতে না দেখতে মন খুশি—অথচ নাচতে ভাল লাগে না একি আর একটা কথা হ'ল! অথচ ভেবে দেখ, এমনতর অবিশ্বাস্য কথাকেও বিশ্বাস্য ক'রে তুলতে আমাকে কী ভঙ্গী করতে হ'ল—বলতে হ'ল নাতাশাকে যে ওদের দেশের নাচ অতি চাষা, খেলো কাপের-নামে-অকাজ, যার নাম কলাকার দিলে কলা এবং কারু দুয়েরি অপমান।"

ছায়া একটু ভাবে, তারপর বলে: "কিন্তু তুমি যা-ই বলো একে ঠিক মিথ্যাকথন বলা চলে না—যা তুমি প্রমাণ করতে চাইছ। নাতাশাকে তুমি নাচব না বলতে পারো নি মুখের উপর কিম্বা নাচতে ভালো লাগে না ব'লেই ডিগবিগ করতে চাও নি। কাজেই তোমাকে একটা কারণ দর্শাতে হ'ল যাতে তার মনে না লাগে। ধরো সেদিন একটি মেয়ে আমারি-গাওয়া একটি গ্রামোফোনের গান গেয়ে আমাকে শুনিয়ে মুখের উপর জিজ্ঞাসা করল আমার কেমন লাগল। ভালো না লাগলেও বলতে হ'ল বেশ। একে কি ঠিক মিথ্যা কথা বলা চলে?"

"আলবৎ।"

"আলবৎ! ওমা! মুখের উপর এমন কথা কেউ আবার কাউকে বলতে পারে নাকি?"

"কেন পারবে না? আমার বাবাই পারতেন। কেউ নাটক লিখে এবে তাঁকে পড়িয়ে শোনালে তিনি তাঁর যা মত বলতেন। কতবার শুনেছি তাঁকে বলতে—কিছু হয় নি। বকবে শোনা—তার উপর

সাক্ষী আছে—আমার বোন।" ব'লে অসিত খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ছায়ার পানে। ছায়া হঠাৎ প্রশ্ন করে: "আচ্ছা অসিদা, তুমি কী বলতে চাইছ বলো তো এই ধরণের স্পষ্টবক্তা যে নয় সে-ই মিথ্যাবাদী?"

"বারে! উল্টো চাপ! আমিই তো বলছি সত্যি না বললেও অনেক সময়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তুইই তো বলছিলি সত্য নয় বললেই তার পিঠে দেগে দেওয়া উচিত—'সাবধান! এ মিথ্যাবাদী!' কিন্তু শোন্, আমরা কথায় কথায় একটা অন্য প্রসঙ্গের আঘাটায় এসে পড়েছি—স্পষ্টবক্তা হওয়া ভালো না খারাপ। আমার প্রতিপাদ্য ছিল মানুষ পাকেচক্রে এমন অনেক মিথ্যাকথা বলে যার জন্যে এমনকি অনুতাপ করার কথাও তার মনে হয় না। কিন্তু নাতাশার প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে যা আমি দেখাতে চাইছি সেটা এখনো দেখানো হয় নি—কেন না সেটা আরো একটু গোরালো। সেটা তোকে ঠিক বোঝাতে পারব কি না জানি না, তবু চেষ্টা তো করতে হবে। তাই শোন্ মন দিয়ে।"

ছায়া ওর দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। অসিত সুরু করে চারে চুমুক দিয়ে:

"আমাদের মন এক সময়ে হয়ত একজনকে একটা কথা দিল। পরে যখন সে-মন কথাটা দিয়েছিল সে-মনটা একটু একটু ক'রে বদলে গেছে। পবিত্রের কাছে আমি যখন জিদ করেছিলাম নাচব না নাচব না নাচব না, তখন সত্যিই মনে হ'ত নাচটা অতি ঘৃণ্য ব্যাপার। বাসিনে এসে মনটা যখন বদলে গেল—বিশেষ ক'রে অমন সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে মিশতে মিশতে—তখন বেশ দেখতে পেলাম নাচার মধ্যে অন্যায় কিছুই নেই। কিন্তু তখন আর একটা কুযুক্তির আবর্ত পাকিয়ে উঠল মনের মধ্যে: মনকে বোঝালাম—নাতাশার সঙ্গে নাচতে যে আমি রাজি হচ্ছি না তার কারণ পবিত্রর কাছে বছর দুই আগে কথা দেওয়া। প্রতিজ্ঞা করে তাকে ভঙ্গ করব না এমন ভীষ্ম আমি নই স্বভাবে—তবু বোঝালাম নিজেকে যে একাজ অ-ভীষ্মের পক্ষেও অশোভনীয়। কিন্তু মনে মনে জানতাম এ আমি খুব সহজেই পারি—কেবল একটু ঢিল দেওয়ার অপেক্ষা।"

"কিন্তু ঢিল দিলে না তো।"

"না। কিন্তু সেটা সত্যকে রক্ষা করতে নয়—গোপন করতে—অর্থাৎ নাতাশাকে বলতে না পারার দরুণ আসল কারণটা কী।"

ছায়ার চোখ দুটি বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে কৌতূহলে: "কী কারণ অসিদা? আমাকে বলতে পারো তো?"

অসিত একটু চুপ ক'রে ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকে, তার পর বলে: "তোকে বলব? আচ্ছা, বলাই যা। এখন তুই একটু তো বড় সড় হয়েছিস—হয়ত বুঝলেও বুঝতে পারিস। শোন্ তোকে বলেছিলাম গোড়াতেই তোর হয়ত মনে থাকতে পারে যে নাতাশা ছিল পরম সুন্দরী?"

"খুব আছে। কিন্তু তাতে কী?"

"তাতে কী? ঐখানেই যে চণ্ডীর ভাষায় 'বিষাঃ সমস্তাঃ'। কিন্তু এখানেও মুস্কিল আছে সবটুকু ফুটিয়ে তোলা। কারণ 'পরমা সুন্দরী' কথাটার ধার গেছে ক'মে। তাই এহেন সুন্দরীকে বিদেশে বিভূঁয়ে

বাঙ্ময়ীরূপে হাতে পেলে কোনো শিল্পী যুবক তাকে যে চোখে দেখে সে-চোখের দৃষ্টির এলাহায় এম্‌নি যে পরমা সুন্দরী বলতে তার কোনো বাধাই পাওয়া যায় না। আমার তাই তার সঙ্গে নাচতে যেমন ইচ্ছাও হ'ত তেম্‌নি ভয়ও করত। অথচ মুস্কিল এই যে এই ভয়ের কথাটা বাদ দিয়ে শুধু ইচ্ছার কথাটা বলতে হ'লে শুধু যে সত্য-গোপন হয় তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে হয় সত্যের বিকৃতি করা—যার উপনাম মিথ্যাভাষণ। উপরন্তু এই যে, মিথ্যাভাষণ একে এর স্বরূপে স্বীকার করতে যখন মনে বাজে তখন অশান্ত বিবেককে শান্ত করতে হয়, এই ব'লে যে, নাচাটার সঙ্গে নাচলে সেটা হবে পবিত্রের কাছে সত্যভঙ্গ। বলতাম—'মন! মনে রেখো পবিত্র কী বলত। ওদের দেশের ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে নাচে—এতে ওরা অভ্যস্ত। তাই এতে ওরা হাবুডুবু খেলেও সামলে যায় সময়ে—মানে ডোবে না। কিন্তু আমরা একেবারে অথই জলে। ঠিক যেমন মদ খাবার বেলায়। ওরা মাতাল হয় না মদ খেয়ে—মানে সুরাসুরা—কিন্তু আমাদের দেশে সুভদ্রতমও মদ ধরতে না ধরতে বেসামাল। 'তাই'—বলত পবিত্র টেবিলে ঘুঁষি মেরে—'যতই কেন আমরা বলি না অসিত যে মদ খাওয়া বা মেয়েদের সঙ্গে নাচার নামই পুরুষার্থ—আমাদের মন কখনই মানবে না যে আমাদেরো এইই স্বধর্ম।"

"একটা কথা অসিদা মাপ কোরো। পবিত্রবাবুর কথার প্রতিবাদ করার মতন না আছে আমার গলার জোর, না বুকের বল। কিন্তু ওদের দেশে গিয়ে ওদের মেয়েদের সঙ্গে প্রকাশ্যে অভদ্রভাবে নাচা আমাদের স্বধর্ম না হ'তে পারে কিন্তু তাই ব'লে কি বলবে অধর্ম।"

"তা বলি না। তবে কি জানিস দিদি! এবার আমরা কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসে পড়েছি একটু গভীর জলে—তাই মুস্কিল হয়েছে। তাই তো তোকে বলতে একটু বাধো বাধো ঠেকছে।"

ছায়া অভিমানে বলে: "তা হলে কাজ কি ভাই?—তোমার অত কুণ্ঠা যখন।"

অসিত ওকে আদর ক'রে বলে: "ঐ দেখ্ ফের করলি রাগ। মানে তুই এখনো অত বড় হোস নি একথাও সাবধানে সাবধানে বলতে হয়—কেননা না বললে তোর মনে অভিমান আসে। কিম্বা হয়ত ভাবিস যে আমি—কত কীই ভাবতে পারি—আর কী ভাববি জানিনা ব'লেই বাঁধতে হয় এত শত আটঘাট!"

"এবার কিন্তু তুমি আমার উপর অবিচার করছ—অসিদা। তোমার সম্বন্ধে আমি যাই ভাবি না কেন—সেটা যে চেপে যাবার মতন কিছু হ'তেই পারে না এটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল।"

অসিত ওর কণ্ঠস্বরে ক'রে বলে: "না দিদি! তোর মনে আঘাত দিতে চাই না এইজন্যেই সাবধানতার কথা তুলছিলাম, তুই যে আমার সম্বন্ধে অকথ্য ভাব মনে ঠাঁই দিবি না এও যদি না জানলাম তবে তোর সম্বন্ধে জানলাম কী? না, শোন্ আমি বলব এবার খোলাখুলিই—তাতে যা হবার হবে।" ব'লে একটু থেমে: "শোন, ওদের দেশের সমাজটা তো ঠিক আমাদের দেশের সমাজের মতন নয়। ওরা আমাদের চেয়ে বেশি সাংসী বলেও বটে—প্রাণবন্ত ব'লে বটে। তাই সেখানে কেন বেঁচে থাকার জন্যে সেটা ওখানকার

ছেলেরাও জানে—মেয়েদের বাপ মাও। রোসনা। একটা ঘটনা বলি তা'হলে হয়ত স্পষ্ট হবে কী বলতে আমি চাইছি এত ভনিতা ক'রে।

"নাতাশা আমাকে খুব ঘটা ক'রে বোঝাত যে নাচ না শিখলে ওদের দেশের যৌবনের মনস্তত্ত্বের মধ্যে পৌছন অসম্ভব—বই প'ড়ে যা লাভ হয় সে হ'ল লোকসানের সামিল, hearsay evidence, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে সে ছিল যাকে বলে realist. মানুষের মন তো, তার উপর উকিল হলেন কে? না, সুন্দরী তরুণী তার উপর বান্ধবী। কয়েক দিন শুনতে শুনতে মন নরম হয়ে এল। তাছাড়া পবিত্র নাচতেই তো মানা করেছে—নাচ দেখলে তো আর ক্ষতি নেই। সত্যিই তো While in Rome do as the Romans do—বলে না! কাজেই হঠাৎ একদিন গেলাম একটা রুশ কাবারে-তে। সেখানে একএকটা ছোট ছোট টেবিল নিয়ে বসে তরুণ তরুণী—আর সামনের স্টেজে হয় নাচ গান। দর্শকরা বসে পান করেন সোমরস আর উপভোগ করেন নৃত্যরস।

"সেদিন নাতাশা একটু বেশি পান ক'রে ফেলে থাকবে। হঠাৎ পাশের টেবিলে একটি আলাপীর দিকে ইশারা করল। সে উঠে এল। নাতাশা আলাপ করিয়ে দিল—একটি ইহুদি পিয়ানিষ্ট—জাতে পোল, নাম জ্যাকব। জ্যাকব এসে আমাদের টেবিলে বসতে না বসতে বলল নাতাশাকে যে তারপর দিন এক কানিভালে নাচ—যাবে নাতাশা? আর যাবে কোথায়, কাপালকে বলা হ'ল পাত পড়েছে। নাতাশা শুধু রাজি নয়, সে আমাকে ধরল—তুমিও চলো। আমি রইলাম মুখ ভার ক'রে ব'সে, কিছু বললাম না। জ্যাকব এভাবে আমাকে ডিঙিয়ে তাকে ডাকতে আমার কোথায় বাজল। অথচ ভেবে দেখ, নাতাশা আমার না আত্মীয়া না অছি। আমাকে মুখচোরা ঠাউরে জ্যাকব ঠাট্টা করে বলল: কেন আপত্তি কি? এ তো অসভ্য ইংলণ্ড নয় যেখানে কোনো মেয়ের সঙ্গে কোনো ছেলে নাচলেই মেয়ের বাপ মা জিজ্ঞাসা করবে 'Young man, your intentions?' বলামাত্র নাতাশা ফিক্ ক'রে হেসে বলল: 'কিন্তু মনে রেখো জ্যাকব, আমার বাবা ইংলণ্ডেই ডাক্তারি করেন……যদি ওঁর ওদেশের বাসিন্দাদের ছোঁয়াচ লেগে থাকে? বলা তো যায় না।'

"শুনেই আমার বুকের মধ্যে কেমন একটা কুণ্ঠা এল। শুধু কুণ্ঠা নয় সে সঙ্গে ভয়ের আমেজও ছিল। এ চলেছি কোন্ পথে? পবিত্র তো ঠিকই বলত: নাচগান কথাটা এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করাই উচিত নয়—কারণ নাচের সঙ্গে এমন অনেক ইঙ্গিত জড়িয়ে—কিন্তু থাক্ সে সব তুই বুঝবি না—না—আর একদিন বলব—তুই আরো একটু বড় হ'লে তবে। এবার আমার বক্তব্যে ফিরে আসি। একটু থেমে অসিত সুরু করল: "সেদিন এই ছোট্ট ঠাট্টাটা আমার চোখ খুলে দিল যেন মুহূর্তে। অথচ স্পষ্ট দেখেও আমি মনের মধ্যে কোনো জোর পেলাম না কোথাও। বেশ দেখতে পেলাম নাতাশার সঙ্গে আমার এমন কোনো গভীর সম্বন্ধের সূত্র নেই যাকে অবলম্বন ক'রে সত্যিকার কোনো রাখীবন্ধন হ'তে পারে। অথচ ওর মতামত আমার উপরে ক্রমশ এমন প্রভাব বিস্তার করছে যাকে প্রায় মোহের পর্যায়ে ফেলা চলে।…সারারাত ঘুম হ'ল না—মনের পটে ক্রমাগত নাতাশার ধনুর্ভঙ্গিম ঠোঁট দুটি ফুটে উঠতে লাগল যখন সে বলেছিল: যদি ওর বাবা

নাতাশার সঙ্গে আমি মিশছি কেন জিজ্ঞাসা করে বসেন! সে-হাসির মধ্যে শুধু যে ব্যঙ্গ ছিল তাই নয়—তাহ'লেও তো বাঁচতাম—কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল একটা তাচ্ছিল্যের তাং—যেন, জ্যাকব-যে-জ্যাকব, সে-ও যা পারে তুমি তাও পারো না'! মনটা আগুন হ'য়ে উঠল জ্যাকবের প্রতি—অকারণ। ঐ অসার বিলাসপ্রিয় ছেলেটার কাছে হার মানব—যার না আছে বিদ্যা, না বুদ্ধি, এমন কি একটা গুণের মতন গুণও নেই। ও অমন মুরুব্বিয়ানা করে কিসের জোরে শুনি! মন কেবল তাল ঠুকতে লাগল। আজ একথা ভেবে হাসি পায়—হয়ত তোরও হাসি আসছে—কিন্তু সে সময়ে মনের মধ্যে এই আলার তাপে হাসির সমস্ত রস আমার গিয়েছিল উবে। তোর রাতে উঠে ঘরে বেসিনের কল্‌কনে ঠাণ্ডা জলে মুখ মাথা ধুয়ে একটু আরাম মনে হ'ল। জ্যাপলেরস্ লার্ভেনবুর্গে থাকতাম। সে-অঞ্চলে খুব ভোরে কাকে ডোলে। বেরিয়ে পড়লাম ঐ ট্রামে—সেখানে টেলিফোন করতে। এক পেয়ালা কফি খেয়েই টেলিফোনের খুপরি ঘরের মধ্যে ঢুকে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রিত স্লট-এ ফেলে টেলিফোন করলাম নাতাশাকে।

'কী ব্যাপার! এত সকালে?' নাতাশার বিছানার কাছেই একটা টেলিফোন থাকত।

আমি কুণ্ঠা ঝাড়িয়ে ফেলে বললাম: 'এমনি। আছ কেমন?'

'তুমি কেমন তাই বলো। রাতে ঘুম হয়েছিল খুব ভালো তো?'

'ঘুম হবে না কেন?' আমার একটু আশ্চর্য্য লাগল বৈ কি।

ওর হাসি শোনা গেল: 'তা হবেই তো। এতবড় একটা ফাঁড়া কাটিয়ে গেলে মনের জোরে—আত্মপ্রসাদ আসবে না? La sommeil du juste—বলে না?'*

রাগ হ'ল খুব, বললাম: 'কাল থেকে এমন বাঁকা সুর ধরেছ কেন শুনি?'

ও একটু নরম সুর ধরল: 'আচ্ছা, এত রুক্ষ টোন কেন? সকাল বেলাই মাথা গরম করলে দুপুরবেলায় করবে কী?'

আমি বললাম: 'তোমার সঙ্গে দেখা।'

'সে কি? কী জন্যে? দুপুর বেলায়?'

'সেই কথা রেস্তোরাঁতে খেতে এলে বলব।'

'আহা এখন একটু আভাসও দেবে না?' টোন তখন বেশ নরম—যাকে বলে conciliatory.

'মানে···আমি···অর্থাৎ তোমার সঙ্গে কার্নিভালে যদি নাচতে যাই?'

'বলো কী? ধর্ম্মত্যাগ! শুধু কার্নিভালে যাওয়া নয় তার উপর নাচ?'

'কেন কেবল কেবল ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা কইছ নাতাশা? তুমি কি ভাবো তুমি যা ভালো মনে করো তাতে যার সায় নেই সে-ই ব্রাত্য কিম্বা তিরস্কারের পাত্র?'

---

* মানুষের নিশ্চিন্ত ঘুম—ফরাসী প্রবচন।

"ও এবার খুব মিষ্টকণ্ঠে বলল: 'আমার অন্যায় হয়েছে, অসিত। আমি তা নই যা তুমি ভাবছ। জ্যাকব তোমাকে ডিঙিয়ে কাল আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল এজন্যে তাকে আমি খুব ব'কে দিয়েছি জানো?'

"মনটা এক মুহূর্তে পুলকিত হ'য়ে উঠল, বললাম: শোনো নাতাশা, জ্যাকবের কথা যাক দাও। আমি ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে কার্নিভালে গিয়ে নাচব। দেখো। আমিও তা নই যা তুমি ভেবেছ।'

"ও খুব খুশি হ'য়ে বললে: 'সাবাস মনামি! এই তো চাই।' ব'লেই হেসে: 'আমি শুধু তিরস্কারই করি না—পুরস্কারও দিতে জানি। এক্ষুনি ওকে ব'লে পাঠাচ্ছি ওর কার্নিভালে যেতে হবে না।'

"আমার একটু কুট মতলব এল, বললাম: 'সেটা কি ভালো হবে! ওকে যখন নিমন্ত্রণ করেছ ও ক্ষুণ্ণ হবে না?'

"ও খিল খিল ক'রে হেসে উঠল ঠিক যেন চমৎকার ঘণ্টা—মিষ্ট—স্বরহীন।

বলল: 'ও:! ওকে পরে একদিন পিঠ চাপড়ে দিলেই হবে।'

'কিন্তু···এতে কি একটু অকৃতজ্ঞতার মতন হবে না?'

'অকৃতজ্ঞতা আমার কী? তুমি যখন যাচ্ছ তখন ওকে আর আমার কী দরকার?'

"টেলিফোনের বরাদ্দ সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। রিসীভার রেখে বেরিয়ে এসে আর এক পেয়ালা কফি খেতে খেতে ভাবতে লাগলাম। মনটার মধ্যে কোথায় খুঁৎ খুঁৎ—না তার চেয়েও বেশি—একটা অস্বস্তির ভাব: কাজটা ঠিক হচ্ছে না। অবিশ্যি জ্যাকবের জন্যে নয়—ওর সাজা হয়েছে, বেশ হয়েছে। কিন্তু যে-মেয়ে কোন সঙ্গীর সঙ্গে এভাবে মিশতে পারে যাতে ক'রে সে তাকে শুধু মাত্র নিজের দরকারের অনুপাতেই মূল্য দেওয়ার মধ্যে দুয়ো কিছুই দেখে না তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা—বিশেষ নাচের আবহাওয়ায় ঘনিষ্ঠতা!—আমার সুবুদ্ধি বলল: 'সাবধান!' পবিত্রের একটা কথা মনে পড়ল: 'আগুনের সঙ্গে খেলা ভালো নয় অসিত।' আর নাতাশা শুধু রূপের শিখা-ই নয়—তার উপরে প্রিয় বান্ধবী—আগুনের সঙ্গে ছুটেছে বাতাস। রাস্তায় রাস্তায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে মনে একটু জোর পেলাম। কী করতে যাচ্ছি? নাচতে! আর নাতাশার সঙ্গে? একটা টেলিগ্রাম আফিসে ঢুকে ধাঁ ক'রে তার ক'রে দিলাম: 'কার্নিভালে যাওয়া হবে না—জ্যাকবকেই নিয়ো সঙ্গী ক'রে। নিরুপায়—হাইডেনবার্গ যেতে হচ্ছে হঠাৎ দিন কয়েকের জন্যে কিছু মনে কারো না। বিশেষ জরুরী।' অতঃপর হাইডেনবার্গ রওনা—বেলা ১১।০ টায়। আর ওকে ভুল বুঝিয়ে।"

ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ নীরবতার পূর্বচ্ছেদ। ছায়া অসিতের দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল: "বুঝেছি অসিদা। এত ছেলেমানুষ আমি নই। কিন্তু···একটা প্রশ্ন শুধু করতে চাই, করব?—না এমন কিছু প্রশ্ন নয় শুধু—মানে এটুকু আমি বুঝতে পারি যে এর পরে নাতাশার সঙ্গে তোমার মিশতে কুণ্ঠা আসতে পারে। কিন্তু ওর সঙ্গে মিশতে যখন তুমি চাইছ তখন শুধু নাচবার বেলাই বা এত সঙ্কোচ কেন? বিপদ যখন মোড়ের মাথায় তখন সে-মোড়ের দিকেই না ঘেঁসা—এ বুদ্ধি। কিন্তু

বিপদ তো শুধু নাচার মোড়েই ওর পেতে নেই? মেশার মোড়ে মোড়েও তো তার ঘাঁটি। তবে? মিশবে অথচ নাচবে না—এর মানে কী?

অসিত একটু চম্‌কে ওঠে, তার পর ছায়ার একটি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বলে: "দিদি, এ-প্রশ্নটা তোর পাগলে হয়েছে আমাকে মানতেই হবে। এও মানতে তাই আমার খুব আপত্তি নেই যে আমি হয়ত উল্টো পাল্টা কথা ব'লে বন্ধুকে একটু কাপসাই করে তুলেছি। সত্যের পুরোপুরি রূপটা একটিমাত্র কটাক্ষে মেখে নেওয়া হয়ত সম্ভবও নয়। কিন্তু আরো একটু কথা আছে। সত্য যতটুকু দেখেছি সবটুকু খুলে বলা কঠিন হয়, শুধু যে সাহসের অভাবে তাই নয়—যা দেখেছি তাকে কথায় ফুটিয়ে তোলা এ একটা প্রতিভা। আমার হয়ত নেই সে প্রতিভা।"

"আ—হা! বেশ জানো—"

"না শোন্ দিদি। যখন প্রশ্নটা উঠেছে ও তুই ঠিক জায়গায়ই আমাকে খোঁচা দিয়েছিস তখন বলেই ফেলি—বিশেষ যখন বিপাকে কথাটা পাড়লি। শোন্, নাতাশা সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে মিশতাম কেন বিপদ জেনেও এই তোর প্রশ্ন? আর, ওর সঙ্গে মিশতে ভয় না পেয়ে থাকি তাহ'লে ওর সঙ্গে নাচতে ভরাই কোন মুখে—তখন সত্যিই তো ওর বাপ কী ভাববে ভেবে দেখেছিস নি। প্রশ্নটা করেছিস এবার বেশ মোক্ষম ক'রে—মানছি। কিন্তু উত্তরটা যে মোক্ষম নয়—তবু বলতেই হবে—বিশেষ যখন না বললে এখন আর মান থাকে না। কেবল পরে আমাকে দুষিস নে—ছেষিস্।

অসিত একটু হাসে তার পরই গম্ভীর হয়ে সুরু করে: "হয়েছে কি জানিস? সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে 'মিশবার' সময়ে যতটা সাবধানতার কাটখড় খরচা হয়—'নাচবার' সময় তার চেয়ে অন্তত চতুর্গুণ কাটখড়ের জোগাড় রাখতে হয়। কেন না নাচবার সময় মন ঢিল দেয়—নাচার আবেশে। আর এ শুধু যে নাচের কথা তাই নয়—এ হল ওদেশের হাল চালের কথা—আবহাওয়ার কথা। ভুক্তভোগী জানে ওদেশে মনকে অসাবধান করতে কতরকম শক্তি যুগিয়ে থাকে সুযোগ সৃষ্টি করে বেচাল করবার জন্যে। তবু খানিকটা রিস্ক নিতেই হয়—প্রবৃত্তি শোনে না ব'লেও বটে, ও দেশে গিয়ে সব বিপদের ছোঁয়াচই কাটিয়ে কাজ হাসিল করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব এরকম বজ্রদৃঢ় পণ করার মতন মনের জোর বেশি ছেলের নেই বলেও বটে। কিন্তু সব বলা হয়ে গেলেও শেষটায় একটা না একটা যায়গায় পাঁড়ি টান্‌তেই হয়—স্বভাব আর বুদ্ধি এই দুয়ে মিলে দেয় সে-সীমার নির্দেশ। অন্য ভাষায়: সাবধান হয়ে যতদূর পর্যন্ত টাল সামলানো যায় তার বেশী এগুতে চাওয়ার নামই হঠকারিতা। নিজেকে খুব বেশী বিশ্বাস করা কিন্তু নয়। Lead us not into temptation বলেছিলেন স্বয়ং খৃষ্টদেব। আর ভাগবতে অমন যে প্রহ্লাদ সেও করেছিল এই একই প্রার্থনা: 'মা মাং প্রলোভয়'—আমাকে প্রলোভনে ফেলো না ঠাকুর!—সেদিনই পড়ে শোনাচ্ছিলাম না তোকে? নানা ব্যাপারে নানা মুনির রকমারি মত হ'লেও এই একটি ক্ষেত্রে তাদের সবারই সুর মিলেমিশে এমনই এক হ'য়ে গেছে যে সুর থেকে আলাদা ক'রে তাদের চিনবার পর্যন্ত জো নেই। বুঝেছিস্ কি এবার? না এখনো ঘোলা ঠেকছে?"

ছায়া আবছা হাসে ঘরের মধ্যে কথার রেশ যায় মিলিয়ে। শুধু সেই ঘড়িটার টিক্ টিক্ টিক্।

অসিত ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালায় অন্যমনস্ক ভাবে শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা সরিয়ে রেখে তাকায় ছায়ার দিকে। সে তখনো ঘাড় নীচু করে।

"অত কী ভাবনা রে?" অসিত ওর ঘাড়ে হাত রাখে সামনে।

ছায়া ওর চোখের পরে চোখ রেখে বলে: "ভাবছি—তুমি থেকে থেকে আমাকে এভাবে বিপদে ফেলে কী সুখ পাও?"

"বিপদ?"

"নয় তো কী? তুমি যা বললে তার পরে তোমার আবলুসকে সত্যাচার বলার কোনো পথই আমার তুমি রাখলে না। অথচ—এরপরে তোমার উপর কই একটুও অশ্রদ্ধা আসছে না তো!"

অসিত হাসে হো হো ক'রে: "ঐ তো দিদি! করাত কাটে সে দুধারেই কি না। তাই যাকে দেখতে নারি তার যেমন চলন বাঁকা, তেমনি যাকে দেখতে পারি তার সবই পাকা আর কি। এমন কি সে-প্রবলের মিথ্যাচারকেও হয়ত তোর ঠিক অতটা সঙ্গিন মনে হ'ত না যদি—মানে যদি তাকে একটু ভালোবাসতিস—যেমন ধর আমাকে বাসিস।"

ছায়ার মুখের বিষাদ মেখে ঝ'লে উঠল রাগের বিদ্যুৎ: "খবর্দার! অমন অলুক্ষুণে কথা মুখেও এনো না—না না না—আমি কিছুতে শুনব না। তার চেয়ে যে কথাটা হচ্ছিল সেটারই খেই ধরি।"

"কী কথা?"

"আমি বলছিলাম না—তুমি যাকে বলছ মিথ্যাচার, তাকে সত্যাচার ব'লে প্রমাণ করতে না-পারা সত্ত্বেও যে তোমার উপর আমার অশ্রদ্ধা আসছে না এটুকুও কেন তুমি বুঝবে না?"

অসিত ওকে কাছে ডেকে এনে আদর ক'রে বলল: "বুঝি নি, কে বললে? এযে জলের মতনই স্বচ্ছ রে! আমাকে স্নেহ করার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পরলি স্নেহের অঞ্জন। এ-অঞ্জন পরার পরে মানুষ যেমনটি দেখে পরার আগে যে তেমনটি দেখে না একথা তিন ভুবনে না জানে কে? না, তোর ওকথা আমি দিব্যি বুঝেছি। যেটা বুঝতে পারছি নে সেটা—তোরই ভাষায় বলি—তাহলে দাঁড়ালো কী?"

"তার মানে?"

"মানে—পয়লা নম্বর—যে-মানুষ মিথ্যা বলে বা মিথ্যাচার করে শুধু একটা ভঙ্গিমা করতে, তাকে অশ্রদ্ধা-না-করাটা ভালো কাজ, না খারাপ? দোসরা নম্বর—যদি তাকে তবু শ্রদ্ধা করতেই হয় তবে সে-শ্রদ্ধা আসে কি তার মিথ্যাকে শ্রেফ ক্ষমা ক'রে—বা ধর্তব্যের মধ্যেই না এনে?"

"বা রে! এ-প্রশ্ন উঠল আবার কোত্থেকে?"

অসিত ওর চোখে চোখ রেখে বলল : "তুই এইমাত্র বলিস নি যে আমার মিথ্যাচারের জন্যে তোর মনে অশ্রদ্ধা এলেও আসতে পারছে না ?"

ছায়া ওর মুখ চেপে ধরে : "না ছাড়ব না।—যাও।—না তোমার সঙ্গে আর কথাই কইব না—তোমার সব তাতেই কেবল ঠাট্টা আর ঠাট্টা। আমি বলেছি—তোমার উপর আমার অশ্রদ্ধা এসেও আসছে না ?—না, বলেছি—এর জন্যে তোমাকে অশ্রদ্ধা করবার কোনো তাগিদই আমি খুঁজে পাচ্ছি না মনের মধ্যে ?

অসিত হাসে : "আচ্ছা আচ্ছা, নাহয় ঐভাবেই ঘুরিয়ে বলা হ'ল কথাটিকে সত্যভঙ্গ ক'রে। কিন্তু প্রশ্নটা তবু রইল একইভাবে খাড়া মনে রাখিস।"

"কী প্রশ্ন আবার ?"

"যে যাকে তুই খুব ভালোবাসিস তার অমর্যাদা যে করে তার প্রতি কি মনটা নরম হয়, না কঠিন ?"

"আহা যেন নরম হওয়ার প্রশ্ন ওঠে এখানে।"

"তা'হলেই দেখ, সত্যকে যদি কেউ যেমন ভালোবাসে মনপ্রাণ দিয়ে তবে সে তার কাছে এমন জীবন্ত হয়ে উঠবে না কি যাতে তার অঙ্গ হানি কাউকে করতে দেখলে তাতে করে সে তেম্‌নি ব্যথা পাবে যেমন ব্যথা পায় নিজের অঙ্গহানি হ'লে ? সত্যকে যদি আমি যেমন ও যতখানি শ্রদ্ধা করি—মানে যেমন ও যতখানি শ্রদ্ধা করা উচিত—তাহ'লে যদি দেখি কাউকে এ-হেন শ্রদ্ধার বস্তুকে অনাদর করতে তাহ'লে কি তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে উঠবে না বিমুখ ভাব আসবে ! শোন্ শোন্, অমন কাঁদ কাঁদ মুখে তাকাস্ নি—কারণ কথাটা এত কিছু সত্যিও নয়—মন খারাপ করবার মতও। নয়, এ যৌক্তিক সান্ত্বনা নয়। জগতটাই যখন পাঁচমিশিলি তখন তার ছোঁয়াচ কিছু না কিছুতো লাগবেই তার সব কিছুতে। কাজেই যুগে যুগে কালে কালে নির্ভেজাল কোনো কিছুই এখানে ঠাঁই পেয়েও পায় নি—পেতে পারে না ব'লেই—আপোষ রফা নিষ্পত্তি এই সব নিয়েই মানুষকে ঘর করতে হয়েছে এবং হচ্ছে।"

ছায়া ক্ষুণ্ণ সুরে বলে : "কিন্তু যে আপোষে নারাজ তার বেলা ? ঘর থাকবে না তার ?"

অসিত মৃদু হাসে : "ঘর মিললেও হয়ত মিলতে পারে কিন্তু কলা ছাড়তে হবে, নইলে মিলবে শুধু কান্না। মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার শোনা একটি গল্প। রাজা মৃগয়ায় গেছেন—হঠাৎ পলাতক মৃগ ভেবে বাণ হানেন আর কি এমন সময়ে সে চিৎকার ক'রে বলল কালিদাসী ভাষায় : 'ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্ মৃদুনি নরশরীরে'—অর্থাৎ মৃগ ভ্রমে নর প্রত্যয় আর কি। রাজা তো অবাক্—কাছে গিয়ে দেখেন—সত্যিই তো জলজ্যান্ত মানুষ—কেবল ননমরা। "ব্যাপার কি ঋষিবর ?"—'ঋষি নই মহারাজ, আমি ছিলাম গৃহী, নাম উচিত। তবে উচিত কথা বলি ব'লে ঘরে আমার স্থান হ'ল না—সবাই মিলে দিলেন আমাকে "বনবাস" প্রেস্ক্রিপ্‌শন—যার ফলে মৃগদের সঙ্গে চ'রে খেয়ে খেয়ে চেহারাটাও অমনি দাঁড়িয়ে গেল।'

ছায়া হাসল না—একমুহূর্ত অসিতের চোখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বলল : "কিন্তু তাহ'লে দাঁড়ালো কী অসিদা ? যে এসংসারে উচিত, মানি, নিখুঁৎ কিছুই ঠাঁই পাবে না—মানে সবার মধ্যে সহজ চালে ?"

অসিতেরো মুখের হাসি উবে যায় : "জানি না দিদি। তবে ইতিহাসের এজাহার যদি মানতে হয় তবে বলতেই হয় যে সে-চালে সংসার চ'লে এসেছে এতদিন সে-চালে চললে খাঁটি কোনো কিছুই পারবে না পুরোপুরি তার শুদ্ধতা বজায় রাখতে। জলে ডুবিয়ে ধরলে যেমন সোজা লাঠিও বাঁকা দেখায় না? ধর্ম অনুসারে শক্তি আর কি।"

"ঠিক বুঝলাম না ভাই, মাফ কোরো।"

"একটু গোড়া নিয়ে টানাটানি কি না—বোঝানো শক্ত। তবে মোট কথাটা এই যে জীবন যে ধর্মে কোনমতে হোঁচট খেতে খেতে চ'লে এসেছে বা চলতে চাইছে সে-ধর্মের নেই সে-শক্তি যা কোন নির্ভুত আবির্ভাবের ভার সইতে পারে। পরমহংসদেবের সেই বিখ্যাত উপমা মনে কর্—হাতি নামলে ডোবা ওঠে টলমল ক'রে। সত্য যাকে বলছিস্—মানে নির্ভুল সত্য—সে হ'ল এমনিই একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড, অবতরণ—তার শান্তি আনন্দের ভার মানুষ বেশিক্ষণ সইতে পারে না। কিন্তু অমন কাঁদ কাঁদ মুখ করিস নে। রোগটা এখানে পুরোপুরি তোর বা আমার বা উচিত মুক্তির নয়—ব্যাধি জটিল। তবে সংক্ষেপে তার নিদান হ'ল এই যে সত্যকে সৌন্দর্যকে পেতে হ'লে তাকে ভালোবাসতে হয়—বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা—আর কি। কিন্তু প্রেম তো সহজ কথা নয় দিদি, বৈষ্ণব কবি বলেছেন বড় ভুগেই : 'বিরিখের ফল নহে তো পিরীতি, নাহি মিলে যথা তথা।'

"তাই ব'লে কি সে-ফলের বীজও বুনব না অসিদা? হাল ছেড়ে দেব?"

অসিত হাসল : "এতদিন আমার সঙ্গে মিশে কি আমার সম্বন্ধে তোর এই ধারণা হ'ল যে হাল ছেড়ে দেওয়ার জন্যেই সংসার ছেড়ে আশ্রমে ঢুকেছি। না, সংসারের সঙ্গে অনেক সময় নৈষ্কর্ম্য ঘোষণা করতে হয় সংসারকে অস্বীকার করতে না। যখন নৌকোয় চড়েছি একবার—হাল ছেড়ে দিলেও তো নিষ্কৃতি নেই—কেবল ঘাট ছেড়ে পৌঁছব আখাটায়। আর এই হাল ছেড়ে না-দেওয়ারই নাম তপস্যা, যার চাষ বিনা কোনো ফলের বীজই ফলে না। তুই তো গান করিস :—'এমন মানবজমি রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।' এই সোনা-ফলার একটা ফল হ'ল সত্যকে ভালোবাসা। কিন্তু যতদিন এটা ক'লে না ওঠে ততদিন শুধু যে সত্যকে ভালোবাসতে পারি না তাই নয়—ভালোবাসতে চাইও না তেমন ক'রে। তাই তো বলতে পারি না যুধিষ্ঠিরের মতন মনমুখ এক ক'রে : 'সত্যন্তু মে রক্ষ্যতমং—ন রাজ্যম্'—আমার রাজ্য যায় যাক, কিন্তু সত্যকে ছাড়ব না—বরং উল্টোটাই বলি অম্লানবদনে যে রাজ্যরক্ষার জন্যে যতটুকু দরকার সত্যের মূল্য তার বেশি নয়—এক কানাকড়িও নয়—ও কি রে? চোখে জল। কী পাগল মেয়ে!" অসিত ওকে কাছে টেনে ওর চোখ মুছিয়ে দেয় : "বললাম না—এজন্যে দোষটা পুরোপুরি একটা মানুষের নয়? সমস্ত দিনদুনিয়ার কর্মফলের সরিক যে আমরা প্রত্যেকেই—তাই এজন্যে মনে কষ্ট রাখিস নে দিদি, লক্ষ্মীটি।"

ছায়া গাঢ় কণ্ঠে বলে : "যখন তুমি নির্ভরসা ক'রে দিলে……কষ্ট রাখব না?"

"নির্ভরসা?"

"নয় ? বলবে না—সত্যকে আমরা শুধু যে ভালোবাসতে পারি না তাই নয়—চাইও না ? তাহ'লে বাঁচব কেমন ক'রে বলো তো ?

"আরো ভালোবাসতে চাইব—মানে শিখব।"

"কেমন ক'রে শুনি ?

অসিত একটু হাসে : "ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়—আর একথা বিশেষ ক'রেই খাটে ধর্মের জগতে।"

"কিন্তু ইচ্ছাই যখন নেই—যা তুমি বললে এই মাত্র ?"

"তখন কর্মযোগ—সাধনা—হাবুডুবু—যতদিন না সে-ইচ্ছা দেখা যায়। অন্ধকার আসে যে আলোর তৃষ্ণা বাড়াতে এ তো আর কবিকল্পনা নয় রে !"

"কিন্তু এ তো গেল তত্ত্বকথা অসিদা—কিম্বা.....বড় জোর স্বপ্ন।"

"এ জীবনে তাই বটে, কিন্তু যে-জীবন আমাদের ডাকছে বাহুখানি দিয়ে—আছে আমাদের পথ চেয়ে—সে-জীবনে এই স্বপ্নই নেবে রূপ—যেমন প্রতিমার স্বপ্ন নেয়—পটুয়ার মাটিতে।"

ছায়ার চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে : "নেবে সত্যি ? মানে, চাক্ষুষ করা যাবে এমন রূপ ?

"না গেলে কি আর আবহমান কাল মহাপুরুষেরা পেয়ে আসতেন মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তরণের গান ? না, শুধু গান বললেও মানব না, কেন না তাঁরা তাঁদের নিজেদের জীবনে এ-অমৃতরূপের কিছু ফুটিয়ে তুলেছেন ব'লেই আমাদের নমস্য হয়েছেন, নয় কি ?"

"কিন্তু সে ক-জন অসিদা ? তোমারি লেখাতেই গানের ভাষায়—কোটিতে গোটিক।"

"গুরুদেব বলেন আলো জ্বলে প্রথম একটা প্রদীপেই—কিন্তু তা থেকে সবাই নিতে পারে তাদের সলতে জেলে।"

ছায়ার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে : সে কি সম্ভব অসিদা ? মানে—এজীবনে !"

"নিশ্চয়—যদি আমরা চাই প্রতিপদে বাঁচার সেই ছন্দকে অঙ্গীকার করতে—যে-ছন্দে আমরা সিদ্ধিলাভ করতে পারি ইচ্ছা করলে—মানে, সাধনা করলে। কিন্তু হ'লে হবে কি—আমরা শুধু যে ইচ্ছা করতেই নারাজ তাই তো নয়—ইচ্ছা-না-করার ভাবকে যুক্তি সাজাই রকমারি—সাধনার কষ্ট এড়িয়ে যেতে।"

"সাধনা। কিসের ?"

"ঐকান্তিকতার—অর্থাৎ সব ছেড়ে একমুখী হবার।"

"কোন্ মুখে সে অসিদা !"

অসিত আবছা হাসে : "নামে কী আসে যায় দিদি—যখন সব ছাড়িয়ে মানুষকে একমুখী করতে পারে যে-বস্তু সে এক বৈ দুই নয় ?"

কর্ণেলের সমস্যা

সুজাতা রায় এম, এ, এম, এড্ (লীডস্)

সৈনিকেরা সব এক জায়গায় বসে গল্প করছিল। তাদের কর্ণেল সেখানে এসে হাজির হলেন। সৈনিকেরা সকলে সচকিত হ'য়ে উঠল, কিন্তু ভয়ের কোনও কারণ দেখা গেল না। কর্ণেল তাদের সঙ্গে গল্প করতে বসে গেলেন। কর্ণেলের কাছে গল্প শোনা। যে যেখানে ছিল কাণ খাড়া করে তাঁর কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কর্ণেল বল্লেন—"আজকে তোমাদের আমি লেফটনেন্ট এস.....এর একটা কাহিনী শোনাব।" তিনি বলে যেতে লাগলেন যে এস.. ...ছিল প্রথমে অশ্বারোহীর দলে, সে এসে পদাতিকদের সঙ্গে যোগ দিল কিন্তু অশ্বারোহীর পোষাক পরে থাকবার অনুমতি তাকে দেওয়া হল। সে পোষাক দেখবার মত বটে—ওপরের কুর্ত্তা গায়ের সঙ্গে আঁটা, ফোলানো পাজামা,—ঝক্‌ঝকে কোমরবন্ধ, পালিশ-করা জুতো—এক কথায় বলতে গেলে পোষাকের চাকচিক্য দেখে তাকে সৈনিক না মনে করে ঘোড়দৌড়ের মাঠের সৌখিন কোনও লোক বলে ভুল হতে পারত।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। এরকম বৃষ্টি, ট্রেঞ্চের মধ্যে এরকম কাদা, তার ওপর দিয়ে রক্তগঙ্গা—এর আগে কেউ দেখেনি। সেই বছরটায় সব রকম অভাব—খাওয়ার, পরার, যুদ্ধোপকরণের—ঘর করেছিল শুধু এক অপরাজেয় আত্মিক শক্তি। তাই দেখা গিয়েছিল এমন কৃতিত্ব, এত বুদ্ধির বিকাশ। মানুষ তার পরিচিত জগৎ ত্যাগ করে যেন অন্য এক রহস্যময় জগতে গেছে। তাই তার সামাজিক-রীতিনীতি সব কিছু যেন পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গিয়েছে। পোষাক-আশাকের ওপর মানুষের আর কোনও দৃষ্টি নেই, পুরাণো ছেঁড়া কাপড়—যে যা পেয়েছে তাই পরে যাযাবরের যুগে ফিরে গিয়েছে, সভ্য জগৎ যেন বিলুপ্ত। তাদের মধ্যে দেখা দিল লেফটনেন্ট এস্ এর এই নিখুঁত পোষাক—এ নিয়ে যে সৈনিকদের মধ্যে একটা আলোড়ন হবে এ আর বিচিত্র কি?

মিত্রশক্তির সৈনিকেরা তখন আর্টুয়ের পশ্চিমে মোজেল নদীর ধারে ছিল। তোমরাও জান কি দারুণ যুদ্ধ সেখানে হয়েছিল? চারদিকেই শত্রু—কাজেই একটা উঁচু জায়গা যদি দখল করতে পারা যায় তবেই জয়ের সম্ভাবনা। কি ভাবে সেই জায়গায় পৌছাতে হবে, শত্রুসৈন্যেরা ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় আছে,—এই সব বুঝে নেবার জন্য একদল সন্ধানী সৈন্য আগে পাঠিয়ে খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন। এই কাজের দায়িত্ব পড়ল লেফটনেন্ট এস.....এর ওপর। ঠিক হ'ল পাঁচ ছয়টি বিশ্বস্ত সৈনিক নিয়ে তিনি লুকিয়ে শত্রুর অবস্থানটা বুঝে আসবেন।

কয়েকদিন ধরে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে জোলো হাওয়ার আমেজ। বনজঙ্গল একটা পাতলা সাদা কুয়াশার আবরণে ঢাকা। ট্রেঞ্চগুলি কর্দমাক্ত ও অতি ভয়ানক, কোনও রকমে একটু জল-নিকাশের ব্যবস্থা করা গেলে এবং কয়েকখানা তক্তা ফেলে নিলে তবেই তার মধ্যে দাঁড়ানো সম্ভব। তা না হলে তারমধ্যে প্রবেশ করাই এক ব্যাপার। এই ট্রেঞ্চের মধ্যে দিয়ে গিয়েই সন্ধানী সৈন্যদের ঐ খবর সংগ্রহ করতে হ'বে, অন্য উপায় নেই। তাদের কি অবস্থা হবে সেটা ভেবে কর্ণেলের একটু দুঃখ হ'ল। কিন্তু সেই সঙ্গে লেফটেনেন্ট এস.....এর পোষাকের দুর্দশার কথা ভেবে কর্ণেল মহাশয় একটু চাপা হাসি না হেসেও পারলেন না। পদাতিকের কি দুঃখ তা অশ্বারোহীরা জানে না; আজ লেফটেনেন্ট এস.....এ বিষয় ভাল করেই সমুকে আসবেন।

কর্ণেলের গল্প এই জায়গায় এসে পৌঁছলে শ্রোতাদের মুখেও চাপা হাসি দেখা দিল—সেই ফোলানো পাজামা, সেই চকচকে কোমরবন্ধ, পালিশ-করা জুতো, নতুন কুর্তা—হায়, তাদের গৌরব কোথায় থাকবে? সকলের চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো বেচারী লেফটেনেন্ট এস...এর কর্দমাক্ত পোষাকের চেহারা। তার প্রতি বিদ্বেষ না থাকলেও শ্রোতাদের হাসির মধ্যে কি একটু শ্লেষের আভাস ছিল না!

সহকারীদের নিয়ে লেফটেনেন্ট এস.....কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। তাঁদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় কয়েকঘণ্টা কেটে গেল। কর্ণেল তাদের জন্যে যে আশ্রয়-শিবিরে অপেক্ষা করছিলেন ক্রমে ক্রমে সেখানে অন্যান্য সকলে এসে জড় হ'তে আরম্ভ করল। পত্রবাহক, বন্দুকধারী, সাধারণ সৈনিক, এমনকি পাদরী সাহেব পর্যন্ত সেখানে এসে জুটলেন। টেলিফোনের কর্মচারী, আর্দালী কেউই বাদ গেল না—কেবল বাদের তখন ডিউটি তারা ছাড়া সকলেই এই সন্ধানী দলটীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অসাধারণ কিছু ঘটতে দেখা যায়নি, দু'চারটে বন্দুকের আওয়াজ যা সাধারণতঃ শোনা যায়—তার বেশী কোনও আওয়াজ আসেনি, কাজেই কোন বিপদের আশঙ্কা কারো মনে ছিল না।

আন্দাজ মত সময়ে ঘুরে দেখা গেল সেই দলটি ফিরে আসছে—সকলে একসঙ্গে নয়, একজনের পর একজন কিছু ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে আসছে। প্রথম লোকটি কাছাকাছি আসতেই মনে হ'ল যে এ তো মানুষ নয়—এ যেন একটি কাদার ঢিপি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগাগোড়া কাদা লেপে সমান হ'য়ে গিয়েছে, হাত পা মাথা বলে আলাদা কিছু নেই। এই ঢিপির ভেতর থেকে শুধু একটি হাসির শব্দ বাইরে আসছে। সৈনিক তার প্রাণ নিয়ে নিরাপদে স্থানে এসে পৌঁছতে পেরেছে। প্রথমটির পেছনে দ্বিতীয়টি, তারপর তৃতীয়টি এবং পরপর সব কয়টিরই একই অবস্থা। তাদের দলপতি লেফটেনেন্ট এস.....তাদের অনেক পেছনে আসছেন, তাঁর চেহারা তখনও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। আগে থাকতেই তাঁর সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা এদিকে চলছিল, এখন তাঁর সঙ্গীদের দেখ্‌বার পরে দর্শকেরা অত্যন্ত খাপ্পিয়ে অতি কষ্টে হাসি চেপে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কি কাণ্ড! সকলকে একেবারে নিরাশ হ'তে হ'ল। লেফটেনেন্ট এস.....যেমন গিয়েছিলেন ঠিক তেমনিই ফিরে এসেছেন, জুতোর তলায় কাদা লেগেছিল বলে

বোঝা যাচ্ছে, তাও ঘাসে মুছে এসেছেন, কিন্তু তাঁর শরীরের আর কোথাও এতটুকুও কাদার চিহ্ন নেই। শুরুতে পোষাক যেমন পরে গিয়েছিলেন ঠিক সেই রকমই রয়েছে।

একি তোড়বাজী নাকি? লেফটেনেন্টের আপাদমস্তক যেন গ্রাস করে কর্ণেল দেখতে লাগলেন সৈনিকদের কুচকাওয়াজের আগে পরিদর্শক যেমন করে দেখেন। কোথাও তাঁর কোনও ত্রুটী নেই, কিন্তু এই ত্রুটীর অভাব আজ কি তাঁর প্রশংসার কথা? কোনও কাপুরুষতা এর পেছনে লুকিয়ে নেইত? সেই কথা ভেবে সকলের মন যেন গ্লানিতে ভরে গেল। দর্শকেরা সকলে বিনাবাক্যব্যয়ে সেখান থেকে চলে গেল—রসুইয়েরা গিয়ে পাকশালায় ঢুকলো, টেলিফোন কর্মচারীরা তাদের অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করল, পাদ্রী অন্যমনস্কভাবে পকেট থেকে ধর্মসঙ্গীতের বইখানা বের করে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কোনও দিকে আর সাড়াশব্দ নেই।

কিন্তু কর্ণেলের যা কিছু জ্ঞাতব্য ছিল লেফটেনেন্ট তার সব উত্তর বিশদভাবেই দিলেন। কাছাকাছি ট্রেঞ্চগুলিতে শত্রু এখনও এসে পৌঁছতে পারেনি, এমনকি যে ট্রেঞ্চগুলি তারা অধিকার করে আছে সেগুলিও ভালভাবে তাদের দখলে নেই। মনে হয় যেন তারা আরও সহকারী বাহিনীর প্রতীক্ষা করছে। কর্ণেল ঔৎসুক্যহীন দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি শত্রুসৈন্যের লাইন পর্য্যন্ত গিয়েছিলে?" লেফ্‌টেনেন্ট বললেন, "হ্যাঁ, একেবারে ওদের লাইন পর্য্যন্তই গিয়েছিলাম।"

"ট্রেঞ্চগুলির অবস্থা কি রকম?"

"অসম্ভব ব্যাপার। ওগুলি ব্যবহার করতে হ'লে তক্তা পাতা ছাড়া উপায় নেই। কোমর পর্য্যন্ত কাদা জমে গিয়েছে।"

"তুমি যেতে পার। তোমার সৈনিকদের একে একে সকলকে পাঠিয়ে দাও, প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি কথা বলতে চাই।"

"আজ্ঞে তারা সকলেই এখানে হাজির আছে।"

"আচ্ছা বেশ, এবার তাদের পাঠাও।

লেফ্‌টেনেন্ট এস..... চলে গেলেন, তাঁর সহকারী কাপ্তেন ক্রেমও উপস্থিত হলেন। কর্ণেল ভাবতে লাগলেন লেফ্‌টেনেন্টের গতিবিধি সম্বন্ধে এঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত কিনা। এক নিদারুণ সন্দেহে তাঁর মনটা বিষিয়ে উঠেছে, তার নিরাকরণ করা একান্তই দরকার, কিন্তু উপরওয়ালা সম্বন্ধে নীচের কর্মচারীকে কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে কি? লেফ্‌টেনেন্ট এস.....ট্রেঞ্চগুলি পার হয়ে কখনই যায়নি, সে তার সৈনিকদের পাঠিয়ে খবর নিয়েছে, নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছে; তার কাপড় অথবা গায়ে যখন একটুও কাদা লাগেনি তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে কাপুরুষতার কাদা লেগেছে তার চরিত্রে; অথচ এপর্য্যন্ত কোনওদিন তার কোনও নিন্দা তো কেউ শোনেনি। পরিচিত সকলেই তার সাহস এবং কর্মক্ষমতার উচ্চ প্রশংসা করে এসেছে। সুতরাং তার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে কর্ণেল নিজেই লজ্জা বোধ করতে লাগলেন।

কিছু করাইবা যায় কি? কর্ণেলের মন সন্দেহে আকুল, লেফ্‌টেনেন্টের অদ্ভুত পোষাকের রহস্যটা কোনও মতেই তিনি ভেদ করতে পারলেন না। ভেবে চিন্তে যখন বার করা যাবে না তখন সৈনিকদের জিজ্ঞাসা না করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। অথচ প্রশ্ন করলেই সৈনিক জীবনের শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করা হয়। একজনের পর একজন সৈনিক এসে ট্রেঞ্চগুলির এবং শত্রুপক্ষের অবস্থানের বর্ণনা দিয়ে গেল, তবু কোন রকমেই লেফ্‌টেনেন্টের সম্বন্ধে সন্দেহের নিরাকরণ হ'লনা। শেষের সৈনিকটীও তার বর্ণনা সমাপন করে চলে যাবার উপক্রম করল। এখনও যদি কোন কিছু না জানা যায় তা হ'লে চিরকালের মত এ ব্যাপার রহস্যময় থেকে যাবে। কর্ণেল মরিয়া হয়ে গিয়ে বলে উঠলেন, "ট্রেঞ্চের কাদার অবস্থা কি রকম?"

"আজ্ঞে আমার অবস্থা দেখলেই সহজে বুঝতে পারবেন।" কর্ণেলের মুখে প্রায় এসে গেল "কিন্তু তোমার দলপতির এরকম অবস্থা হ'ল না কেন?" তবে শেষ পর্য্যন্ত এই কঠোর কথাটা তিনি বলতে পারলেন না। অথচ এই শেষ সৈনিকটিকে তিনি সহজে ছেড়ে দিতেও পারলেন না; তাদের অভিযানের বিষয় নানারকম খুঁটিনাটি প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের গায়ে কি গুলি লেগেছিল?" তাতে সৈনিক উত্তর দিল, "আমরা তো ট্রেঞ্চের ভেতরে ছিলাম, গুলি কি করে লাগবে?" কর্ণেল জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে কে সব থেকে বেশী সাহস দেখিয়েছিল?" সৈনিক ইতস্ততঃ না করে বললে, "আজ্ঞে, আমাদের দলপতির সাহস অসম্ভব।" কর্ণেল বললেন, তার মানে কি? তিনি তোমাদের থেকে বেশী কি করেছেন? সৈনিক বলল, "আজ্ঞে, তিনি যখন দেখলেন যে ট্রেঞ্চের ভেতর ভয়ানক কাদা তখন তিনি ট্রেঞ্চটা লাফিয়ে পার হয়ে গিয়ে ওপারে পোষাক খুলে রেখে কেবলমাত্র নীচের জামা কাপড়ের ওপরে এক চট জড়িয়ে নিয়ে, শত্রুসৈন্যের ট্রেঞ্চের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তখন সবে সকাল হ'য়ে আসছে, অন্ধকারের ঘোর তখনও কাটেনি, তার ওপরে চারিদিকে কুয়াশাতে ঢাকা। তা ছাড়া চটের ত' রঙ নেই। কাজেই উনি যে আমাদের পক্ষের লোক তা শত্রুরা আন্দাজ করতেও পারেনি। ঐ অবস্থাতেই তিনি চারিদিক ঘুরে সব দেখে এলেন।" কর্ণেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সৈনিককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করলেন। কর্ণেল, লেফ্‌টেনেন্ট এস্‌.....কে সেইদিনই সান্ধ্য ভোজে নিমন্ত্রন করলেন। খাওয়া শেষ হলে কর্ণেল গম্ভীর ভাবে লেফ্‌টেনেন্টকে বললেন, "ওহে বাপু। তোমার পোষাকটা সবই মূল্যবান কিন্তু তোমার প্রাণের মূল্য তার চেয়েও বেশী নয় কি? ভবিষ্যতে যদি অনুসন্ধানের কাজে তোমাকে যেতে হয় তখন ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়েই যেতে চেষ্টা করো।"

বন্দিনী

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

কপালে 'সিঁথি ঝাঁপ্‌টা', নাকে নোলক, গলায় সাতনরী হার। সর্ব্বাঙ্গেই নতুন গিলিটোপার ছটা। পায়ে— ঘুঙুর গাঁথা মলের নীচে আবার ভারী ভারী 'পানকল্কা' বসানো চরণপদ্ম'।

সভ্যদেশের লোকের চোখে পড়লে বলতো—'অত্যাচার'।

তবে আমরা এখনো—প্রায় সভ্য হয়েও এসব বস্তুকে অলঙ্কারই বলি।.....তা' সে যাই হোক—অলঙ্কারের ঘটা যতোই থাক, গায়ে জামা সেমিজের বালাইমাত্র নেই।...সোনালি জরির তেরছা ডুরে টানা একখানা ঘোর বেগুনী বেনারসী শাড়ী পরণে।

অবশ্য 'পরণে' না বলে জড়ানো বললেই বেশী ঠিক বলা হয়।

আট বছরের মেয়ের পক্ষে—সাঁচ্চা জরির ভারে ভারাক্রান্ত পুরোপুরি একখানা শাড়ী সত্যিই কি আর পরা সম্ভব? তাই জরজরে আর ঘটঘটে আঁচলটা মমতালেশহীন-চিত্তে গুটিয়ে মুটিয়ে কোলের উপর জড়ো করে ধরে নববধূ উর্দ্ধমুখে আর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঠাকুরদালানের উচ্চতা নিরূপণ করতে থাকে।

উঃ কতো মোটা মোটা আর কী ভয়ঙ্কর উঁচু উঁচু থাম! থামের গায়েও আবার কতো বাহার, চিত্তির বিত্তির করা। কার্নিশগুলোর বাহার দেখলে তো তাক লেগে যায়!.....

অতো উঁচুতে উঠে অতো লতাপাতা আঁকলো কে? মিস্তিরি? কিন্তু কি করে?...ঘিলেনের পর ঘিলেনে..... দালানের ভিতর আবার দালান, ঠাকুরের বেদীটা কতো দূরে—ঈস্।

দেওয়াল গুলোই বা এমন চকচকে হলো কি জন্যে?

স্বর্ণকুমারীর নিজের বাপের বাড়ীতে না হয় মাটির দেওয়া
ঠাকুর দালানই তো দেখেছে মুখুয্যেদের।...মুখুয্যেদের তো চাষা ভুষোর
ঘটা হয় তাঁদের বাড়ীতে পূজোর সময়।

সব পূজোতেই হয়—কিন্তু সব থেকে বেশী দুর্গা পূজোর পুরো চারদিন ধরে খালি বাজনা বাজে।..... বাজনার আওয়াজে সব সময় যেন বুকের মধ্যে গুম্‌গুম্ শব্দ হ'তে থাকে।...ঠিক ভয় করার মতো।...সেই কেমন এক আতঙ্ক মিশ্রিত আনন্দময় মানসিক অবস্থা নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পূজোর দালানের আশে পাশে

ছেলে বুড়ো, উচ্চ নীচ, সাধু ফকির, চাকী চুলি, অনেকের ভীড়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে শুধু ঘুরে বেড়ানো...কী অদ্ভুত মজা লাগে সেই চারটী দিন।

'পেসাদের' ডাক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটার স্মৃতিটাও কম হৃদয়গ্রাহী নয়।...আঃ মনে করলেই যেন 'চিনসিটুলী বেতন ভাজার' গন্ধ নাকে এসে লাগে। বুকের মধ্যে বাজনার শব্দ 'গুম গুম' করে ওঠে।... সকলেই জানে 'রাজাই' কাও মুখুয্যেদের।

কিন্তু তা'ও এরকম চকচকে দেওয়াল তো নেই তাঁদের? একটু হাত বলে দেখবার লোভ অনেক কষ্টেই সংবরণ করে স্বর্ণকুমারী। নেহাৎ নববধূ এবং সঙ্গে মেজননদ ভাশা রয়েছে বলে। কি জানি কি বলে বসে দেখলে! বিয়ের আগে তা'কে উঠতে বসতে যতো সাবধান করা হয়েছে তা'র কোনো কথাটাই স্পষ্ট মনে না থাকলেও একটা অপরাধী আর আতঙ্কিতভাব শেকড় গেড়ে গেছে মনের মধ্যে। কোনো কিছু—নির্দোষ কিছু করতে গেলেও ভয় করছে—কাল এদের বাড়ী আসা থেকে।

মুখুইতো শ্বশুরবাড়ী নয়—বড়লোক শ্বশুরবাড়ী যে।

স্বর্ণকুমারী শুনেছে সব কত কথা—পিসিমা আর মা'তে যতো গল্প হচ্ছিল সেদিন।...খুব না কি বড়লোক এরা।...মুখুয্যেদের চাইতেও অনেক—অনেক বেশী; ধোৎ তাই কি আর হয়? কে জানে হবেও বা।..এই তো গয়না আর চকচকে সব কতো কাপড় দিয়েছে এরা স্বর্ণকুমারীকে।...

স্বর্ণকুমারী ফরসা বলে আর অনেক বেশী চুল আছে বলেই নাকি বৌ করলো এরা। নইলে করতো না কি? স্বর্ণদের তো তিনটে মোটে মাটির ঘর।...তাকগে মকগে. দৈত্যপুরীর মতো বড়ো একটা বাড়ী আর গাদা গাদা লোক দেখে তো হাঁফিয়েই উঠেছে স্বর্ণ কাল থেকে।...কোথায় ঘর, কোনদিকে দালান, ক'টা সিঁড়ি বুঝতেই পারা যায় না।

তার থেকে এই পূজোর দালানই ভালো।

ভালোর মতো ভালো। দেখলে সমস্ত শরীর যেন আনন্দে অবশ হয়ে আসে।

হ্যাঁ, বিশ্বাস যদ্দে বটে বড়লোক।

মুখুয্যেদের চাইতে [redacted] লোক।

—ঠাকুরঝি শোনো ভাই—নববধূ-সুলভ ভিসভিস্ স্বরে সোৎসুক প্রশ্ন করে স্বর্ণ—ওপরে ছাতে সারি সারি অতো লোহার বাসা ঝুলছে কেন?

'ঠাকুরঝি' না বলে উপায়ও নেই, কাল আসা মাত্রই শাসিয়ে রেখেছে ভাশা—খবরদার নামটাম কোরোনা বলছি, আমি তোমার চেয়ে এক বছরের বড়ো হই বুঝলে? 'ঠাকুরঝি' বলবে।

—বালা কি গো বৌ? শ্যামা হেসে ওঠে—ঝাড় লণ্ঠনের আইটা ওগুলো। কাড়ের আলো দেখোনি বুঝি কখনো?...দেখেছো? তবে? একশো বাতির সব ঝাড় ঝুলিয়ে দিতে হয় ওখানে। আর এই সামনে যে ছুটো দেখছো—টানাপাখা বোলায় ওতে।...টানাপাখা দেখেছো তো?

ঝাড় লণ্ঠন! ওঃ।

মুদ্রোবাড়ীতে জলে বটে—একটা।...

যাত্রার আসরের ঠিক সামনে নাটমন্দিরে। কিন্তু—দালানে এতো আলো। উঃ সবগুলো একসঙ্গে জেলে দিলে কী মজাই হয়! লোকে বুঝতেই পারবে না নিশুত দিন না রাত্তির।

এদের কি সবই অদ্ভুত?

দেউড়ীর মাথায় দিব্যি একখানা ঘর বানিয়ে রেখে দিয়েছে, ন'বৎওলারা নাকি ওর উপর চড়ে বসে সানাই বাজাবে। শোনো দিকিন কথা? উঠবে কি করে? মই দিয়ে?.....

নাঃ, দালান বটে!

পায়ের পাতাটা মেঝের চেপে চেপে শ্বেতপাথরের শীতলত্বটুকু অনুভব করবার চেষ্টা করে স্বর্ণ।

অভিভাবিকা শ্যামা এসব ভাববিলাসের ধার ধারেনা, সে নববধূর একটা হাতে টান মেরে রীতিমত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলে—হাঁ ক'রে ওপরমুখো হয়ে দেখছো কি? বেদীতে পেন্নাম করে—চলে যাই চলো তাড়াতাড়ি? মা বকবেন যে দেরী হলে।

খিলেনের পর খিলেন গাঁথা...থামের সারির পর থামের সারি...চারখানা দালান পার হয়ে শেষের-টায় দেবীর আসন গাঁথা।..... প্রায় দু'হাত উঁচু প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া মার্ব্বেল পাথরে গড়া বেদী..... তার ওপর চড়ানো রয়েছে বহু কারুকার্য্যখচিত কাঠের 'কাঠিমা'।

কী বিরাট! কী প্রাণভরা! উঃ! এই কাঠিমায় যখন প্রতিমা সাজানো হয়?

শ্যামা নিজেই তাড়াতাড়ি বেদীর গায়ে মাথাটা একবার ঠেকিয়ে নিয়ে তাড়া দিয়ে ওঠে—নাও—করো পেন্নাম?

কাঠিমাখানাও দেখতে হবে হা করে? আদেখলে ঘরের মেয়ে কি না!

ন'বছরের মেয়ের মুখে এই কথা। না, অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। শ্যামার মাত্র ন'বছর বয়স বলে সংসারের কোনো কথা কেউ তার সামনে রেখে ঢেকে বলবে তা তো নয়?

তা' স্বর্ণ অবশ্য এতোবড় অপমানেও বিশেষ বিচলিত হয় না। তেমনি উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল স্বরে বলে—এ কী কাণ্ড ঠাকুরঝি? যতো বড়ো 'পিরতিমে' হয় তাই? দালানের ছাতে ঠেকে যায় না তো?

ভ্রান্ত ঠোঁট উল্টে বলে—পুজোই হয় না তা' পিরতিমে।

পুজোই হয় না!

সে আবার কেমন কথা! তোমার কি মাথার ঠিক নেই?

স্বর্ণ একটা মানে ঠিক করে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে—ছি ঠাকুরঝি, ওরকম ঠাট্টা করতে আছে নাকি?

—ওমা ঠাট্টা আবার কি? জিগ্যেস কর গিয়ে সবাইকে। হাঁ, আগে পুজো হতো শুনেছি, খুব ধুম ধাম করেই হতো। সাত গাঁয়ের লোক নেমন্তন্ন খেতে আসতো। বাজনাবাদ্যির শব্দে নাকি কান ঝালা হয়ে যেতো অনেকে ……সে তখন আমি জন্মাইনি।……এখন উঠে গেছে।

—পুজো উঠে যায়?

বিস্ফারিত দুই আর রুদ্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে প্রশ্ন করে স্বর্ণ।

—তা' উঠে যাবেনা? খুঁৎ হয়ে গেলো যে!

—খুঁৎ? সে কি ঠাকুরঝি?

—আঃ তা'ও জানো না নেকি। কেউ মরে গেলেই খুঁত হয়ে যায়।……আমি জন্মাবার আগের বছরই অষ্টমী পুজোর দিন সকালবেলা নাকি সবাই এসে দেখলে আমার যে বড়ো ভাই ছিল—কেষ্টগোপাল—সে ওই দালানে ঠাকুরের সামনে মরে রয়েছে!

—অ্যাঁ! সে কি ঠাকুরঝি! কি করে হলো?

—তবে আর বলছি কি।……কি করে হলো তা কে জানে। কবরেজে নাকি বলেছিল 'সন্নিপী রোগ' নাকি। মা কেঁদে কেঁদে বললেন, 'পুজোয় অপরাধ হয়েছে—আর কখনো পুজো করবো না।

জন্মাবধি শতাধিকবার শোনা কাহিনী স্বচ্ছন্দেই বলে যায় তারা। কোনো ভাবলক্ষণই প্রকাশ পায় না তার মুখে। কিন্তু স্বর্ণ? শুনে স্বর্ণরই যে সন্ন্যাস রোগ হবার জোগাড়।

—মরে গেল ছেলেটা! তাইতো! কিন্তু প্রথাই ফুরোলেই তো মানুষ মরে যায় ঠাকুরঝি, তাই বলে 'পুজো করবোনা' বলতে আছে? অ্যা! তাতে বুঝি পাপ হয় না?

—কে জানে বাবা পাপ-পুণ্যি বুঝিনা। যা শুনেছি তাই বলছি। ……পুজোয় চারদিন ধরে শুধু কাঠ্‌রার ওপর একটা 'বীর পিদ্দিম' জ্বেলে রাত্তিদিন ভোর।……আর কিছু না।

বেনারসীর আঁচল জড়ো হতে হতে ক্রমশঃ কোল আঁচলে টান ধরে……অতো খেয়াল নেই স্বর্ণর, নিতান্ত শূন্য মনে সে আবার ফ্যাল ফ্যাল করে চারিদিক তাকিয়ে দেখে।……কিন্তু সে আনন্দ, সে উৎসুক্য কই…

পুজো হয় না। পিরতিমেই আসেনা।

প্রতিমাহীন এই শূন্য বেদীখানা খাড়া করে রাখার অর্থ কি তবে?

হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞানহীন বালিকা একটা কাণ্ড করে বসে—কাঠ্‌খাদ মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে—রীতিমত জোরের সঙ্গে বলে ওঠে—আমি বড়ো হয়ে আবার ফিরতিনে আসবো—পুজো করবো। করবো করবো করবো করবো—তিন সত্যি।

—বৌ!…

ঘুমে জামার কণ্ঠেও যেন আগুন করে পড়ে—কী সর্বনাশ করলি? অ্যাঁ?…বেদী ছুঁয়ে তিন সত্যি করলি? পাপে ডুবে নরকে যাবি যে।

স্বর্ণর স্বরটা এবারে একটু দুর্বল শোনায়—যাঃ, 'তিন সত্যি' করে না রাখলেই তো নরকে যায় মানুষ, নইলে—সুধু সুধু—

—রাখবি কি করে শুনি? এ দালানে আর পুজো হবে না কি কখনো?

—যাঃ কেন হবে না? মানুষ বুঝি মরে যায় না? ঠাকুরের কি দোষ হলো?…

—দোষগুণ বুঝিনা বাবা—চলো তোমায় কীর্ত্তি বলে দিচ্ছি সবাইকে।—অ্যাঁ! নতুন কনের আস্পদ্দা দেখো। উনি বড়ো হবেন—হয়ে পুজো করবেন! গিন্নী হবার সখ এখুনি।—কী ঘেন্নার কথা বাবা।…এই জন্যেই বলে ছোটোঘরের মেয়ে আন্‌তে নেই।

স্বর্ণ এবারে একটু আহত হয়; বোধকরি 'ছোটঘর' কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় বলেই।…কিছুক্ষণ পূর্বের ভীতভাব ছেড়ে দৃপ্তভঙ্গীতে মাথা উঁচু করে বলে—বেশ আমরা গরীব আছি—আছি। আমাকে বৌ করবার কি দরকার ছিল তোমাদের শুনি?……ভারী তো বড়োলোক! দুর্গা পুজো হয় না, আবার বড়োলোক।……

'শ্বশুরবাড়ী' নামক ভীতিকর স্থানটী সম্বন্ধে বহু হিতৈষিণীর বহু উপদেশ আর শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে স্বর্ণকুমারী বধূজীবনের প্রারম্ভেই একটী রেকর্ড রেখে বসে থাকে।

আটবছরের মেয়ের পক্ষে অপরের মুখের পাকা কথাগুলো আয়ত্ত করা যতো সহজ—ততো সহজ নয় সদুপদেশগুলো।

জামাও রাগে গরগর করে দালান থেকে নেমে পড়ে—বেশ বেশ, আমি এই চল্লাম বলে দিতে। ……ওমা ওমা কাণ্ড দেখো— কাপড়টা খুলে যাচ্ছে কোমর থেকে।…হি হি হি।…ভালো করে কাপড় পরতে পারে না, এখুনি গিন্নী হওয়ার সখ!

'বলে দেওয়ার' নামে ভয়ে বুক দুরুদুরু করে উঠলেও তেজস্বিনী নববধূ অনুনয় করতে যায় না।… আরক্ত মুখে সেই দশহাত শাড়ীখানা সামলে পরবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে তা'র পিছন পিছন ছোটে।……

জনশূন্য এই বিরাট দালানে—মুক্তবেণীর সামনে একলা দাঁড়িয়ে থাকার সাহস তা'হলে তার নেই।

সত্যাবদ্ধের ইতিহাস এই।

বিয়ে বাড়ীতে অজস্র লোকের মুখে মুখে সেদিন যা কড় উঠেছিল—ছোট্ট এই মেয়েটার ঔদ্ধত্যের পরিচয়ে; সেকথা আজও মনে আছে স্বর্ণকুমারীর।...বধূর শিক্ষাদীক্ষার অভাবে তার আমন্ত্রিত পিতাকেও কম গঞ্জনা খেতে হয়নি।···রূপের জন্যে ছোটোঘরের মেয়ে এনে যে কতো নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছেন, সে কথা বাড়ীর কর্তাকেও ধিক্কার দিয়ে জানানো হয়েছিল।·····

নতুন কনের এতোবড় কথা। এতো দুঃসাহস!!

স্বর্ণকুমারীর বয়েস যে মাত্র আট এই কথাটাই শুধু মনে পড়েনি কারুর।

অনেক কাণ্ড, অনেক কথা, অনেক 'হিহি'কারের পর শ্বশুর ভগবতীচরণ এক সময় বৌকে ডেকে বলেছিলেন—শোনো বৌমা; ঠাকুরের বেদী ছুঁয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছো তুমি, তা' পালন তোমাকে করতেই হবে—কখনো না কখনো। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে এ-বাড়ীতে পূজো হবার উপায় নেই। তবে তোমাকে অনুমতি দিয়ে যাবো—আমরা দু'জনে মরে গেলে—প্রতিমা এনে পূজো কোরো। না করলে অনন্ত নরক।

সেই আট বছর থেকে আটচল্লিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত 'অনন্ত নরক ভোগের' আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে কাটিয়ে এসেছেন স্বর্ণকুমারী, পক্ষাঘাতগ্রস্ত শাশুড়ী মারা গেলেন বৈশাখে—সেই শ্রাবণেই শ্বশুর গেলেন রক্তাতিসারে ভুগে।

আটচল্লিশ বছর বয়েস তখন স্বর্ণকুমারীর।

তখন স্বর্ণকুমারীর সাত আট ছেলে মেয়ে...কারুর বিয়ে হয়েছে, কারুর হয়নি।···মেয়ে জামাই নাতি নাতিনে এলাহী কাণ্ডর সংসার। সেই—ব্রত কথার মতো—'চেঁকি পড়ুক গাই বিয়ুক উনুন জ্বলুক।'...

যেন কড় বইছে রাত্রিদিন!

শ্বশুর-শাশুড়ীর কালাশৌচের বছর পার করে—প্রতিমা এনে পূজো করবার দৃঢ় সংকল্প জেগে দিয়ে গেল মেজছেলে নবীন···তাদের শেষে হঠাৎ মারা গিয়ে।...বিয়ে হয়েছিল বছর দুই।

এদিকে অবস্থার ভাঙন ধরেছে আস্তে আস্তে।

অপদার্থ স্বামী·····অনেক রকম নেশার তাড়নায় অলক্ষিতে স্বর্ণকুমারীর ভাগ্যের ঘরে সিঁদ কেটে সংসারের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করেছেন ধীরে ধীরে।...

যখন ধরা পড়লো তখন বেশী কিছু অবশিষ্ট নেই।

জমিদারী নেই, নাম আছে।

শূন্যগহ্বর লোহার সিন্দুকের মতো অন্তঃসারহীন সেই নামের ভার বহন করে করে দীর্ঘপথ এগিয়ে চলা কী কষ্টকর! কী সেই দিন স্বর্ণকুমারীর!···সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত রুক্ষ কঠোর ধূসর! তবু ওপরে আনতে হবে কোমলতার আবরণ, রাখতে হবে চাকচীক্য!

প্রজারা আসে...কুটুম সাক্ষাৎ আসে···আসে দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়বর্গ—আগের মতোই আশা নিয়ে। ...কেবল মাত্র মুখের কথা, কেবল মাত্র হাসির প্রলেপে, কেবলমাত্র সুদূর ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়ে কতোদিন আর ভোলানো চলে তা'দের?···

অবশেষে···নামও গেল।

রইল শুধু···নিতান্ত অভাবগ্রস্ত বিরাট একটী সংসার, পক্তনোন্মুখ বিরাট এই অট্টালিকা আর অসাধ্য সাধনের দুষ্কর তপস্যা।

একটী একটী করে পয়সা জমিয়ে টাকায় পরিণত করতে কতদিন লাগে কি?

সাত গাঁয়ের লোক নেমন্তন্ন করে হাজার বাতির ঝাড় ঝুলিয়ে পুজো করবার দুর্দমনীয় সাধ আর নেই...কিন্তু একবার যেমন তেমন করে পুজো করবার মতো অবস্থাই বা এলো কই স্বর্ণকুমারীর জীবনে?

কি করবেন স্বর্ণকুমারী? কি করবেন?

প্রায় শৈশবের পরিণামহীন নির্বুদ্ধিতার বশে একদা যে বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে তিনসত্যি করে বসেছিলেন—আজ তিনহাজার বার সেই পাষাণে মাথা ঠুকলেও কি কিছু ফল হবে?

দেবতা এমনিই কঠিন? এমনি একচোখো?

বুদ্ধিহীন বালিকার অর্থহীন প্রতিজ্ঞার অর্থ আছে তাঁর কাছে—সেই সারাজীবনের প্রার্থনায়? তবে কি এ স্বর্ণকুমারীর অনধিকার চর্চা? অসঙ্গত সাধ? তাই বারেবারেই তাঁর সাজানো ব্যবস্থা চূর্ণ হয়ে যায়...প্রতিটী বছর এই একই নাটকের অভিনয় দেখে আসছেন স্বর্ণকুমারী।...

সেই শঙ্কতের হাওয়া ওঠে মনের মধ্যে বেজে ওঠে আগমনীর বাঁশি···সেই ঘটতে থাকে অভাবিত সব ঘটনা।···

রোগ শোক...অর্থাভাব.. আকস্মিক বিপদ।...

একটী দুটী করে জমানো অর্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যেতে দেরী লাগে না।

কিন্তু এতেও সংকল্পই বা ছাড়েন না কেন স্বর্ণকুমারী?

কিসের এই বন্ধন?—সংস্কারের? প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপের?...না প্রায় আজন্মের উগ্র আকাঙ্খার? এই বিরাট শূন্য বেদীতে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করলে কেমন দেখায় একবার চোখ বুজে দেখবার সাধই কি অবিরত খোঁচা দিয়ে আসছে না স্বর্ণকুমারীকে?

কিন্তু পঞ্চাশ বছর ধরে আলেয়ার পিছনে ছুটে ছুটে যে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন।

নিশ্চিন্ত হয়ে সংসারই বা কবে করলেন তিনি?

হাঁটুর—স্বর্ণকুমারীর শরীরটা যে ভেঙে পড়ছে ক্রমশঃ।

আর কি পারবেন তিনি দুর্গোৎসবের ধকল সামলাতে? ঘটা না থাক—প্যাঠা তো থাকবেই?... লোকবল নেই, নেই অর্থবল। সেজছেলে—সুরেশ কেবলমাত্র যে ছেলে—মোটা মাইনের চাকরী করে; সেই তো আজ দশ বছর বাড়ীছাড়া।

প্রতিবছর পুজোর আগে চিঠি লিখে লিখে হাররাণ হয়ে যান স্বর্ণকুমারী।... নিজের ক্ষমতা নেই লেখবার—তাই প্রত্যেকবার এক লোককে দিয়ে লেখাতে লজ্জা করে···বারে বারে লেখক বদলান—পাড়ার ছেলেদের খোসামোদ করে করে।

এবারে অনেক বলা-কওয়ায় পাঁচশো টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েছিল সুরেশ···সেটাকা খরচ হয়ে গেল তাদের পিতৃশ্রাদ্ধে।—তবে? সুরেশেরই বা অপরাধ কি?

এবারেও হলো না।

সাদা ধবধবে নতুন থানপরা স্বর্ণকুমারী সপ্তমীর সকালে বেদীতে সিঁদুর চন্দনের ফোটা আর প্রদীপ জেলে দিতে এলেন।

পুরনো আমলের প্রকাণ্ড ভারী পিতলের প্রদীপ—তাতে করে ঘী দেবার অবস্থা আর নেই এখন। ···হাতে করে বয়ে উঁচুতে তুলে দেবার ক্ষমতাই কি আছে আর?

বার্দ্ধক্যের সমস্ত লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কোমরটাও যে একেবারে ভেঙে গেছে।

নতুন থানের খসখসে আঁচলটা দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে হঠাৎ একখানা নতুন বেনারসী শাড়ীর খসখসে আঁচলের ঝলক যেন বিদ্যুতের মতন খেলে গেল চোখের সামনে।...

না, চোখের সামনে নয়—মনের সামনে।...

সেই শাড়ীপরা ছোট্ট মেয়েটাকে হাতে পেলে ধরে একবার আছাড় মারেন না কি স্বর্ণকুমারী?... যে হরণ করেছে স্বর্ণকুমারীর দীর্ঘ জীবনের সমস্ত সুখশান্তি। অহরহ দংশন করছে মনের মধ্যে। যে আজ অতি-আকাঙ্খিত মৃত্যুকেও ডাকতে দিচ্ছেনা সাহস করে।

চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন স্বর্ণকুমারী।

স্বর্ণকুমারীর স্নেহের মতো—দালানেও ঘুণ ধরেছে।...

সামনের দুখানা দালানের একটা দিক খসে পড়ে ইঁটের স্তূপ জমা হয়ে পড়ে আছে ও দিকে। মহবৎখানার চিহ্ন মাত্র নেই, দেউড়ীর ইটগুলো স্তূপ হয়ে পড়ে থাকার কুদৃশ্য দেখতে না পেরেই বোধহয় প্রতিবেশীরা দয়া করে তুলে নিয়ে গিয়ে গিয়ে সাফ্ করে ফেলেছে। ...উঠোনে আগাছার ঘাস ...থামগুলো দীতবার্-করা...ঝাড় লণ্ঠন টাঙাবার সেই আঙটা গুলো—বালির আস্তর আর ছাদের টালিগুলো সুদ্ধ নিয়ে নেমে পড়েছে অনেকেই...মরচে-ধরা এক আধটা এখনো আছে আটকে।

শ্বেতপাথরের মেঝেটা বিবর্ণ খসখসে.....পদ্মের কাজ-করা চকচকে সেই দেওয়াল গুলো পুরনো পালিশের কিছু চিহ্ন আর বিবর্ণ রং নিয়ে যেন কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র।

চিত্রবিচিত্র-করা কাঠের কাঠরাখানা ইদুরে কেটে কুটিকুটি করেছিল সেবছর—এবারে দেখা যাচ্ছে ঘুণে আর রাখেনি কিছু। কার্নিশের প্রত্যেকটি খোপে খোপে পায়রার বাসা। চামচিকের আস্তানা।

অথচ আজও সত্যরক্ষা হয়নি স্বর্ণকুমারীর।

প্রতিমাহীন শূন্যবেদী আজও অপেক্ষা করছে সার্থক হবার আশায়। অপেক্ষা করছে ঐশ্বর্য্য-ময়ী মহাশক্তির আবির্ভাবের।

পরের বছর বৈশাখ থেকেই শয্যা নিলেন স্বর্ণকুমারী।

আর দিন নেই—আর দিন নেই।

সারাজীবনের সমস্ত সঞ্চয় ছাপিয়ে ভারী হয়ে উঠছে সেই কণ্টকিত আশঙ্কা। এই দীর্ঘ-দিন এতো পরিশ্রম, এতো সংগ্রামের শেষে স্বর্ণকুমারীর জন্যে কিনা তোলা আছে অনন্ত নরক!

ভাদ্রের শেষে ছেলেমেয়ে সকলেই দেখতে এলো।

পঁয়ষট্টি বছরের হিসাব নিকাশ শেষ করে এবার তা'হলে চললেন স্বর্ণকুমারী!

—কিন্তু মরেও যে আমার শান্তি নেই বাবা।...

ছেলেদের হাত ধরে ধরে কাতর প্রার্থনা করলেন স্বর্ণকুমারী—আর একটা মাস টায়ে টোয়ে বেঁচে থাকবো বাবা—শেষ অনুরোধ রাখ বাবা আমার। একবার 'পিরতিমে' এনে পুজো কর ওই দালানে, নিজের চক্ষে দেখে যাই আমি।

ছেলেরা উড়িয়ে দিয়ে বললে—কেপেছো।

জানছে বড়োজোর আর এক সপ্তাহ টিঁকবে বুড়ি।

—পেটের ছেলে হয়ে আমার পরকালের সদগতির চিন্তা করবি না তোরা? চিরদিন তোদের জন্যে জীবন-পাত করলাম।

—সে তো সকলেই করে থাকে মা, কিন্তু সে কথা নয়—কথা হচ্ছে পরকালে স্বর্গ তোমায় আটকায় কে? ···অনর্থক বাজে একটা কুসংস্কার নিয়ে—

—থাক্ বাবা, ও কথা বোলোনা। আচ্ছা আমি যা, আমার হুকুম বলেই করো তবে?···কখনো তো কোনো হুকুম করিনি।

—বুঝলাম তো করোনি—কিন্তু দেশের অবস্থা জানো এখন। খবর রাখো কিছু?···একখানা কাপড় পাওয়া যায় না—একমুঠো চাল মেলেনা।···চার পয়সার জিনিস চার টাকায় কিনতে হয়।···

—যেমন তেমন করে—চিরদিনের আকিঞ্চে আমার।

—যেমন তেমনও সোজা নয় মা—মেজবৌ টানাটানা সুরে বলে—ভালো সময়েই যা আপনি নিজে খেয়ে উঠেছিলেন কই?

স্বর্ণকুমারীর কোটরগত চক্ষুতেও একবার পূর্বকালের আগুনের আভা ঝলসে ওঠে—থাক্ মেজবৌমা, তোমাকে সাটখুড়ি করতে বলিনি, তোমরা পারবে কি না বলো?···সুরেশ? দীনেশ? অসমীশ? খোকা?... আচ্ছা বেশ।···

ছেলেদের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন স্বর্ণকুমারী...আশ্চর্য্য। সপ্তাহের মধ্যে টেঁসে যাওয়া তো দূরের কথা—বরং একটু ভালোই হয়ে উঠলেন—অগত্যা যে যার কর্মস্থলে যাবে না কি করবে?···

স্বর্ণকুমারীকে দেখতে?

সে তো পুরনো আমলের নাপিতবৌ রয়েইছে।

স্বর্ণকুমারী বেঁচেই রইলেন।

যোগনের বাজনা বেজে উঠলো চারদিকে ···কিন্তু বিসর্জনের যে আর দেরী নেই সেটা হৃদয়ঙ্গম বৈকলো অনুভব করছেন ক'দিন।

কি হবে? কি হবে?

যে যা হুগ্‌গা কি করলে।

আবার সুদিনের আশায় একটী বছর অপেক্ষা করার সময় কই? হঠাৎ মহালয়ার পরদিন ঘুম ভেঙে উঠে নাপিতবৌকে ডেকে বললেন—রতন কুমোরকে ডাকতে পাঠিস মা?

—রতন কুমোর? কেন মা?

—আছে কাজ, তুই ঝট্ করে যা। কোনো ওজর শুনিস না।

তা' কুমোর এলো, বিনা ওজরেই এলো। পুরনো দিনের প্রথা।

কিন্তু প্রস্তাব শুনে তার চোখ কপালে উঠে গেছে।…

অবাক হয়ে বলে—তাই কি হয় মাঠাকরুণ? যোধন বসে গেছে, তিন দিন বাদে পূজো, এর মধ্যে পিরতিমে গড়া হয় কখনো?

—গড়া নেই রতন? ছোটো খাটো একটু পিরতিমে?

হাহাকারের মতো শোনায় স্বর্ণকুমারীর কণ্ঠস্বর।

—না মা। যে কখানা বায়না ছিল তাই নিয়েই হিমসিম। তা' এক কাজ করুন না…ঘটে পটে—

—না বাবা, প্রতিমা আনতেই হবে আমাকে—

রতন আর নাপিতবৌ মুখ-চাওয়াচায়ি করে।…আহা, মাথাটা একেবারেই গেছে বুড়ির।…সন্তর না হতেই বাহাত্তুরে।

মুখে বলে—আচ্ছা মা সন্ধান করে দেখি—যদি কারুর ঘরে থাকে।…এ গাঁয়ে নেই অন্য গাঁ দেখতে হয়।

আগ্রহের আতিশয্যে বিছানায় উঠে বসেন স্বর্ণকুমারী।—তাই দেখো বাবা, তাই দেখো…মরণকালে আশীর্বাদ করছি ভালো বোক তোমার।

রাত্রি কাটে দিন যায়…কোথায় বা রতন, আর কোথায় বা তার প্রতিমা। তীমরথী বুড়ির হাত এড়িয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে সে।…কিন্তু স্বর্ণকুমারীর যে মরবারও উপায় নেই…পঞ্চমী ষষ্ঠী সব হয়ে গেল যে।…

সপ্তমীর ভোর বেলা নাপিতবৌ এসে বিছানায় কর্ত্রী না দেখে অবাক…রোজই রাত্রে থাকে সে, কালকেই মুখু বারোয়ারী তলায় নাম্বকোল কুরে দেবার বরাত ছিল।…কী সর্ব্বনাশ! শয্যাগত বুড়ি গেল কোথায়।…

সারা বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে নিতান্তই অন্যমনস্ক হয়ে পূজোর দালানে এসে পড়লো সে।…অবিশ্যি এতো ঘুরে আসবার কথা নয়—তিন পা হাঁটতে পারেন না যে স্বর্ণকুমারী।…

শেষেছেন বৈকি।···ভিতর দালানের মাঝখানে পড়ে কে? স্বর্ণকুমারীই না?···চারিদিকে খড়-ছড়ানো আর তাল তাল ভিজে মাটি···আড়ষ্ট কঠিন দুখানা হাতেও শুকিয়ে-ওঠা কাদার চিহ্ন।

কী নিদারুণ ক্লেশের চিহ্ন ফুটে রয়েছে—শিরাবহুল শীর্ণ মুখে!

কিন্তু কেন?

অন্তহীন ব্যর্থতার ইতিহাস? না—অনন্ত নরকের ভয়াবহ আশঙ্কা?

সারাজীবন ধরে সে ভোগ কি কম হয়নি স্বর্ণকুমারীর?

মাটীর প্রতিমা

মহাকালের অন্তরে জেগেছে তীব্র বাসনা···অনন্ত যুগের মধ্যে আমি বাঁচিয়ে রাখবো আমার ধারাবাহিকতাকে···অখণ্ডতাকে।

মানুষ প্রতিদিন মতে পলে তাকে করেছে খণ্ড-বিখণ্ড...কি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা যায় তার অর্ক করে?

চারিদিকে ছুটলো বিশ্বকর্মার চরেরা। কেউ আনলো স্বর্ণ-রসায়ন, কেউ আনলো লৌহ-শৃঙ্খল, কেউ নতুন করে আবিষ্কার করলো নব ধাতু। কিন্তু কিছুতেই গেল না বাঁধা। জগতের কঠিনতম ধাতু, সর্বোত্তম পদার্থ, বিশ্বকর্মার মস্তিষ্কের সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তি, সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

অবশেষে মানব এসে বল্লো, আমি পারি!

দেবতারা উঠলো হেসে।

মাটী আর খড় দিয়ে মানব গড়লো প্রতিমা। অন্তরের ভক্তি দিয়ে সেই মাটীকে করলো কাঞ্চনময়ী।

অলকানন্দা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

(১)

অলকানন্দা যখন মর্ত্যের জীব, সে যখন সীতাদেবীর মত হলকর্ষণের কর্ষিত মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে অথবা যাজ্ঞিকের দহ:পূত হব্য-পূষ্ট অগ্নিবহ্নির মধ্যভাগে সমুত্থিতা রূপযৌবনবতী দ্রৌপদীর মত অযোনিজা নহেন, তখন নিশ্চয়ই একদা তাহার মা ছিলেন। আবার এদিকে বিশ্বজগতের অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে তার পিতৃত্ব কোন একজন মানবের অবশ্যপ্রাপ্য, কাজেই বাপ মা তার নিশ্চয়ই ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কবে ছিলেন, কবেই বা গত হইলেন এসকল ব্যাপারের কিছুই অলকা জানে না। একান্ত শোচনীয় এবং অত্যন্ত শোচনীয় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলি তার নিতান্ত শৈশবেই ঘটিয়া থাকিবে, কেননা জ্ঞানের উদয় হওয়ার পর হ'তেই অলকানন্দা দেখিতেছে আপনার জন বলিতে তার এই দুইটীমাত্র লোককেই, তাঁরা তার দাদা এবং দাদি! মা বাবা বলিতে কি বুঝায় সে খবরটাই সে পায় নাই, অন্যের যখন মা বাবা আছে তারই বা নাই কেন, এসমস্ত কূট প্রশ্ন কোনদিনই সে করে নাই, মা বাবা থাকা যে সংসারে অনিবার্য্য, এমন সন্দেহও তার মনের মধ্যে ছিল না। সে জগত মনে করে, যাদের মা বাবা আছে তাদের তো সকলেরই 'দাদা দাদি' নাই, সব জিনিষই যে সকলের থাকিতেই হইবে, এমনই কিসের বিধান! নিজের অবস্থায় সে সুখীই ছিল, অভাব বা অভিযোগ কিছুমাত্রও তার মনের মধ্যে ছিল না।

হরদয়াল পাণ্ডে জৌনপুরের সরকারী স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন, একমাত্র সন্তান রামদয়ালকে আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনায় হারাইয়া শোকসন্তপ্তা পুত্রবধূ ও শিশু পৌত্রীটীকে বুকে লইয়া পণ্ডিত মহাশয় তাঁর প্রাচীন পন্থায় সংযম শিক্ষায় বলেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নী লক্ষ্মীরাণীকে তিনি বহুযুক্তিতর্ক শাস্ত্রবাক্য শুনাইয়াও কোনমতে তাঁর শোকশয্যা পরিত্যাগ করাইতে পারেন নাই। অনাহারে জলাহারে মৃত্যুপণে তিনি সেই যে বিছানা লইয়াছিলেন, সেখান হইতে কে তাঁহাকে ঠেলিয়া তুলিল? বলি ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস! অতপর শোকেও তাঁর শরীর পাত হইলনা, কিন্তু যে বিমূঢ়া তরুণী তার নীরব শোকাগ্নিতে ধীকি ধীকি জ্বলিতে জ্বলিতে সংসার ও সন্তানের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছিল, অকস্মাৎ সেই দহন মৃত্যু-ব্যাধির আক্রমণে শেষশয্যা। লক্ষ্মীরাণীর কোথায় পড়িয়া রহিল শোকশয্যা, কোথায় বা খসিয়া পড়িল অবিরল অশ্রুপ্লাবনে পরিষিক্ত অজস্র বিলাপ-গাথা। সুশীলা ছিল সার্থকনামী বধূ। এসব দিনে এজাতীয় মেয়ে হঠাৎ দেখা যায় না। যেমন তার

স্নিগ্ধ শান্ত স্বভাব আবার তেমনই অপর্য্যাপ্ত কর্ম্মশক্তি। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে দেব-দেবীর মত সেবা করিয়াছে, স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তাঁর বিয়োগব্যথায় সে নিজেকে ভাসিয়া পড়িতে দেয় নাই। বৃদ্ধকালে বার্দ্ধক্যের অবলম্বন পরলোকের সহায় একমাত্র সন্তানশোক যে স্বামীর পিতামাতার পক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতিকর হইল এই কথা ভাবিয়া সে নিজের সমস্ত ক্ষতিকেই প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ফেলিয়া তাঁদের ত্রুটীহীন সেবা শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু নিয়তির একটা নিজের তৈরি বিধান আছে, তিনি নেহাতই স্বেচ্ছাচারিণী! 'রাধ' প্রায় উল্টাই বুঝিয়া থাকেন। প্রয়োপবেশনে প্রাণ দিতে গিয়া রামদয়ালের প্রৌঢ়া মা লক্ষ্মীরাণী তাঁর পরমায়ু বাড়াইয়া দিলেন, আর শোক-সংযম করিয়া যথাকর্ত্তব্য পথে চলিতে চলিতে আয়ুক্ষয় করিল তাঁর যুবতী পত্নী সুশীলা দেবী।

লক্ষ্মী এবার কোমরে কাপড় আঁটিয়া মাথার আলুথালু চুলগুলা জড়াইয়া লইয়া অনশন-ক্ষীণ দুইটী হাতে দৃঢ় করিয়াই সংসারের সকল ভার তুলিয়া লইলেন। একান্ত স্নেহপাত্রী পুত্রবধূর শেষ সেবা তিনিই করিলেন; সুশীলা যখন মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া কাঁদিয়া বলিল, "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিলাম মাগো! আমায় মাপ করো।"

লক্ষ্মীরাণী পৌত্রী কোলে পাশে বসিয়া সস্নেহে তার হাতখানি ধরিয়া অশ্রুহীন নেত্রে স্পষ্টস্বরেই জবাব দিলেন, "ভগবান আমার পাপের যোগ্য শাস্তিবিধান করেছেন বৌমা! তুমি কি করবে?"

একটু থামিয়া বলিলেন, "নিজের দুঃখটাকেই পাহাড় করে তুলেছিলুম, মারে আমার! তোর কচি বুকখানার পানে তো চেয়েও দেখিনি তাই সেই মহাপাতকের ফলেই তিনি আমার মত পাষাণীর কাছ থেকে তোকে ছিনিয়ে নিচ্ছেন। এ হবেই!"

বধূর দুচোখ দিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িল, শাশুড়ীর অশ্রুটসে শুকাইয়া বাড়বাগ্নির তীব্র জ্বালা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।—বধূর মৃত্যুর পর লক্ষ্মীরাণী একটিবারও বিনাইয়া কাঁদিলেন, চোখ দুইটা তাঁর অবিরত অশ্রুপ্রপাতে জ্বলিয়া যাইতে থাকিল, একফোঁটা জল পড়িল না। পড়শিনীরা নানাকথাই বলাবলি করিল। অধিকাংশেই আত্ম-পরে একটা ভেদবুদ্ধির প্রশংসা করিতে সমর্থ হইল না।

পণ্ডিত রামদয়াল প্রথমে ছুটীর দরখাস্ত করিলেন, ছুটী ফুরাইলে পেন্‌শন্ লইয়া ঘরবাড়ী বেচিয়া চলিয়া আসিলেন হরিদ্বারে। হৃষিকেশের গঙ্গার ওপারে স্বর্গদ্বার "কলোনী"তে একটী কুটীর গড়াইয়া আবার নূতন করিয়া বেসংসার রচনা করিলেন, সেইখানেই অলকানন্দার জীবন-স্মৃতির প্রথমোন্মেষ; সে তখন চার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

(২)

নগাধিরাজ হিমালয়ের পটভূমিকায় প্রকৃতিদেবীর যে নবনবোন্মেষিনী রূপের সমাবেশ, জগতের রূপ-সাম্রাজ্যে বোধহয় এর কোথাও তুলনা হয় না। পরমকমনীয় রাজরাজেশ্বরীর বিমোহন তুলিকাপাতে

এখানে যে অপূর্ব্ব শিল্পসম্ভার সঞ্চিত রহিয়াছে বিমুগ্ধ দর্শক সেখানে পৌঁছিতে পারিলে তার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলীর অপরূপত্বে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়, পুলকে বিহ্বল হইয়া পড়ে। অনীল আকাশের গায়ে গায়ে মিশাইয়া স্নিগ্ধ সজীব মেঘ-ধূম্র পর্ব্বতের সীমাহীন পরিবেশ। স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় রুক্ষ শুষ্ক নগ্নতাকে আবৃত করিয়া তার অঙ্গে অঙ্গে বর্ণের পর বর্ণসমাবেশ প্রকৃতিরাণীর মোহন তুলিকার স্পর্শে সেখানে অপূর্ব্ব কলা-চাতুর্য্যের প্রদর্শনীশালায় অবাস্তিত রহিয়াছে। সেই আলোছায়ার মহীয়ান সমুজ্জ্বল শিল্প-মেলায় কল্পনা কুণ্ঠিতভাবে স্থান নাই, কষ্টপরিকল্পনা একান্ত অপ্রয়োজনীয়, এর অনবদ্যরূপ রূপ-শিল্পীর হাতের তুলিকায় আপনি আসিয়া ধরা দেয়, তার প্রাণে আনে অনুভূত উদ্দীপনা, এই দ্যোতনাই তাকে অসম্ভব জানিয়াও এই রূপের জগৎকে লোকলোচনে ধরিয়া দিবার দুরূহ প্রচেষ্টায় প্ররোচিত করিয়া আসিতেছে, আজও সেই অসাধ্য-সাধনের সাধনায় বিরাম নাই। আর সে বিরাম সে কোনদিনই পাইবে না, যেহেতু প্রকৃতিরাণী অফুরন্ত; তার প্রাণস্পন্দন অহরহই চলিতেছে মানুষের মনোরাজ্যে; তার সেই স্পন্দমান ক্রিয়াশক্তির বেগ অপ্রতিহত তাই প্রাকৃতিক শক্তির একান্ত বশীভূত মানবচিত্ত তার রূপরসগন্ধের সম্মোহনে চিরদিনই সমভাবে থাকিবে, এশক্তি তার পক্ষে অপরাজেয়। যদি কোনদিন মানুষের মধ্যে সমুদয় মানবত্ব অবলুপ্ত হইয়া গিয়া তাহাকে নররাক্ষসে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, তবেই এই হ্লাদিনী শক্তির মধ্য হইতে সে বিমুক্ত হইবে এবং সেই দিনই এই রূপ-রসে রসিক মানব-জগৎ রুদ্র মরুভূমে পরিণত হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আদিম যুগের মানব যদি প্রকৃতির বিশাল রূপসাগরে অবগাহন করিয়া থাকিবার সুযোগ না পাইত, মানব-সমাজ আজ যাহা তাহার চিহ্নমাত্র কোথাও মিলিত না।

নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতের সঙ্গে মানুষের মধ্যেও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। হরদয়াল ও লক্ষ্মীরাণীর অপার শোকসমুদ্রেরও বুঝি পার ছিল, বিশেষতঃ হিমাচলের এই প্রান্ত-প্রদেশে নিজেদের শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনের নিত্য প্রতীক্ষিত পরিশোধের দিন গণনার মধ্যেও যে স্নেহময়ী পার্ব্বতীর স্নিগ্ধ মধুর স্নেহস্পর্শ তাঁহারা লাভ করিতে পাইয়াছিলেন তাহাতেই সেই দুইটি সন্তপ্তচিত্ত নরনারীর জীবন-সায়াহ্নের দিনগুলি একান্ত সহনীয়ই শুধু নয় পরম রমণীয় ও কমনীয়ও হইয়া উঠিয়াছিল। আবহমান কাল ধরিয়া এখানে যে চতুর্থাশ্রমের চির-তপস্যা চলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহারই পুণ্য প্রভাব আজও এখানের বাতাস অভিভূত করিতে পারে নাই। কত মহামুনি, মহামহর্ষি কত রাজরাজেন্দ্র রাজর্ষি, কত উগ্রতপা সাধুসন্ত অটুট কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহী-যোগী এই হৈম-কান্তারে তাঁদের শেষ বেদধ্বনি, অশেষ ঔপনিষদিক মহাবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, সে সকল মহত্তম সাধনা কি কখনও ব্যর্থ হইতে পারে? আজও তপঃসিদ্ধ মহর্ষিপুরুষদিগের পদস্পর্শপূত ধূলিকণা এ প্রদেশকে পবিত্র করিয়া বর্ত্তমান আছে যে! জগতের সর্ব্বপ্রথম মানব-সাধনার মহাতীর্থ, এখানে যদি ত্রিতাপতপ্ত মানবচিত্ত শান্তি না পাইল তবে কোন্ স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাইবে?

ছোট্ট সুপরিচ্ছন্ন কুটীরগৃহে তিনদিকে পার্ব্বত্য প্রকৃতির বহুস্তরচিত অনির্ব্বচনীয় দৃশ্যপট, সম্মুখভাগে অলকানন্দা-মন্দাকিনীর সঙ্গমবিযুক্তা জননী জাহ্নবীর অলৌকিক রূপমূর্ত্তি। ইনিও হিমাচলকন্যা পিতৃগৃহে একান্তরূপেই আদরিনী লীলাদাস্যময়ী; এখানে শিশ্নাগ্রের সীমায় পদার্পিতা হইয়া ঈষৎ সমতা ও পরমুহূর্ত্তে

প্রবাসের অন্তঃপুরিনী হইতেই কিঞ্চিৎ ধীরতাবলম্বিনী, নববধূর অনভ্যস্ত সলজ্জ প্রচেষ্টার মধ্যে মধ্যে চিরাভ্যাস চপলতার সহসাবির্ভাব ইহার ভিতরেও বিলক্ষণ দেখা যায়, তথাপি ঐ চিরপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদাবলীর পদটিও স্মরণে আসে;

"কৈশোর যৌবন দুঁহু মিলি গেল,.....

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসী কয়েকটি পেনসনপ্রাপ্ত ভদ্রলোক কেহ দূর কেহ কুটীর রচনা করিয়া এই স্বর্গতুল্য স্থানে উপনিবেশিত হইয়াছিলেন, এঁদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া পঠন-পাঠন অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় ডুবিয়া থাকিয়া পুণ্যশ্লোকাহৃত পণ্ডিত দয়ালের দিনগুলা তাঁর আশার অতিরিক্ত রূপেই শান্তিতে কাটিয়া যাইতেছিল। দুই সন্ধ্যা গঙ্গাস্নান, ভজন সাধন শাস্ত্রালাপ এই সকল আত্মপ্রসাদ ও আনন্দোন্নতিকর পুণ্যকার্যের মধ্যে মধ্যেও তাঁর ইহলৌকিক কর্ত্তব্যের অবশিষ্টটুকুর সম্পাদনায় কোনই ত্রুটী ঘটে নাই। শিশু অলকার বর্ণপরিচয় তার পঞ্চমবর্ষে আরম্ভ ঠিকই হইয়াছিল এবং তারপর মাসবর্ষ যতই গত হইয়া চলিয়াছে আর নূতন নূতন শিক্ষার বিস্তৃতিলাভও ঠিক সেই অনুপাতে কোথায় আবদ্ধ থাকে নাই। মেধাবী ছাত্রী পণ্ডিত পিতামহের সমস্ত-প্রদত্ত জ্ঞানের মহুয়া আগ্রহ-আবেগে আয়ত্তাধীন করিতেছিল। চার বৎসরের অনকানন্দা চৌদ্দবৎসরে এই স্বর্গদ্বারের প্রান্ত-প্রবাহিনী বিদুষী ভাগীরথীর মতই পরিপূর্ণরূপ শোভায় অপূর্ব্বদর্শনা হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই শীতলতায় তরা সরল রসে টলমল। ইহার মতই সেই পূর্ব্ব উল্লিখিত বৈষ্ণব কবিদের বর্ণনার মত ইহার সম্বন্ধেও এখন অনায়াসেই বলা চলে

"বৈষব কৈশোর দুঁহু মিলি গেল,—

অলকা এখন শুধু পড়াশুনাতেই নয় গৃহকার্য্যেও লক্ষ্মীরাণীর যথেষ্ট সহায়তা করে, কতটুকুইবা সংসার এঁদের গৃহকার্য্যই বা কতই তারী। তবু ঘর-সংসার পাতিয়া বসিলে সকল বিষয়েই ঘটা না থাক, ন্যাঠাতো কতকটা আছে; বিশেষ যাঁরা প্রাচীনপন্থীর আচার-আচরণ করিয়া থাকেন তাঁদের পক্ষে। লক্ষ্মীরাণী তার অনিরুদ্ধ শোকের তীব্র দহনকে শুধু এই কাজকর্ম্মের মধ্য দিয়াই তো সহিয়া যাইতেছেন, কাজ তিনি সহজে হাতছাড়া করিতে রাজী নন, তা সত্ত্বেও মেয়ের ভবিষ্যত ভাবিয়া ইদানিং তাকে শিক্ষানবিশী করিবার একটা অধিকার দিতেই হইয়াছে। হিন্দুঘরের মেয়েকে যে পরের ঘর করিতেই হইবে, সেখানেতো তার জন্য এই সর্ব্বহারার সমস্ত বুভুক্ষা লইয়া কোন মাতৃচিত্ত জাগিয়া থাকিবে না। তখন তার এই স্নেহ-দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াই পিতৃমাতৃহীনার জীবনে অশান্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে। অলকা পিতামহীর কাছে ভাল করিয়াই সংসারের কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিল, শুধু শিখিলনা সে স্বার্থান্ধকারে পরিপূর্ণ সাংসারিকতার কুটীল ও জটীল কূটনীতি। কূটনৈতিক চাণক্যের মতে এই শিক্ষাটিরও সবিশেষরূপেই প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিশেষ শিক্ষাটীর অভাবেই নাকি বড় বড় রাজচক্রবর্ত্তী সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, বন্ধীত্ব এমনকি মস্তকচ্যুতিও ঘটাইয়াছেন। অনেকে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়াছে, সতী অসতীত্বের মিথ্যা কালিমায় মসিমণ্ডিতা হইয়া অশেষ দুর্দ্দশা লাভ করিয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়, অলকানন্দা যে পরিবেশের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছিল সেখানে ধর্ম্মনীতিটাই ঈষৎ প্রবল, রাষ্ট্রনীতি যার বাহন ঐ কূটনীতি এখানে তার প্রভাব প্রতিপত্তি নিতান্তই অল্প, বৃদ্ধ কৃষ্ণা

বিশেষ করিয়া বিপত্নিক বৃদ্ধেরাই এখানের সমাজে সংখ্যাগুরু এবং তাঁহারাই শৈশবাবধি পিতামহ প্রদাদাং অলকানন্দার "রাজাদাদুন্" "নকুন দাদুন্" "কাশীর দাদুন্" "সোনাদাদুন্" "দুষ্টু দাদুন্" "লক্ষ্মীদাদুনের" দল। ছোট্ট অলকার চারিপাশে হিমাচলের সুদৃঢ় আবেষ্টনের মধ্যে কল-কল্লোলা অলকানন্দার আনন্দোজ্জ্বল উদ্দাম প্রবাহ। শুধু সোনাদিদি ও রাজাদিদি এই দুইজনই যা তার পার্শ্বচারিণী দুঃখগাথার সহানুভূতিসম্পন্না সখী বা বান্ধবী। তাঁদের কাছে নৈতিক বা অনৈতিক কোন শিক্ষাই সে শিখিবার সুযোগ পায় নাই। দুজনেই সংসারচক্রের ঘূর্ণায়মান নেমির তলায় নিষ্পিষ্ট নিরাসক্ত রিক্ত হৃদয় লইয়াই এই তাপিতের স্বর্গরাজ্যের দ্বার-সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছেন, সঙ্গে না ছিল পুত্রবধূ দেবর জায়া বা শ্বশ্রূমাতা, কাজেই কৌটিল্যের মূলনীতির সু-প্রয়োগের স্থানই ছিল না। এই সব কারণেই চতুর্দ্দশী অলকানন্দার কার্য্য-কলাপদর্শনে সুপণ্ডিতা বৈদেশিক ও প্রাদেশিক সাহিত্যে সুপরিচিতা, সঙ্গীতকলায় শিল্পকলায় সুশিক্ষিতা গার্হস্থ্যনীতিতেও অপরিচিতা হইয়াও সাংসারিক ব্যবহারিক জ্ঞানে একান্তরূপেই অনভিজ্ঞা রহিয়া গেল। বন্ধ ঘরই ক্ষুদ্র হোকনা কেন, কলির বাহন শনিগ্রহের প্রবেশপথের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট।

বসন্ত তপোবনের দ্বারে দেখা দিয়াছে। রূপে রসে গন্ধে এবং পক্ষীকুলের কূজন কলকাকলীতে সারা প্রদেশ বেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। শীতের কুহেলিকা অদূরের পর্ব্বতশ্রেণীকে ছাড়িয়া ক্রমশই সুদূরে প্রসারিত হইতেছিল। যেদিকেই নেত্রপাত করা যায় প্রকৃতির নব নব রূপ যেন রূপের পসরা উজাড় করিবার জন্যই প্রতীক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

গঙ্গার ধারে ছোট্ট বাগানটীর গোলাপলতার ঘেরা অজস্র পুষ্প-সম্ভারে সুসজ্জিত বেষ্টনীর মধ্যে নানা জাতীয় পাহাড়ী গোলাপ স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কি তাদের বর্ণসুষমা, কিই বা মস্তিষ্কবিভ্রমকারী গন্ধ। এসব ঘেসে ফুল যখন ফোটে তখন তারা এতটুকুও কার্পণ্য রাখেনা, দেয়তো সর্ব্বস্বই বিলাইয়া দেয়। অপরূপ! এই রূপকথার স্বপ্নরাজ্যের সকলই যেন অপরূপ। বেতেবোনা ফটকটির দুপাশ দিয়া দুইটি ওই রকমই পুষ্পবিভূষিত মল্লিকা লতা উর্দ্ধে উঠিয়া পরস্পরের মধ্যে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। এই ফটকের বাহিরের দুধারে দুইটী অদ্ভুত গোলাপী ফুলের বড় বড় স্তবকে আলোর ঝাড়ের মত জ্বালাইয়া দাঁড়াইয়া আছে বাসফুলের গাছ।

অলকানন্দা তার ঠাকুরদাদার সামনে বসিয়া পাঠ করিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি গাথা সুদূর অতীতের এক ঘৃণ্যা নারী কোন্ শুভক্ষণে এক দিব্য দেবতার পরম স্পর্শে সহসা তার হারানো নারীত্ব ফিরিয়া পাইয়া ধন্যা হইয়াছিল, তাহারই মর্ম্মভাবনার উপলব্ধিতে তন্ময় হইয়াছিল। তার মনের মধ্যে আহত নারীত্বের তীব্র অভিব্যক্তি ধ্বনিয়া উঠিল,

"না হয় দেবতা আমাতে নাই।

মাটী দিয়ে গড়েতো প্রতিমা সাধকেরা পূজা করেতো তাই?"

সহসা কাণে ভাসিয়া আসিল,—

"উঃ কী ভীষণ মেঘ উঠেছে, ঝড় এলো বলে, মুস্কিল! কোথায় চটি, কোথায় কি কিছুতো জানা যাচ্ছে না, করা যায় কি!"

অলকানন্দার চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সট-সার্ট-পরা একটি ভ্রাম্যমানের দল। দলে জন চারেক লোকের বেশী নাই, এদের মধ্যে কেহই কাহারও অসমবয়সী নয়, সকলেরই স্কন্ধে কোলান চামড়ার ব্যাগ, হাতে কিরিচ-আঁটা পাহাড়ী লাঠি।—এমন মধ্যে মধ্যে এ প্রদেশে দেখা যায়। এরা সকলেই কম-বয়সের বাঙালী ঘরের ছেলে বলিয়াই মনে হয়, অন্ততঃ যে ওই স্বগতোক্তি করিয়াছিল, সেতো বটেই, ভাষা ও উচ্চারণভঙ্গী বিশুদ্ধ বাংলা ও বাঙালীর।

ছেলেদের মধ্যে একজন তাহাকে দেখিতে পাইল, কাছে আসিয়া বিনীত স্বরে কহিল, "দোষ নেবেন না, আমরা কেদার-বদ্রীনাথের যাত্রী, এখানে এসেই এই মেঘান্ধকার, এখন যাই কোনদিকে বলতে পারেন?"

কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অতর্কিত বেগে যেমন পাহাড়ী ঝড় আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে, তাই করিল; বৃষ্টিকেও সে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। বেশ ভুমুল বেগেই আক্রমনটা হইয়াছিল, ঘড় কুটা ধূলা বালি উড়াইয়া চোক প্রায় অন্ধ করিয়া ফেলিবার উপক্রম, ভিজিতেও বাকী থাকিলনা।

ঝড়ের গতির উল্টামুখে চট করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বস্ত্র সম্বরণ করিতে করিতে অলকা স্বরিৎ কণ্ঠে আহ্বান করিল, "আপাতত আমাদের বাড়ীতে চলুন, দাদু সব বলে দেবেন পরে।"

সেরাত্রে ক্ষিতিপতি, নিবারণ, চন্দ্রনাথ ও বিশ্বরঞ্জন চারবন্ধুতেই হরদয়ালের সাদর নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত হইয়া গরম গরম ডাল ভাত শাকের ভাজি আলুর দম ও ঘরের গরুর অনুত্তোপম গরম গরম দুধ বাতাসা সহযোগে আহারান্তে সুনিদ্রায় কাটাইয়া দিল। পরদিন সন্ধ্যা বেলা গরম দুধ খাইয়া আতিথ্যকারী পণ্ডিতের পদধূলির বিনিময়ে স্নেহ আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে অভীষ্ট পথে শুভযাত্রা করিল। হরদয়াল তাদের ফিরতিমুখে তাঁর গৃহে আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ সনির্ব্বন্ধে জানাইলেন, তারাও সানন্দে প্রতিশ্রুতি দিয়া গেল। যাত্রাকালে এবং পথেপথেও ক্ষিতিপতির বারে বারে বহুপূর্ব্বে পঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার মুখ নিঃসৃত একটি বিশেষ ছত্র মনে পড়িতে লাগিল, "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ! পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ!"

আহা সে যদি নবকুমারের মত একাই পথটী হারাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথহারা সে একাই ছিলনা। ছিল তার আরও তিনটি সাথী এবং পণ্ডিত হরদয়াল মোটেই সেই দুর্দ্ধান্ত কাপালিক প্রকৃতির নয়, নিতান্তই সজ্জন ব্যক্তি।

কেদার-বদ্রীর যাত্রীদল তাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে একমাস পরে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু যে শান্তিপূর্ণ নীড় তাহারা ছাড়িয়া গিয়াছিল, ঠিক সেখানে আর তাহারা ফিরিতে পারিল না। এই স্বল্প-কালের ব্যবধানে কি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনই না এখানে ঘটিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীরূপিণী লক্ষ্মীরাণী আর বাঁচিয়া নাই, পুত্র ও পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে তিনি সকল শোকসন্তাপ পরিহার করিয়া ইতিমধ্যেই মহাযাত্রায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

(৪)

গৃহিণীহীন গৃহ, শাস্ত্রকারেরা যাকে লক্ষ্য করে বলে গেছেন, "নিশায়ণ্যং তথা গৃহম্" সেই শোক সন্তাপিত বিষণ্ণ গৃহে একান্ত অনভ্যস্ত হস্তের আতিথ্য উপভোগ করা লোভনীয় হইলেও শোভনীয় নয়, অতিথি চতুষ্টয় দিনদুই মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিনের প্রত্যূষে হরিদ্বার অভিমুখে প্রস্থিত হইল। হরদয়াল অবশ্য তাদের সুস্থির সম্ভাষণে আদর করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন আরও কয়েকটা দিন থাকিয়া পথশ্রান্তি দূর করিয়া যাইবার জন্য সাগ্রহ আমন্ত্রণও তারা তাঁর কাছে পাইয়াছিল, কিন্তু অলকানন্দার প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করা হয় ভাবিয়াই তারা এই একান্ত ঈপ্সিত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইল। দু একজনের অবশ্য সন্দা করিয়াই ঘরে ফিরিবার তাগিদ ছিল।

অলকা এই মহাক্ষতিতে ভাবিয়া পড়িয়াছিল, গিরি-সঙ্কটে সংবর্দ্ধা পার্ব্বত্যনদী অলকানন্দার মতই সুচঞ্চলা কিশোরী কন্যা এই আকস্মিক প্রচণ্ড শোকাভিঘাতে দেহে মনে একসঙ্গেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তার চকিতহরিণী চঞ্চল নেত্র দুটি বাসন্তী উপবনের সুকৃষ্ণ ভ্রমরের মত স্বাভাবিক চাঞ্চল্যভরে মুহুগুঞ্জনে ইতঃস্তত ঘুরিয়া ফিরেনা, স্নিগ্ধশ্যাম সজলজলদের মতই বর্ষনতাদারুণতায় স্তম্ভিত হইয়া স্থির থাকে। বৃদ্ধ পিতামহের মুখ চাহিয়া সে বালিকা তারই প্রদত্ত উচ্চশিক্ষায় বলে আত্মসংযত করিয়া প্রাণপণে তাঁর শুশ্রূষায় আত্মনিয়োজিত রাখে, চিত্তকে পরিহার করিতে না পারিলেও বিলাপ সে করে না। সংসারের কর্ম্মচক্রে সর্ব্বদা নিজেকে ব্যাপৃত রাখে এবং অবিরল অশ্রুবর্ষণে অন্তরের দাবদাহকে কথঞ্চিৎ জুড়াইয়া লয়। সে অত্যন্ত তীব্রস্বভাবা একান্ত সুকোমলা কানন-ব্রততীর মতই পাদপছায়ায় বর্দ্ধিতা। বহির্জগতের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় তার আজ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। জ্ঞান হইতেই নিয়ত শুনিতেছে "দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" দুঃখে-অনুদ্বিগ্নমনা না হইতে পারিলেও সেটা নিজেরই অক্ষমতাবোধে আত্মপীড়নে সংশোধন করিতে চায়। তবু সারাদিবসান্তে তুলসীমূলে যখন মাটির প্রদীপখানি জ্বালিয়া পট্টবসনের অঞ্চলপ্রান্তটি গলায় জড়াইয়া প্রণিত হয়, কিছুতেই যেন আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সেখানের সেই ঠাকুমার ললাটসংস্পর্শে-পূত মৃত্তিকার দেহস্পর্শকে দেহমনীর মঙ্গল স্পর্শ অনুভব করিয়া বাঁধনহারা হইয়া লুটাইয়া পড়ে, দেখিবার সান্ত্বনা দিবার কেহই নাই, যতক্ষণ না ক্লান্তি আসে ফুলিয়া ফুলিয়া যতটা পারে কাঁদিয়া লয়।

একটী মাস না যাইতে সেই যাত্রীদলের মধ্যের অন্যতম, যার নাম ক্ষিতিপতি সেই ছেলেটী ফিরিয়া আসিল। সজল চোকে কাজল পরিয়া প্রকৃতিরাণী তিজাচুলের রাশি এলো করিয়া দিয়াছেন। পাহাড়ের গায়ে পেজা তুলার মত মেঘের পুঞ্জ সবেগে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। বর্ষার গঙ্গার জল বাড়িয়া প্রায় অলকানন্দাদের কুটীর প্রান্তে বেড়াদেয়া কটকের সামনাসামনি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। অযত্নে এই বর্ষায় তাদের সাজানো বাগান প্রায় জঙ্গলে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ক্ষিতিপতি খোলা দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হরদয়াল প্রশ্ন করিলেন, "কে ?"

উত্তর আসিল, "আমি ক্ষিতিপতি।"

"ওঃ তুমি, বেশ, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন দাদু! ভিতরে চলে এসো।"

ক্ষিতিপতি রহিয়া গেল, বিদায় লইবার সে নাম করে না, বাগান সে খুরপী কোদাল ধরিয়া সাফ করিল, তাহা বেড়া নিজের হাতে মেরামত করিল, আরও কত কি খুঁটীনাটী কাজ। পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে সে নাকি পড়িতে আসিয়াছিল, দর্শন শাস্ত্র। অলকানন্দা এইসকল উদ্ভট বৃত্তি হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেই সে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিত, পৌরাণিক আকাশীয় উদ্যানকের। হাসিয়া বলিত, "ওরুগৃহে বাস করছি ভুলে যাচ্ছো কেন? তবু তো নন্দাদেবীর প্রসাদ ভোজন চলছে পরিতোষরূপে, অর্কপত্র ভোজন করে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের শরণাগত হতে হয়নি।"

মাস কয়েক পরে একদা হরদয়ালকে সে তার মনের কথা জানাইল। যদিও তার মনের সেই গোপন কামনা এই অল্পভিজ্ঞ বৃদ্ধ সংসারীর নিকট প্রথম দিন হইতেই গোপন ছিল না এবং উত্তরও তার স্থির করাই ছিল, তথাপি ঈষৎ সংশয়াচ্ছন্নতার সহিত মৃদু একটুখানি প্রতিবাদ তুলিলেন, "তুমিতো ওকে দেখছো, ও আমার সংসারাতীত, তোমাদের সংসারে সমাজে ও'কি মানিয়ে চলতে পার্বে। ও'রে কোনদিনই ওর এই গণ্ডীর বাইরে পা দেয়নি।"

ক্ষিতিপতি মুখ নত করিয়া বসিয়াছিল, মুখ সে তুলিল না, ঈষৎ চাপা হাসি তার ওষ্ঠাধরে চকিত হইয়া উঠিল, কণ্ঠে সে-কম্পনাভাস সে ফুটিতে দিল না, সহজ প্রশান্তস্বরে ধীর কণ্ঠে সে উত্তর দিল, "আপনার পৌত্রীকে প্রথম দেখেই আমার মনে পড়েছিল কপালকুণ্ডলার কথা, আর সেই জন্যেই আমি ওকে একান্তভাবে কামনা করে এসেছি।"

হরদয়াল এই কথায় সহসা সর্ব্বশরীরে শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁর মুখ দিয়া তাঁর অজ্ঞাতে "শিব শিব শিব" ধ্বনি অচমকা নির্গত হইয়া আসিল; অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া সে ভাবটাকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া কথা কহিলেন।

"সেই কথাই তো আমিও তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলাম, সে বিয়ের ফলতো তুমি জানোই।"

ঘরের বাহিরে একটা পলাশ গাছের মধ্য হইতে একটানা সুরে একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল, বাদলা হাওয়া আস্তে আস্তে জলধোয়া গোলাপ-গন্ধ অতি স্নিগ্ধভাবে বহন করিয়া আনিতেছিল, অলকানন্দা ঘরে ঢুকিল, ঘরে তৈরী দুটী ক্ষীরের পেঁড়া এবং এক গ্লাস ঠাণ্ডাজল হাতে করিয়া তোক্তার উদ্দেশে হেঁট হইয়া তোক্য ধরিয়া দিয়া ক্ষণমাত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপর যেমন আসিয়াছিল নিঃশব্দে ফিরিয়া চলিয়া গেল। সেই এতটুকুক্ষণের মধ্যেই ক্ষিতিপতি তার দুটী ঔৎসুক্যমণ্ডিত স্নেহস্মিত নেত্রতারকা তার আনম্র মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়াছিল, সে চলিয়া গেলেও কয়েক মুহূর্ত্তই সে তার ক্রমশঃ অপসরমান মূর্ত্তিটির পানে সেই দৃষ্টি লইয়াই নির্ব্বাক চাহিয়া রহিল, তারপর যেন মনের মধ্যে একটা নূতন উদ্যম ও আখাস লাভ করিয়া সে হরদয়ালের প্রতীক্ষিত মুখের দিকে সহজ প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া একান্ত দৃঢ়তার সহিত তার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর দিল,—

"সেটা যে কত ব্যর্থ হয়েছিল এক্ষেত্রে তার কোন সম্ভাবনাই তো নেই, দাদু! আপনিও নন সেই দুর্ধর্ষ কাপালিক আর আমার পশ্চাতেও শনিগ্রহের মত পরাবর্তী বা দুঃদুরিসা ঘুরছেন না। অতএব—"

অগ্রহায়ণ মাসের একটি শুভ তিথিতে ময়মনসিং জেলা নিবাসী সম্ভ্রান্ত ধনী জমিদার ক্ষিতিপতির সহিত হিমাচলপ্রান্ত প্রবাসী হরদয়াল-পৌত্রী কুমারী অলকানন্দার শুভ বিবাহ যথাপাত্র সম্পন্ন হইয়া গেল। এতদুপলক্ষে, বিবাহের বরযাত্রী মাত্র সেই পূর্ব্ব পরিচিত স-তীর্থ ও তীর্থসহচর বন্ধুত্রয় মাত্রই পাত্রীগৃহে অভ্যাগমন করিয়াছিল।

অলকানন্দা দাদুকে ছাড়িয়া বিবাহ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক থাকিলেও তাঁহারই তীব্র যুক্তিবলে পরিশেষে রাজী মানিল।

"যদি আমি তোমার ঠাকুর মত হঠাৎ একদিন মরে যাই, তোমার কি দশা হবে বুকে দেখ! এখন ঘরে বরে যে তোমায় বে দিতে পার্ব্বো এ আমার যে স্বপ্নেরও অতীত। বাধা দিওনা দিদিমণি।"

অলকানন্দা আজন্মই পর-নির্ভরশীলা, নিজের ইচ্ছায় একটুকু সহায়তা সে কোনদিনই গ্রহণ করিতে সুযোগ পায় নাই অথবা স্বভাবতই আত্মপ্রত্যয় বস্তুটা তার মধ্যে ছিলই না।

(৫)

স্বামীগৃহে আসিয়া পর্ব্বতারণ্যনিবাসিনী পার্ব্বতীর হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। পথেপথে তাহাকে তার চির অপরিচিত অনেক কিছু অদ্ভুতদর্শন দৃশ্যপটেরই সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, রেলগাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট, বড় বড় ষ্টেশন, অসংখ্য জনতা, বহুবেশধারী নরনারী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সহরের অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যমাত্র দেখিতে দেখিতে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তার শোকব্যথিত বিরহাকুল ব্যাকুলচিত্ত অন্তরেরও অন্তরে যেন আকুল হইয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, একখানি শান্তিপূর্ণ বিজন গৃহ। যেখানের শুষ্ক নির্জ্জনতার মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে গভীর ভারাক্রান্ত চিত্তকে বিমুক্ত করিয়া দিয়া একটুখানি চোকের জল ফেলিয়া হালকা হতে পারে। —কিন্তু হায়, কোথায় সে গৃহ! এই বিশাল অট্টালিকার অসংখ্য সুসজ্জিত কক্ষে কক্ষে সহস্র বিলাসিতার উপকরণের মধ্যে মধ্যে শত-চক্ষুর সমালোচনাপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্রষ্টব্য এবং তীব্র রসনার মন্তব্য শুনিতে শুনিতে তার সমস্ত চিত্তপ্রাণ যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল। এইখানের এই সমস্ত চির-অপরিচিত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই তার সমস্ত জীবনটাকেই কাটাইতে হইবে। উঃ, সে কি পারিবে? সে কি এ'জীবন সহ্য করিতে পারিবে? ভগবান! এ' তার কি করিলে? কেন এমন করিলে হে নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা!

চোকের জল সে ফেলিবে কি, ভয়ে মুক্তিপ্রয়াসী অশ্রুউৎস সে হিমশিলায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া তার তীব্র অসহায় বক্ষকে কঠিন বলে চাপিয়া ধরিল। অন্তরেরও অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া শুধু অনিরুদ্ধ হাহাকারে ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল;—

"বাছা! বাছা! বাছাগো! আমি কি আর তোমার কাছে যাবোনা! আমায় তুমি এ কোথায় পাঠালে?"

কপালকুণ্ডলায় ছিল শ্যামাসুন্দরী, সে তাকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া মৃন্ময়ীতে পরিণত করিবার পণ করিয়াছিল, ভোরণদ্বার বলিয়াছিল, "সোণার পুতলী ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে, দেখি ভাল লাগে কি, না লাগে।"

কিন্তু অলকানন্দা শ্যামার পরিবর্ত্তে যাঁহাকে লাভ করিল, তিনি ক্ষিতিপতির অগ্রজা কাশীশ্বরী দেবী। তিনি বিধবা একান্ত সুচীবায়ুগ্রস্তা এবং অতিশয় রাশভারী চারচৌকস গৃহিণী। মা-মরা ভাইকে তিনিই শৈশবাবস্থা হইতে পালন করিয়াছেন এই অধিকারের বলে তিনিই এতদিন ছিলেন তার জীবনের নিয়ন্ত্রী, এসংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, সর্ব্বেশ্বরী। বিবাহের বয়স হইলে তিনি ভ্রাতৃবধূর অভাবে একটুও কাতর হন নাই বরং ঘটক ঘটকীদের বরাবরই বিতাড়িত করিতে করিতে তাদের বাড়ী ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছেন, পুনঃপুনঃ যুক্তি দেখাইয়াছেন, "ক্ষিতির এখনও বিয়ের বয়স হয় নাই। সে যখন হইবে তিনি নিজে ওদের খবর দিবেন।"

সেই ক্ষিতি কিনা এই কীর্ত্তি করিল! তাঁকে ঘুণাক্ষরেও না জানাইয়া! এর পূর্ব্বে তাঁর—কি আর বলিবেন, এমন কি অমন অকৃতজ্ঞ ভাইয়ের অথবা তাহার মৃত্যু হইলনা কি জন্য!

অলকানন্দা সসর্প গৃহে বাস করিতে লাগিল।

যৌতাতের আয়োজন, কুলপধ্যায় ঘটা অসামান্য রূপেই সম্পন্ন হইয়া গেল, কাশীশ্বরীর অবশ্য এসব "কেলেঙ্কারী" করার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, সে ব্যবস্থাও তিনি করেন নাই, নায়েবমশাইকে নিষেধও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবনে এই প্রথম বারের জন্য তাঁর অলঙ্ঘনীয় আদেশ এ বাড়ীতে প্রত্যাখ্যাত হইল। নায়েব গলা খাটো করিয়া কুটিল হাস্যাভাসকে অধরের পরিবর্ত্তে নেত্রকোণায় সংবদ্ধ রাখিয়া জানাইয়া দিল, "সেদিন আর নেই দিদি! আপনি আমি এখন ডোন্টকেয়ার! কড়া হুকুম, এসব হ'তেই হবে। অর্ডার সমস্তই চারিদিকে চলে গেছে, মায় নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা পর্য্যন্ত।"

"জ্বলা!"—বলিয়া কাশীশ্বরী এমন একটা ভঙ্গি করিলেন যে গোপনে চাপা দুষ্ট হাসির বেগ সামলাইতে অন্তরালকে কাশির ধমকে সারা হইতে হইল। অপ্রতিহত-প্রভাব দুর্দ্ধান্ত-স্বভাবা কালী বামনীর তেজ যে এইবার খর্ব্ব হইতে চলিল, ইহাতে এ বাড়ীর, এমন কি তাঁর নিজের ছেলে পর্য্যন্ত মনেমনে দুঃখিত না হইয়া তৃপ্তিই বোধ করিতেছিল। এই দুর্দ্ধান্ত ডিক্টেটর যাঁকে তারা আড়ালে সকলেই বিদ্রূপ করিয়া "হার হাইনেস্, লেডি হিটলার" বলিতেও ছাড়ে না, তাঁর 'রিজেনসি' আর কতকালই চলিবে, ভাবিয়া অস্থির হয়, ঘরে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রবেশ দেখিয়া তারা মনের মধ্যে আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। আবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বিরোধী ক্ষিতিপতির এইরূপ বিদ্রোহাচরণ—নিশ্চয়ই ভগবান জীবন্ত আছেন।

(৬)

হাউইকে শূন্যে অনেক উর্ধ্বে ছুঁড়িয়া দিতে পারা যায়, কিন্তু সেখানে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। হাওয়া-জাহাজ অবশ্য মহাশূন্যে বিচরণে সমর্থ কিন্তু তার জন্য বিচক্ষণ পরিচালকের প্রয়োজন। অলকানন্দাকে রাণীর গদীতে ক্ষিতিপতি জোর করিয়া বসাইয়া দিল, কিন্তু সেতো সেই সঙ্গে নিজেকে তার সমস্তক্ষণের বডিগার্ড নিযুক্ত করিতে পারিল না, কাজেই ফুটা কলসীতে মধুঢালার মতই তার সমস্ত অবদানই ঝরিয়া পড়িয়া গেল, যাকে দিল তার কোনই কাজে লাগিল না। ঘরে যেসব মাতৃ-পরিত্যক্ত বসনভূষণ আজও বাকি পড়িয়া আছে, সে-সবের এক তোলাও তার পুত্রবধূর অঙ্গে উঠিল না। কোথাকার কোন অজানা ঘরের উটকো মেয়ে কাশীশ্বরীর মাতৃঅলঙ্কৃত বস্ত্র অঙ্গে ঠেকাইবে এ অনাচার তিনি ঘটিতে দিবেন না, একথা নিজের মুখেই তিনি জানাইয়া দিলেন। শুনিয়া ক্ষিতিপতি তাহাতে কোন কথা না বলিয়া বিস্তর অর্থব্যয় ঘটাইয়া দুইপ্রস্থ নব্যরুচির অলঙ্কার কলিকাতা হইতে বহু যত্নসহকারে আনাইয়া দিল। যেদিন সে সব জিনিষ আসিল, স্ত্রীকে ঘরে ডাকাইয়া তাহার সুটকেস সামনে খুলিয়া দিয়া বলিল, "পর।"

সবিস্ময়ে অলকা সেই অত্যুজ্জ্বল মণিরত্ন-বিখচিত অজ্ঞাত-দর্শন বস্তুজাত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল, দুচোখে বিস্ময় লইয়া মুখ তুলিল, প্রশ্ন করিল, "এই সমস্ত!"

ক্ষিতিপতি সুস্পষ্টস্বরে কহিল, "হ্যাঁ।"

অলকা সমধিক বিস্মিত হইয়া খানিকটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মৃদুস্বরে যেন কতকটা আত্মগত হইয়া কহিল, "এসব কি পরা যায়!"

ক্ষিতিপতির কণ্ঠ এবার ঈষৎ রুক্ষ হইয়া উঠিল, কথার উপর বেশ একটু জোর দিয়াই সে বলিল, "যায়, নিশ্চয়ই যায়, না হলে এসব করেছে কি জন্যে? নিশ্চয়ই ওগুলো নিয়ে গাদুয়া খেলবার জন্যে নয়।"

এমন উগ্রভাবে ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও তাহাকে এতাধায় কথা কহিয়া অবমাননা করে নাই, কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি উঠিতে বসিতে ইহার জ্যেঠা তাহার পরে যে ভাব ও ভাষা নিত্য প্রয়োগ করিতেছেন তার কাছে আর কতটুকু! চমকিয়া উঠিয়া অলকানন্দা অলঙ্কার পেটিকা টানিয়া লইল। কিন্তু সে বড় বিপদে পড়িয়াছে। হাতেরগুলা সোণায় হীরায় চুনী মুক্তায় এক গাদা হইলেও সেগুলা সে আবাহ গলাইয়া লইয়াছে, গলাতেও যথাশক্তি কিন্তু আরও যেসব আছে, যথা বড় বড় ব্রোচ, পেনডেন্ট, কানের নানা ডিজাইনের ইয়ারিং পাশা দুল বুলকা, আরও কি কি এসব কানের দুটি বিঁধে কেমন করিয়া পরিবে? অবাক হইয়া সে ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘণ্টাখানেক পরে উত্তাক্ত মনকে শান্ত করিয়া লইয়া মৃদু গুঞ্জনে একটা প্রেমের গানের একটা কলি গাহিতে গাহিতে ঘরে ঢুকিয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে সে একবারে চমকাইয়া গেল। হাসিবে না কাঁদিবে? অলঙ্কারের ক্যাটালগের মত সুন্দরী নন্দা বৎসরোনাতি কুৎসিত মূর্ত্তিতে স্তব্ধ হইয়া ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে।

কটিতে পরিধান করার মেখলাখানা সে গলায় ঝুলাইয়া দিয়াছে, তাহাতে তাহা আজানুলম্বিত হইয়া রহিয়াছে, সিঁথায় দিবার জন্যেও সিঁথি পাটিরও ঐ এক অবস্থা, বাকি বক্ষের কিঙ্কিণীগুলি সামনে করিয়া অজস্র পুষ্প-স্তবকের তারে ছিঁড়িয়া পড়া লতার মত সে সাতঙ্ক বিবর্ণ মুখে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সহসা ক্ষিতিপতির সমুদয় মনটা অনুতাপে মোচড়াইয়া উঠিল। ছিছি, এ'কি সে করিয়াছে! এই আশ্রম-পালিতা প্রকৃতি-দুহিতাকে তার বিশ্বপ্রকৃতির উন্মুক্ত বক্ষের মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়া তাকে এমন করিয়া অপমান সে করিতে পারিল কেমন করিয়া?

যে তপোবনে তপোধন-বালিকারা আলবালে জলসেচন করিত, হরিণশাবক এবং লতাতরুদিগের সহিত অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্য সূত্রে যাহারা তাদের জীবনের মিলন সূত্র গ্রথিত করিয়াছিল, যাদের হস্ত হইতে বিশ্বস্তচিত্ত হরিণ-শিশুরা নির্ভয়তার সহিত নীবারকণিকা খুঁটিয়া খাইত, যাদের কণ্ঠগীতি কলকণ্ঠ পক্ষীযূথনের সমতালে সঙ্গত করিত, এই আশ্রমপালিতা কিশোরীও যে তাদেরই অন্যতমা। বনমল্লিকার কণ্ঠভূষা ও গোলাপফলের বলয়িত বাহু সেদিনও যে কাশপুষ্পের চামর আন্দোলিত করিয়া তাহার আহার্য্য হইতে মক্ষিকা বিতাড়ন করিয়াছে। সেকি সেসব দৃশ্য এরই মধ্যে ভুলিয়া গেল? উন্মুক্ত প্রকৃতির স্নেহ-দুলালীকে কঠোর কারায় বাঁধিয়া রাখিয়া সে তার প্রতি কি এই রকমই নির্য্যাতন করিবে? কি প্রতিজ্ঞা করিয়া সে কমনীয় সমৃদ্ধ 'দাদুর' বক্ষ হইতে ইহাকে ছিঁড়িয়া আনিয়াছিল? সেকি এই জন্য?

ক্ষিতিপতি কোমলতায় কণ্ঠ ভরাইয়া ডাকিল, "নন্দা!"

অলকানন্দা চমকিয়া উঠিয়া ভয়ার্ত্ত চক্ষে চাহিল. "আমি, আমি সবতো পরেছি, কিন্তু উঃ, এসবত কি আমার এমনি করে দিনরাত পরে থাকতে হবে?" তার জিজ্ঞাসার প্রতি বর্ণে বর্ণে নিদারুণ আতঙ্ক প্রকটিত হইয়া পড়িল, কাছে সরিয়া আসিয়া ক্ষিতিপতি তার গলা হইতে পঁচিশ ভরির মেখলাখানা সর্ব্বপ্রথম খুলিয়া লইয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল, তারপর হাতের গহনাগুলা একে একে খুলিতে খুলিতে সন্তপ্ত সলজ্জ কণ্ঠে মিনতি ভরিয়া কহিল, "আমি একটা গাড়োল! আমায় ক্ষমা করো নন্দা! আর আমি কক্ষনো তোমায় এসব ছাইভস্ম পরতে বলবো না।"

অসহায় চক্ষে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে অলকানন্দা কহিল, "আমিতো কক্ষনো এসবত দেখিনি, তাই আমার হয়ত ভুল হয়েছে, আমায় দেখিয়ে দিন,—রাগ করবেন না।"

"ভুল তোমার হয়নি রাণী! আমারই হয়েছে। গয়নার উপর আদপনা মানায় না, তা' ভাবিনি। যাক ওসব তুমি খুলে ফেলে দাও। কাল থেকে মালিকে বলবো সে তোমায় ফুলের গহনা গেঁথে দেবে, তাই পরবে, কেমন?"

ক্ষিপ্র করে ধীরা মতি সোণার বহুমূল্য অলঙ্কারগুলাকে আপদ বিদায়ের মতই খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে সমস্ত বিপদতা হইতে যেন বিমুক্ত হইয়া হর্ষোচ্ছিত মুখে অলকা সাগ্রহে করিয়া উঠিল, আপনি মালিকে বলবেন ফুল দিয়ে যেতে, আমি নিজেই মালা গাঁথবো।"

"বেশ তাই হবে, আমিও তাহলে একটু প্রসাদ পাবো, কেমন ?"

"বাস্ প্রসাদ কি ! রোজ আপনাকে একটা করে গন্ধে মালা গেঁথে দেবো। আমি বিনি-সুতোরও হার গাঁথতে পারি।"

এই যে বহু সহস্র মূল্যের রত্নালঙ্কার ক্ষিতিপতি কিনাইয়া আনাইল, ইহা শুধু অলকাকে বিপন্নই করে নাই, রীতিমত বিপদাপন্নও করিয়াছিল। হাতে শুধুই গাছ কয়েক সুরো চুড়ি গলায় একটি হাল্কা হার বাকি রাখিয়া ক্ষিতিপতি সমস্তই শিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেও সংবাদটা উহ্য রহিল না। কাশীশ্বরী ক্রোধে কোপে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিলেন। এতবড় স্পর্দ্ধা ওই এক কোঁটা মেয়েটার। ছোটলোকের মেয়ে ইহারই ভিতর তাঁকে এড়াইয়া বরের কাছে এতরাশি গহনা আদায় করিয়াছে। আর ঐ তাঁর চিরঅনুগত ছোট ভাই দুধ দিয়া-মানুষ-করা ভাই, সে তাঁকে না বলিয়া একবার না দেখাইয়া সমস্ত ঐ শ্রীচরণে ঢালিয়া দিল। এ মেয়ে থাকিতে এবাড়ীর আর ভরসা নাই। কোনদিন তাহাকেই সে বাড়ীর বাহির করিয়া দিবে একথা তিনি গলপ করিয়াই বলিতে পারেন।—না কখনই তাহা হইতে দিবেন না, তার পিতৃগৃহে একটা স্বেচ্ছাচারিণী অজ্ঞাতকুলশীলার যথেচ্ছাচার চলিবেনা, ইহার প্রতীকার চেষ্টা তাহাকেই করিতে হইবে। ক্ষিতিপতি চিরদিন বলিয়া আসিয়াছে, সে বিবাহ করিবে না, ভাগিনের অচ্যুত ও অক্ষয়ই তার পিতৃপুরুষের জল-পিণ্ড দাতা ! আজ সে অনায়াসেই সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙিল।

এ বাড়ীতে অলকানন্দার মতই আরও একটি দুর্ভাগা জীব বাস করিত, সে ক্ষিতিপতিদের এক আত্মীয়-পুত্র খগেন। ক্ষেত্রী একেবারেই নিরাশ্রয় এবং ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া অস্থিসার। বিধবা মা নিতান্ত নিরুপায়েই কাশী ঠাকুরাণীর অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া ছেলেটিকে এবের আশ্রয়ে দিয়া গিয়া নিজে নিশ্চিন্ত চিত্তে শেষ নিশ্বাস ফেলিয়াছে। খগেন এবাড়ীতে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু স্থান লইতে পারে নাই, পচা পুকুরের পানার মত ভাসিয়া আছে। ক্ষিতিপতি প্রথম দিকে যত্ন লইয়াছিল, কিন্তু ইদানিং সে তো বাহিরে বাহিরেই ঘুরিতেছিল এবং এবার ফিরিয়া পর্য্যন্ত নবপ্রণয়ের মধুরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া বিশ্ব সংসারের ধারও ধারে নাই; কোথাকার কে একটা তুচ্ছ খগেনের বার্ত্তা সে কখন লইতে যাইবে ? ফলে এই হতভাগ্য জীবটী দিনে দিনেই রোগের ও গুরুকর্ত্রীর তাড়নায় তাড়নায় যমের দুয়ার ঘেঁসিয়া চলিতেছিল। অথচ এ বিষয় তার উপায় কি ? মুনিবের দৃষ্টি যার পরে কুদৃষ্টি তার দিকে কেইবা আর কেনইবা দৃষ্টি দিবে ?

কুক্ষণে তারই মত আর একজন এবাড়ীর আগাছার ঝোঁক পড়িয়া গেল তারই মত এই অভাগাটার উপর। অলকানন্দার করুণায় যেন বিগলিত হইয়া পড়িল। তার নিজস্ব দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া সব খোঁজ খবর লইয়া সে একদিন মরিয়া হইয়া ক্ষিতিপতিকে বলিল, "বাড়ীতে ডাক্তার সুবেলা আসছেন, খগেনকে একটু যত্ন করে দেখতে বলে হয় না ?"

ক্ষিতিপতি সবিস্ময়ে উত্তর করিল, "সেকি, নিশ্চয়ই দেখেন, আমি তো অনেক দিন আগেই বলে দিয়েছি।"

অলকা নিজের সম্বন্ধে যতটা নীরব পরের বিষয়ে তত নয়, সে দৃঢ় করিয়া প্রতিবাদ জানাইল, "না দেখেন না, বলেন, 'পথ্য ঠিকমত পায় না, শুধু শুধু গিলে কি হবে। অবেলায় চাকরদের সঙ্গে খেতে পাই, যা তা খায়, ওতে রোগ সারে না।' কিছু করা যায় না?"

ক্ষিতিপতি অবশ্য এ তুচ্ছ আবেদনে খুব বেশী খুশী হইতে পারিলনা, তার প্রেয়সী মানসী স্বর্গ মর্ত্য ছানিয়া এমন কিছু একটা আদেশ জানাক যাহা পূরণ করিতে তাহাকে এ বিশ্ব-পৃথিবীতে একটা ওলোট পালোট করিয়া ফেলিতে হয়, একটা অদ্ভুত কিছু অত্যাশ্চর্য্য কিছু ঘটাইতে হয়, তা নয়—তাহোক তবু তো তারই আদেশ। ব্যস্ত হইয়া গেল, কিন্তু অলকানন্দা জানিল না, তার এই বকলমাবাজি-নিষিদ্ধে কি ভীষণ বিপদকেই সে আজ নেমন্তন্ন রোপণ করিয়া বসিল।

(৭)

খগেন ছেলেটীর মধ্যে যে এতখানি প্রাণশক্তি ছিল, কেহ কল্পনাও করে নাই। সুপথ্য ও সুচিকিৎসার গুণে দু'একমাসের ভিতরেই তার যেন নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে নব কলেবর হইল। এতটাই সে সুশ্রী ছিল, ছমাস পূর্ব্বেও কেহ এমন ধারণা করিতে পারিত না। অলকানন্দার আনন্দের সীমা ছিল না। তাদের তপোবনে দাদু কত দরিদ্র সাধু ভিখারীকে ঔষধ পথ্য দিয়া রোগমুক্ত করিয়াছেন, অলকা ঠাকুর সঙ্গে থাকিয়া নিজের হাতে তাদের পথ্য রাঁধিয়া কাছে বসিয়া সযত্নে খাওয়াইয়াছে, তাদের কৃতজ্ঞ চিত্তের আশীর্ব্বাদে সুখে লজ্জায় কণ্টকিত হইয়াছে। সে সব এখন তার পক্ষে স্বপ্ন যদিও তার এই বন্দী জীবনের সেই সব স্মৃতিগুলিই একমাত্র সুখস্বপ্ন! খগেনকে দিয়া তার সেই বঞ্চিত চিত্ত যেন একটুখানি সার্থকতা লাভ করিল।

এই স্নেহ-কৃতজ্ঞতার পারস্পরিক আকর্ষণে দুজনকেই দুজনের প্রতি একটা অজ্ঞেয় সৌহার্দ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। প্রথমে অতি সঙ্কোচের সঙ্গেই, পরে প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমশ সহজ ভাবেই খগেন বাড়ির ভিতর আসিয়া বৌদিদির পদপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিতে সাহসী হইল। অলকানন্দাই অবশ্য একার্য্যে বহু অনুরোধে তাহাকে সম্মত করিয়াছিল। ক্ষিতিপতিও ইহাতে তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, সে বুঝিয়াছিল এই আশ্রমলতা এখানের শুষ্ক হাওয়ায় ক্রমশই শুকাইয়া যাইতেছে। এর এই নিঃসঙ্গ জীবনকে সর্ব্বদা সঙ্গ দিবার অবসর তো তার নাই, তাই এই প্রায় সমবয়সী শুভ্র ছেলেটিকে একার্য্যে সে তার একান্ত প্রয়োজনীয় বোধে তৃপ্তি সহকারেই নিজে যাচিয়া আসিয়া তাহাদের দুজনার সখ্যে সহায়তা করিল। মালির পরিবর্ত্তে এখন খগেন মেউড়ির বাগান হইতে সাজিভর্ত্তি ফুল তুলিয়া আনে, দুজনে বসিয়া হাসি তামাসা করিতে করিতে মালা গাঁথে, বিকচ পুষ্করের পদ্ম প্রত্যহ তার ঘরের ফুলদানীতে শোভা বিস্তার করে, প্রতিদিন একটী আধফোটা কমলকলি অলকার হাতে দিয়া সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠে, "বৌদি, এই নাও, 'হস্তে লীলাকমল' গ্রহণ করো, আর কদিনুম তো সাজি ভরেই এনেছি অলকে জড়িয়ে দাও মালাটী গেঁথে।"

প্রফুল্লস্মিত মুখে অলকা কৃত্রিম কলহে বলিতে থাকে, "যাঃ, যাঃ ঠাকুরপো, তুমি মজা পেয়ে গেলে, সে-দিন ঐ শ্লোকটা বলায়—আচ্ছা, আমিও তোমায় কি বলি বলতো? তোমার নামটা খগেন না হয়ে যদি—ই—"

"কি মৃত্যুঞ্জয় হতো?"

"এতে কি কবিত্ব আছে!"

"ওঃ নেই বুঝি! তা'হলে রুদ্রনয়ন?"

অলকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ওমাঃ ঐ বুঝি আবার নাম! উঃ রুদ্রপ্রয়াগের অলকা মন্দাকিনীর সঙ্গম ঘাট দেখনিতো, দেখলে বুঝতে সে কি ভীষণ জলকল্লোল, আর রুদ্র-নৃত্য! খগেন ঈষৎ চিন্তার ভাণ করিয়া কহিতে লাগিল, "সঙ্গম ঘাট কস্মিনকালেও কিছু দেখিনি, তবু বোঝা গেল ও রুদ্র-তাণ্ডব তোমার পছন্দ নয়, আ—চ্ছা, তাহলে ধরো যদি আমার নাম বদলিয়ে পরন্তপ কিম্বা পার্থ রাখা যায়, একটা কবিতার মধ্যে পড়েছিলাম অবশ্য বিস্তেতো আমার বাংলা ইস্কুলের ক্লাশ সেভেন্‌থ পর্য্যন্তই—"

অলকা ঈষৎ উৎসুক হইয়া উঠিলেও খগেনের শেষ কথাগুলায় একটু অপ্রতিভ ও বাধিত হইয়া পড়িল, নিরুৎসাহের সহিত শুধু প্রশ্ন করিল, "কি!"

খগেন অন্তরালী কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া গেল, "যবে যথা পরন্তপ পার্থ মহারথী
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উত্তরিলা।"

অলকা এবার আর তার সহসাগত গাম্ভীর্য্যকে সম্মান দিতে পারিল না, খলখলে হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল, হাসিতে হাসিতে গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "মাগো, ঠাকুরপো যেন কি?" কোথায় আমার সেই কালিদাসের সুমধুর পদ, 'হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দ' ইত্যাদি, আর কোথায় এই কঠকঠোর কি কাব্যকার কবিত্ব জানিনে, "যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে এসে উত্তীর্ণ যেন। কি অদ্ভুত কবিত্ব-বোধই যে তোমার!"

খগেন কহিল, "আমিতো তোমার মতন সংস্কৃত জানিনে বৌদি! শুধু চাণক্যশ্লোক দুচারটা জানি, শুনবে? আচ্ছা বলি শোন,

যো ধ্রুবানী পরিত্যজ্য অধ্রুবানী নিষেবতে,
ধ্রুবানী তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্ট মেবহিঃ।

—আর একটা—

"উঃ ঠাকুরপো! না, না 'অনৃতং যোহপিবদতি' বলবে ত? ওঃ নাবা, ওসব আমি জানি।" অলকা পুনশ্চ তার সেই সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বরে হাসিয়া উঠিল।

"বলি হ্যাগা, এটাকি ভদ্রলোকের বাড়ী না সরাইখানা, না বাইনাচের আসর! বলি এত থেকে থেকে হাসির হুল্লোড় উঠছে ঠিক দুপুরে কিসের জন্যে শুনি? মেয়েমানুষের এমন বেহায়াপনা তো আমরা কখনো বাপের জন্মেও দেখিনি। এতবড় বাড়ীতে এসব কি হতে লাগলো? বেটাছেলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসির বাহি দিনরাত বেজেই চলেছে।"

কাশীশ্বরী সশব্দে গৃহপ্রবেশ করিয়া উভয়ের মুখের দিকে যুগপৎ অগ্নিদৃষ্টি হানিলেন। তবে সে দৃষ্টিতে পরস্পর-পার্শ্বের অগ্নিবাণ নিহিত ছিলনা বলিয়া ঐ অপরাধকারিনী ও অপরাধী দুজনে নেহাৎ প্রাণে মরিয়া গেল না বটে, তবে মনের মধ্যে দুজনেই তারা তখন লজ্জায় প্রায় অধিমরা হইয়া গেল। চমকাইয়া সেই যে মাথা নীচু করিয়াছিল আর মাথা উঠাইলনা।

কাশীশ্বরী কিছুক্ষণ তীব্র বিষমিশ্র কঠোর দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়া উহাদের নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর বর্দ্ধিত রোষে গলার স্বরে আর এক পর্দ্দা কাঠিন্যপ্রকাশক সুর চড়াইয়া দাঁতের মধ্য হইতে করিয়া গেলেন, "আমি তখনই জেনেছি এ বাড়ীতে থাকবার উপায় নেই। এই সব ফুলকেলি, বসন্ত উৎসব যাবার এখন নিত্যই চলবেতো, ক্ষিতিকে বলে এবার নিজের একটা ব্যবস্থা করে সরবো ভাবছি।"

লজ্জাভয়ে অর্দ্ধমৃত হইয়া থাকিয়া অলকানন্দা প্রাণপণে মুহূর্ত্তে মরার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু ক্ষিতি যখন আসিল অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে সে দেখিল তার মধ্যে কোনই ভাবান্তরের চিহ্ন নাই, বরং সে আসিয়া তার পুষ্পালঙ্কারহীন নিরাভরণ দেহের দিকে চাহিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিল।

"অপেনটা আজ করেছে কি! জ্বর এসেছে নাকি? ফুল এনে দেয়নি বুঝি! ডাকছি ছোঁড়াটাকে, এই কে আছিস্‌রে, অপেন দাদাবাবুকে ডাক্।"

অলকানন্দা আঁৎকাইয়া উঠিয়া দ্রুতকণ্ঠে করিয়া উঠিল, "নানা, ওকে ডেকোনা. আর আমি ফুল নোবনা, মালা গাঁথবোনা, ওসব ভাল নয়, আমি জানতুম না।"

"কে বলেছে? দিদি বুঝি?" ক্ষিতিপতি ভীষণ ভ্রূকুটি করিল।

অলকানন্দা তাড়াতাড়ি জিব কাটিল, "আহা, তা কেন? এসব কি ভদ্রঘরের মেয়েরা পরে না, এই নিয়ে সময় কাটায়! আমি কাল থেকে তাঁড়ার ঘরের কাজ কর্ব্বো, বদি বামাপিসি করতে দেন।"

ক্ষিতিপতির অধর প্রান্তে ঈষৎ করুণার ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল, হায়রে আত্মগ-সুহিতা, প্রকাশ্যে শান্ত স্নিগ্ধস্বরে কহিল,

"অলি! দাদু তোমায় তো বলেছেন, আমার কথা শুনতে, বলেননি?"

অলকা দাদুর নাম শুনিয়াই যেন ঈষৎ আশ্বস্ত বোধ করিল, প্রফুল্ল মুখে ঘাড় নাড়িল, "বলেছেন।"

"তাহলে প্রতিবাদ করোনা, আমি তোমার ফুলের রাণী দেখতে বড্ড ভালবাসি সখি! আমায় তুমি ঐ সুখটুকু থেকে বঞ্চিত করো না সেই বর্ণনাটা কি যে! কর্ণেষু যোষাঃ নব কনিকারঃ .....ওঃ, খগেন এসেছিস, বা দেখি তোদের বৌরাণী, না বৌদিদি, না কি, ওর জন্যে চারটি ভাল দেখে ফুল নিয়ে আয় চট করে, ফুলের গন্ধ না পেলে ওর মাথা ধরে একদা' হবে, ঘুম হবে না রাত্রে। সারারাত ধরে খুকিমনি কেঁদে ভাসাবেন।"

অলকা আরক্তমুখে মৃদু তর্জন করিল, "যান কি যে বলেন সব!"

খগেনও ভিতরে ভিতরে মানুষ হইয়া উঠিতেছিল, সে আজ মরিয়া হইয়াই বলিয়া উঠিল, "কিন্তু দাদা! দিদিঠাকরুণ বৌদিকে এর জন্য অনেক তিরস্কার নিত্যই করেন, আজ বড্ড বকেছেন, ও সব থাকনা।"

ক্ষিতিপতি বাড়ি ঢুকিতেই যে তার দিদি তাকে তলব দিয়াছিল, সে সংবাদ পায় নাই তাই এই বিদ্রোহী বীরের ঘোষণাকে তারা অজ্ঞতাবোধে সাবধান করিয়া দিতেছিল। ক্ষিতিপতি কর্তব্যনির্ণয় করিয়া আসিয়াছিল বলিয়াই সে এই বাদ-প্রতিবাদে চটিল না, শান্ত মুখেই আদেশ করিল,

"বলছি যা, তা' শোনবা কেন? বলাম না, শকুন্তলা দেবীর ফুলশয্যা নৈলে নিদ্রা হয় না, ওরা চিরদিন পদ্মপত্রে শুয়ে শুয়ে সখার হাতে পদ্মপাতায় হাওয়া খাওয়া অভ্যাস করে রেখেছেন যে, এখন ওকে যখন তোদের ফ্যানের হাওয়ায় এনে ফেলেছি, করি কি? বলে, 'পড়েছে যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' দিদি বলে শুনিসনি। যাঃ ছুটে যা—"

(৮)

পরদিন সকালবেলা অলকানন্দা কাচাকাপড়ে পরিশুদ্ধ বেশে ভাঁড়ারঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই সেখানে বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। ভাণ্ডারিণী উদয়ের মা ত্রস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কি চাই বৌমা! তুমি এখানে কেন এমন সময়?"

ঝাঁটাহস্তা এবং চালধাপার রেকুধারিণী ঝিয়েরা সব অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। সকলেরই দৃষ্টি যেন তার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছিল, এ আবার কি? তুমি এখানে কেন? অলকানন্দা সংসারের কর্তা সেকথা এপর্যন্ত এবাড়ীর একটা প্রাণীও ত ভাবিয়া দেখে নাই, কেহ বা বিষিষ্ট চোখে কেহ বা সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাহাকে এবাড়ীর একজন অনাহূত রবাহূতদেরই মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছিল, যার এবাড়ীর মধ্যে কোনই প্রয়োজন ছিল না যে বাড়ীতে আসে যায় খায় নাই, যে অবয়বস্থিত এসংসারের বস্তাজলে ভাসিয়া-আসা কুটার মত আসিয়া পড়িয়াছে। মৃদু কীণস্বরে অলকা উদয়ের মার প্রশ্নোত্তরে কহিল, "কি কাজ কর্ব্বো আমায় বলে দেন না জ্যেঠাইমা!"

উত্তর শুনিয়াই ত জোঠাইমার চক্ষু চড়কগাছ। কাজ করিবে! এই রংলী পাখী ওছাইয়া নাড়ী পরিতেই আজও শিখিল না, এ করিবে কাজ! আর তা'ছাড়া কেনইবা তা'করিবে? সেই কথাটাই বলিয়া অত্যন্তভাবেই উত্তর দিলেন, "আ আমার অভাগ্যির দশা! তুমি কিসের দুঃখে কাজ কর্ত্তে যা। তবে আর আমরা পাঁচজনা রয়েছি কি কর্ত্তে?"

অলকা ইহার পর আর কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না, অথচ ঐ এক কথাতেই বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাওয়াও তার পক্ষে সঙ্গত বোধ হইতেছিল না, নীরবে তাই উপায় হাতড়াইতে ছিল কিন্তু তার প্রয়োজন হইল না, অন্তরেন্দ্রিয়া কাশীশ্বরী এতক্ষণ তির্য্যকদৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন, সহসা কাছে আসিয়া কহিয়া উঠিলেন, "একি কাণ্ড! ফুলসজ্জা ছেড়ে যেঁায়া মসলা রান্না-ঘরে আজ রাজনন্দিনী প্যারীর হঠাৎ এ অভিধান হ'ল কেন? যাও যাও তুমি ফুল গোলগোল খেলতে যাও ভাই, একটি যদি আমার ভ্যাড়াকান্ত আয়ান ঘোষ ভাইটী এসে তোমাকে এই নোংরা আয়গায় দেখেন, ছটিলা কুটিলার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালবার হুকুম হবে যে!"

অলকা দারুণ অপমানের আঘাতে এবার কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু এত লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া সকলকার উপহাসের পাত্রী হইবার মত দুর্ব্বলতা তার ছিল না; এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মসংযত হইয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া একখানা কাৎকরা বঁটী টানিয়া লইয়া আলুর খুড়ি হইতে আলু তুলিয়া ছাড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল। অমনি জোঠাইমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "থাক থাক মা, হাত কেটে ফেলবে, ও তোমায় করতে হবে না।"

কাশীশ্বরী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখান হইতেই টিটকারী দিলেন, "না হলে নতুন আদর কাড়ান হয় কি করে, তাক্তার ছোঁড়া ছুটে আসবে, রাজা হাতে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একগুটী ধরে ছুঁদেবে, তাই আবার আমাদের সাতসো খোয়ার করতে বসে হয়ে ছুটে আসবে। তবে না, রাজরাণীর খাতির হবে।"

মৃদুস্বরে অলকা শুধু একবার বলিল, "আমার এসব কাজ করা খুব অভ্যাস আছে, সেখানে তাই তো আমি করতুম।"

ঝিএরা একটু মুখ মচকাইল, কাশীশ্বরী কহিলেন, "সেত জানিগো, সেকথা যেতে দাওনা, এখন কি আর সে সব কথা মনে আছে! বলে, "দশা ঘুরে গেছে মাথা', আজ যেন রাণী হয়ে 'ও কিসের ফুল গো, কিসের পাতা!' এরকমটাতো চিরকাল ধরে হয়েই আসছে। তোমারইতো শুধু একার নয়!"

দিনকয়েক পরে অলকা ক্ষিতিপতিকে ধরিয়া বসিয়া কহিল, "আমার একটী অনুরোধ আপনি রাখবেন?"

ক্ষিতি কহিল, "বলুন, কি রাখবো, সেইটে শুনিতে আগে।"

"না আগে! ওরকম বলেন কেন?"

"কি রকম?"

"বলুন' বলেন কেন ?

"আপনার কাছেই শিখেছি. আপনি বলেই বলবো।"

"না বান্—"

"বেশ তাই যাচ্ছি, তবে শুনে গেলেই ভাল হতো না কি ?"

"বলছিলুম," বলিয়া অলকা ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, পুনশ্চ জোর করিয়া অকুণ্ঠিত হইবার জন্ম চেষ্টা করিতে করিতে একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "খগেন ঠাকুরপোর পড়াশোনা করবার বড্ড ইচ্ছে, ও বলছিল যদি আপনি—তুমি ওকে কলেজে ভর্ত্তি করে দিতে তাহলে—"

ক্ষিতিপতি অসহিষ্ণু হইয়া বাধা দিল, "পড়াশোনা করতে ইচ্ছে তো করে না কেন ? বারণ করছে কে ? বেশ, বলো ওকে সব ব্যবস্থা যেন ক'রে আমায় জানায়, ও হয়ে যাবে। কিন্তু ও কলেজ করতে গেলে তোমার হপ্তা কিরকমটা হবে অলি ?" সহাস্তে কহিল, "তাহলে কি ওর বদলে "আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকার! দেবী প্রতিদিন।"

"নাঃ, আপনি বড্ড দুষ্টু !" বলিয়া অলকা একঝটকায় ক্ষিতিপতির হাতে ধরা নিজের মুখখানি ছাড়াইয়া লইয়া সলজ্জ হাতে পিছন ফিরিল। কার্য্য সফল হওয়ার আনন্দের সঙ্গে মিশ্রিত ঈষৎ একটা সন্ত্রাসও তার মনে ধাক্কা দিয়াছিল, কালীঘরীর দুষ্ট ইঙ্গিত যেন ক্ষিতিপতির স্নিগ্ধ স্নেহ-রসের মধ্যে মিশ্রিত রহিয়াছে ইহারও কোন অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ আছে না কি ? যত ছেলেমানুষই হোক, সরলাই হোক, অলকা নির্ব্বোধ বা মূর্খ নয়, খগেন কেন হঠাৎ পড়িবার জন্ম একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, কেন সে তার এই অত্যন্ত স্নেহ অন্ধার পাত্রীটির একমাত্র সান্ত্বনাস্থল জানিয়াও নিজেকে তার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া লইতে অধীর হইয়া উঠিল, সে কি তাহা বুঝিতে পারে নাই ? পারিয়াছে বলিয়াই সে নিজে এই দুরূহ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছিল একরকম মরিয়া হইয়াই, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিল, ক্ষিতিপতিকে সে সত্যই ভাল করিয়া বুঝে নাই, লোকটা সত্য করিয়াই হয়ত অমলোক।

দিন মাস বর্ষ কাটিয়া গেল। অলকানন্দার এই অপরিচিত সংসারে একটি একটি করিয়া তিনটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তার মুকুলকোরকের মত শিশু কন্যাটীর শুভ অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে, এমন কি শুভ জন্মদিন পর্য্যন্ত কিছুদিন পূর্ব্বে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সে এখন তার ঝি মুকোর হাত ধরিয়া তাদের লম্বা দালানের এপ্রান্ত হইতে ওপ্রান্ত পর্য্যন্ত "হাঁটি হাঁটি পা পা" করিয়া বেড়াইতে পারে। মধ্যে মধ্যে তার কয়োচ্ছ্বাসিত হাস্য-ধ্বনি কদাচিৎ আষাঢ়ের কান্নার সঙ্গ বিমনা অলকানন্দার কর্ণকুহরে ভাসিয়া আসিয়া তাহাকে সচকিত করিয়া তোলে। কখনও কখন সে তাই শয্যাকুসুমশয়ন ছুটিয়া বাহিরে যায়, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ম্লানমুখে ও মন্থরগতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। মেয়ে থাকে কালীঘরীর নিজস্ব হেপাজতে, 'যখন তখন দেখা দিয়া' মেয়ের অভ্যাস খারাপ করায় তিনি একান্তই বিরোধিনী। সময় মত দুটী বেলায় দুটীবার ঘড়ি ধরিয়া মাতাপুত্রীর সাক্ষাৎ ঘটে, এর বাহিরে

অলকা সন্তান সন্দর্শন করিতে পায় না, এ বিষয়ে তাঁর কড়া হুকুম। ক্ষিতিপতিও এ সম্বন্ধে গিন্নির হাতেই সমস্ত ভার দিয়া চুকিয়াছেন। যেহেতু কাশীশ্বরী তাহাকে মেয়েটির জন্ম মুহূর্ত হইতেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, অলকা একে নেহাৎ ছেলেমানুষ, তাতে শিশু-পালন সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞানগম্যই তার হয় নাই, বিশেষ করিছেলের বরাট পোহাইতে গেলে সে স্বাস্থ্যসম্পদ ধোঁয়াইয়া দুদিনে বুড়ি হইয়া যাইবে, মেয়ে কাশীশ্বরীই মানুষ করিবেন, ক্ষিতিকেও তিনিই করিয়াছেন, সে কি মানুষ কিছু কম হইয়াছে? এ বয়সে তারা দুটীতে আমোদ আহ্লাদ করুক না ইহা সুখের কথা। ক্ষিতিপতির খুবই মনোমত হইয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য। সুন্দরী স্ত্রীকে সে এখনও প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে অবসর পায় নাই, প্রৌঢ়া শিশু ধাত্রী হাতে তাহাকে যদি রক্ষা করিতে পারে, তা অপেক্ষা তার আর প্রার্থিত কি থাকিতে পারে। সূতিকাগার হইতেই শিক্ষিতা নার্সের হাতে বিভিন্ন ঘরে কাশীশ্বরী তাহাকে নিজের কাছাকাছি রক্ষা করিয়া তাহাকে তার ঈপ্সিত অখণ্ড প্রেমালাপের অবসর করিয়া দিলেন। অলকা যে এই ব্যবস্থায় কি নিদারুণ মর্মাহত হইয়াছে সে তিনি তার মুখচোখেই এক লহমায় নিশ্চয়ে দেখিয়া লইয়াছিলেন, আর সেইতো তাঁর এই দাসীত্বভার বহনের একমাত্র সান্ত্বনা। প্রথমতঃ ক্ষিতিপতির পুত্র না হইয়া কন্যা হওয়াতে ঈষৎ একটু ক্ষতি বোধ হইয়া ছিল, কিন্তু উকিলবাবুর মন্তব্য শুনিয়া সেই আশা সূত্রটুকুও তো ছিঁড়িয়া গিয়াছে, মেয়েও নাকি পিতৃধনের অধিকারিণী হয়, যদি না তার ভাই থাকে। ঐ ক্ষিতিপতির যদি তার মায়ের প্রৌঢ়কালে না জন্মিত তবে কাশীশ্বরীই এই বিপুল ধনৈশ্বর্যের একমাত্র অধিকারিণী হইতেন! সকল দিক দিয়া ওই তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়াছে। অলকা বন্ধ্যা হইলেই বা কি ক্ষতি হইত।

খগেন আইন পাশ করিয়া কলিকাতায় কোন আর্মে কাজ শিখিতেছিল, সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাহাকে স্পেশালিষ্ট হইতে বিলাত পাঠাইবেন, তাই যাত্রাপূর্বে সে এ বাড়ীতে বিদায় লইতে আসিয়াছিল। অন্নপ্রাশনে ও অন্নদিনে সে দুটি লইয়া কয়েকবারই এখানে আসিয়াছিল। কিন্তু যে জানে কোন প্রচ্ছন্নচৈতন্যে কাশীশ্বরীর বিষদৃষ্টি তার উপর হইতে একচুলও অপসৃত হইল না। তাহার উপর তাঁর নিজ সন্তানের চেয়ে খগেনের চেহারা ভাল, কলিকাতায় থাকিয়া নীরোগ শরীরে তার শ্রীভিমন্ত রূপ ফুটিয়াছে, পাশ করিয়া জলপানী পাইয়া তো ছিলই এখন আবার তাদের প্রিয় হইয়া সসম্মানে বিলেত চলিয়াছে। খগেন আসিলে অলকারও যেন মূর্তি বদলাইয়া যায়! স্নান ছলছল চোখমুখ যেন আহ্লাদে হাসিতে থাকে। দুজনের কথা আর ফুরায় না; আবার ক্ষিতিপতিও তাকে ভালু-হাতঘড়ি দামী ফাউন্টেন পেন কতকি উপহার দেয়, একমাত্র তাগিদা তখন না হয় দুবার ছুটো হারাইয়াছিল, তাই বলিয়া তার বেলায় আসিল একটা বাজে আপানী আর খগেনের বেলায় পার্কারের দামী পেন! স্ত্রীভিমন্ত খোসামোদ নয় আদুরে বটকে। কলিকালেও যে অজ্ঞান ঘোষ জন্মায় সেই তার ছেড়ুয়া তাকে দেখিলে কারু সন্দেহ থাকিবে না। পথে আহাজ-ডুবি কি হয় না? ভূমিকম্প টাইফুন আপানে তো শুনি লাগিয়াই আছে, ঐ রকম একটা কিছু হইলেই তো আপদ চুকিয়া যায়।

অলকাবন্ধ্যা বটই হোক বয়সেও বাড়িয়াছে, সন্তানের মা হইয়াছে, একটু সাহসও তার না হইয়াছে তা' নয়, সে খগেনের ফিরতি দিনে একটু ভালভাবে খাওয়ার উদ্যোগ করিতে ভাণ্ডারিণী জেঠাইমাকে বলিয়া পাঠাইল, বলিয়াছিল, একটা মাছের মুড়া ও পায়েস যেন খগেনকে দেওয়া হয়। ইচ্ছা ছিল নিজে কাছে বসিয়া

তাকে সযত্নে খাওয়ায়, কিন্তু এবাড়ীতে সে হইবার উপায় নাই, তার কি সারদাকে ডাল করিয়া দেখিতে পাঠাইল, খগেন হয়ত নিজে চাহিয়া কিছু লইবে না, তাহলক্ষ্য ভাল মিষ্টি আনাইয়াছিল, শেষপাতে সারদা যেন তার পাতে দিয়া আসে।

সারদা ফিরিয়া আসিয়া যে খবর দিল সে অদ্ভুত; বলিল, "ও বৌরাণি! কোথায় তোমার মাছের নুড়ো পাবেন, খগেন দাদাবাবু তো সেই আগের মতনই ছেঁড়া কুশাসনে বসে সরকার গোমস্তাদের সঙ্গেই মোটা চালের ভাত চচ্চড়ি চুনো মাছ খাচ্চেন, আমি বাপু নজায় আর মিষ্টি দিতে পারলুম না ফিরিয়ে আনলুম কাপড় চাপা দিয়ে।"

অলকার বেদনাহত অপমানিত মুখের দিকে চাহিয়া সহসা গভীর সহানুভূতির সহিত প্রস্তাব করিল, "শোন বৌরাণি! আমি এক কাজ করি, মিষ্টিগুলি বেকাবে করে সাজিয়ে ধরি, উনি যখন তোমার কাছে বিদায় নিতে এঘরে আসবেন, সেই সময় ওঁকে খেতে দিও, কেই বা তখন দেখবে। আহা কতদূরে চলে যাচ্চে বেচারী, মায়ের পেটের ভাইটির মতন দুটীতে ভাব, মন কেমন করে না! আমারও দেশে ধর্ম্মমায়ের ছেলে একটী ধর্ম্ম-ভাই আছে মা, আমি জানি, নিজের ভাই না থাকলে ভাই পাতালেও তাদের মত ভালবাসা হয়।"

এই সহানুভূতিপূর্ণ প্রস্তাবটী অলকা একান্ত আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করিয়া লইল।

কত ক্ষুদ্র বীজ হইতেই যে কি ভীষণ বিষাক্ত বিষবৃক্ষের উদ্ভব হয় কেহ তার কল্পনাটুকুও করিতে পারে না।

খগেন হাসিমুখে ও অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে পায়ের তলায় মাথা দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেই অলকা আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, সে অসহায়া বালিকার মত কাঁদিয়া উঠিয়া দুহাত দিয়া তার দুটো হাত সবলে জড়াইয়া ধরিল, বুকফাটা আর্ত্তকণ্ঠে করিয়া উঠিল, "ঠাকুরপো! ভাই! আজ থেকে আবার তোমার পথ চাইবারও উপায় রইলো না, কি করে থাকবো আমি ভাই?"

খগেনও কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে সচেষ্ট সান্ত্বনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "বৌদি ভাই। আবার তো আমি বছর দুই পরে ফিরে আসবো, কেঁদনা তুমি, তোমায় কাঁদতে দেখে গেলে—" তার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। অলকা এবার তার হাত ছাড়িয়া দিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া গেল। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল, "উঃ এই বাড়ীতে এসে তোমায় সে সময় যদি না পেতাম আমি পাগল হয়ে যেতাম, ভগবান জানেন, তোমায় স্নেহ আমায় কতখানি রক্ষা করেছে।"

"বৌরাণি! কই ভাইকে মিষ্টিমুখ করালে না? নাও দাও মুখে তুলে খাইয়ে দাও, মনে করো আজই যেন ভাই ফোঁটা।" মিষ্টিসাজান পাথরের রেকাবখানা তুলিয়া সে অলকার সামনে ধরিল।

অলকানন্দা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, সময় চলিয়া যাইতেছে, সে জানে এ ঘরে খগেনের এই বিলম্বিত অবস্থান নিরাপদের নয়; তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা বড় সন্দেশ সে হাতে লইয়া অশ্রুজলে ভেজা ঠোঁটে ঈষৎ হাসি টানিয়া আনিয়া খগেনকে বলিল, "বলো ভাই, গরীব বৌদির হাতে আজ বিদায়ভোজের এতটুকু মিষ্টি মুখে দিয়ে যাও, যখন ফিরবে ততদিনে তোমার এই হতভাগী বৌদি হয়তো যমের দুয়ারে কাঁটা দিতে স্বশরীরেই পৌঁছে গেছে দেখবে।"

"ছি দিদি! ওকি বলছেন! দিন আপনার প্রণাম দিন, পরমায়ু বৃদ্ধি করে অন্নপাকাশে যাই—" হাসিবার ভাণ করিয়া সে সামনে বসিয়া পড়িয়াছে, অলকার হাত তার মুখে সন্দেশের গ্রাস তুলিয়া দিতেছে, এমন সময় তাদের ঠিক পিছনে কঠোরতম কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বৌ!—"

ঠিক পাশেই যদি আকাশ হইতে বজ্র পড়িত তো ওরা দুজনে এর চেয়ে বেশী করিয়া আঁৎকাইয়া উঠিতনা। আকাশখান হইতে যোমা ফেলিয়া আততায়ী সেন তাদের উপরে নির্ঘাত মারণ অস্ত্র হানিল। অলকানন্দার হাত হইতে ভাজা সন্দেশের অবশিষ্টাংশটুকু খপ করিয়া মায়ের মার্কেল মেঝের উপর পড়িয়া গেল, তার যে অংশটুকু খগেনের মুখের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেখানে সে তার সমস্ত মিষ্টত্ব এবং তারও চেয়ে অনেকখানি বেশী, স্নেহ-মমতার সমুদয় মাধুর্যটুকু নিঃশেষে হারাইয়া একমুষ্টি ধূলির মত বিস্বাদ শুষ্ক মূর্তিতে তার গলার কোঠায় ঠেলিয়া রহিল, না পারিল সে উহা গলাধঃকরণ করিতে, না পারিল মুখ হইতে ফেলিয়া দিতে।

আর অলকা সে তার অজস্র দৃষ্টি যখন দ্বারের দিকে ফিরাইল, তখন সেখানে সে যাহাকে দেখিল তার আসল চেহারা তার নজরে পড়িলনা, ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে আপনার মধ্যে আপনি একবারে মরিয়া গিয়া সে সেই হিংস্র নারী মূর্তির মুখে দেখিতে পাইল নিজের মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা।

(৯)

খগেন কখন কেমন করিয়া উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, যাবার সময় সে তাহাকে কোনকথা বলিয়াছিল প্রণাম করিয়াছিল, অথবা নিরপরাধে কিরকম অপরাধের কালিমা লাঞ্ছিত অবনত মুখে নিঃশব্দেই বিদায় হইয়া গিয়াছিল, অলকা কিছুই টের পায় নাই। যাহাকে প্রকৃতপক্ষে বজ্রাহত হওয়া বলে সেই একটীমাত্র আঘাতের শব্দভেদী বাণে তাহাকে তাহাই করিয়া দিয়াছিল। ঐ 'বৌ' ডাকটুকুর মধ্যে কত বড় যে নিহিতার্থ আছে সংসারানভিজ্ঞ হইলেও দার্শনিক-কবি দাদুর মন্ত্রশিষ্যা সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য-দর্শনে সুপণ্ডিতা অলকানন্দার বুঝিতে মনে তার অর্থবোধ হইতে আটকায় নাই। কাশীশ্বরী কোনদিন তাহাকে তাঁর ভ্রাতৃবধূরূপে স্বীকার করিয়া লন নাই, কিন্তু আজ সেই সম্পর্ক ধরিয়াই তিনি তার অপরাধকে বিচার করিয়াছেন, ন্যায়তঃ এ অধিকার তাঁর আছে।

কাশীশ্বরী বেশী কথা বলেন নাই, শুধু বলিয়াছেন, আজ স্বচক্ষে যা দেখেছি তারপর আর এ বাড়ীতে তোমার জায়গা হবেনা, হ'তে দোব না, ক্ষিতি ছেড়ে ক্ষিতির মরা বাপ বেঁচে ফিরে এলেও তাঁর সাধ্য হবেনা তোমায় এখানে রাখতে। দশের সামনে পঞ্চায়েতে এর বিচার করাবো, অবশ্য তার আগে যদি আমার ভাই তোমায় গুলি করে না মেরে ফেলে! আর সেই ভয়েই আমার সর্বশরীর থর থর করে কাঁপছে!! যতই হোক পুরুষ-বেটাছেলে সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে!

এরপর আরও একটী সুপরামর্শ সেই নিদয়া মহিলা অবশ্য সুদয়া হইয়াই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে দিয়াছিলেন, অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে জানাইয়া ছিলেন, "এমন ভদ্দরলোকের মেয়ে বলে তারা নিজের মান

নিজেই রাখে, চল পিছকির পুকুরে ডুবে না হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরে স্বামীর মান আর প্রাণ বাঁচায়। তোমার তো মান-ইজ্জত বলে কিছুই নেই, নেহাৎ চাবাতে ঘরে জন্মেছ!"

সারদা তাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইতেছে এই অবস্থায় সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। অকস্মাৎ এই অপ্রাসঙ্গিক সহানুভূতির অশ্রুজলে ভিজিয়া গিয়া তার বুকের পাষাণখানা যেন নড়িয়া উঠিল, সে দুবার ব্যর্থ হইয়া তিনবারের চেষ্টাতেও গলা দিয়া শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিল, "সারদা! গলায় দড়ি দিতে আমি পার্ব্বো না, প্রেত হয়ে টঃ কি হবে আমার?"

সারদা একান্ত অনাত্মীয়া মাহিনা-করা ঝি হইলে কি হয়, অলকার এ বাড়ীর আত্মীয়াদের চেয়ে সে মনুষ্যত্বে অনেক বেশী বড়, শুধু তাই নয়, নিতান্ত ভালমানুষ নির্ব্বিরোধী নিরপরাধিনী অলকার উপরে এই-নিরন্তর নিপীড়ন তাহাকেও একান্ত অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। সে দেখিয়াছে অলকা তার এতখানি নিগ্রহের বিরুদ্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করে না, যে স্বামী তাকে অত সোহাগ দেখান, তাঁহাকে এ বিষয়ে হয়ত ঘুণাক্ষরেও কখন কিছু জানিতে দেয় নাই। আশ্চর্য্য বোকা মেয়ে!

সে উচ্চস্বরে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, "নাও! গলায় দড়ি তুমি দিতে যাবে কোন দুঃখেরে, বাবুতো আজই ফিরে আসছেন কলকাতা থেকে, তুমি না বলো, আমি আজ ওনাকে সবখানি খুলে বলে এর একটা বিলি করাবো। একি! দিন নেই রাত নেই, তোমায় নিয়ে নিয়ত এই 'হাঁস-ছাগুলী' করতে ঐ বুড়ী মাগী! তোর মেয়ের বইসি না!"

সভয়ে অলকা সারদার মুখ চাপিয়া ধরিল, "চুপ! তুই থাম্ সারদা, এক্ষনি শুনে ফেলবে!"

একটু ভয় লইয়া বলিল, "সে হয়না সরি! উনি আমায় বলেছিলেন, 'মা মারা যেতে দিদিই আমায় মায়ের মতন মানুষ করেছেন, ওকে তুমি সহ্য করো।' না সারদা! আমি ওঁর অবাধ্য হবো না, তাতে ওঁর কষ্ট হবে, হয়ত একথা উনি বিশ্বাসও কর্ব্বেন। যিনি প্রমাণ দেবেন, ছলন দেবেন, তিনি ওঁর মায়ের মতন দিদি আর আমি—আমি কে!"

সারদা খুব খানিকটা কাঁদিল, তারপর হঠাৎ চোক মুছিয়া আশ্বস্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "তাহলে এক কাজ করোনা বৌদি।"

অলকা তার নিরুদ্ধ, আলাভরা নিরাশ মধ্যাহ্নের মত দীপ্ত চোক তুলিয়া ভাষাহীন প্রশ্নে চাহিল. "হরিদ্বারের টিকিট কেটে তোমায় দাদুর কাছে পৌঁছে দিইনা? আমি রেলগাড়ীতে অনেকবার চেপেচি, গেরণে' কাশী পর্য্যন্ত গিয়েছি, পারবো তোমায় নিয়ে যেতে।"

অকস্মাৎ কাল-বৈশাখীর ঝড়কে অভিভূত করিয়া হুহু করিয়া বৃষ্টির সহস্রধারা নামিয়া আসিল, সারদাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অলকানন্দা কাঁদিয়া বলিল, "পার্ব্বে সারদা! তবে চলো, এই মুহূর্ত্তে আমি যেতে চাই, একদণ্ড-ভরা পোড়ার মুখ আমি ওঁর সামনে বার করতে পার্ব্বো না।"

* * * *

"অলকা! অলি! নন্দা! নন্দি! এই, কোথায় লুকিয়ে আছিস্? না না, আছে? শিগগির! চোক বুজেছি, দেখছিসনা,—এই বেলা! ওরান, টু, থ্রী।"

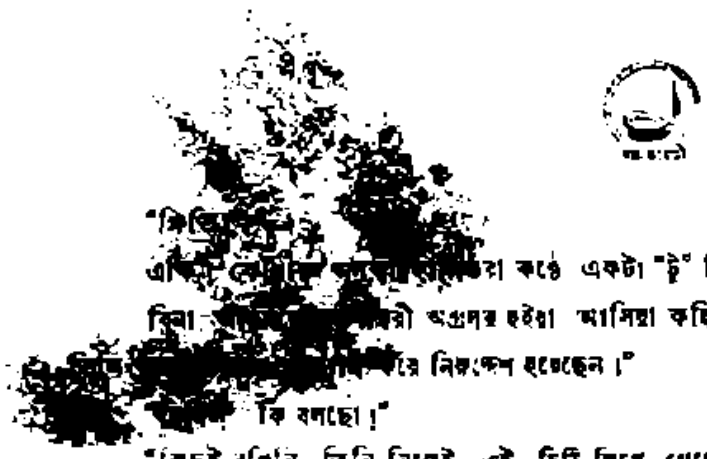

"কিতি
এ
দিবা
কি বলছো!"

"কিছুই বলিনি, তিনি নিজেই এই চিঠি লিখে গেছেন, পড়ে দেখ, এইসব গহনাগাঁটী খুলে দিয়েছেন, দেখতে পাচ্ছো? দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করো, ভাড়া গাড়ি এসেছিল কি না—"

বিজয়িনী কাশীশ্বরী বিজয়গর্ব্বে বিলম্বিত পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া গেলেন, যাত্রাকালে স্বগতোক্তি করিলেন, "মা বটে! পেটের সন্তানটাকে একবার চোকের দেখাও দেখে গেল না! শুধু কালি মাখিয়ে রেখে গেল।"

পত্র যে ঠিক নয়, শুধু একটা "সর্ট-নোটীশ।"

"এই কলঙ্ক-লাঞ্ছিত মুখ এ জন্মে আর দেখাইব না!"

ক্ষিতিপতির দেহে প্রাণ আছে ত! অনুভূতি কিন্তু নাই—কিন্তু সে একটী মুহূর্ত্ত মাত্র, পরক্ষণে সে প্রবল বেগে মাথা নাড়া দিল, না, না, না, এ অসম্ভব!

রেল-পুলিশের নিকট হইতে টেলিগ্রাফ আসিল, 'ডাউন শিলং মেলে ভীষণ অ্যাকসিডেণ্ট' শীঘ্র আপনার অনুরোধ।—'

মানুষ চেনার কোনই উপায় ছিল না, তবু যে অলকানন্দাকে ক্ষিতিপতির স্ত্রী বলিয়া জানা গিয়াছে সে শুধু ওর একটী ছোট্ট 'অ্যাটাচী কেসে' ক্ষিতিপতির ষ্টেটের ছাপা নাম ঠিকানাযুক্ত চিঠির কাগজে একখানা পত্র বা ক্ষিতি তাকে মহাল হইতে একদা লিখিয়াছিল। তা' নহিলে ওই সমস্ত মুখ মাখা থেৎলাইয়া যাওয়া হাড় মাংসের পিণ্ডীকৃত নারীদেহকে কে চিনিত! থার্ড ক্লাশ যাত্রীর সঙ্গে ঐ একমাত্র বাঙ্গালী মহিলাই ছিল, আর যারা সাঙ্ঘাতিক আহত হইয়াছে তাদের সকলেই বেহারী বা পাঞ্জাবী।

ক্ষিতিপতি অলকার শাড়ীর রং ও পাড় এবং গায়ের রক্তমাখা ব্লাউজের ছিন্ন অংশ চিনিতে পারিল। দুদিন চলিয়া গিয়াছে, দেহ নীল-কপিল বর্ণ, তার থেকে অলকার সেই অলক্তকাক্ত শুভ্রবর্ণের ধারণা করা সম্ভব নয়, একমাত্র তার নাম-ঠিকানা দেওয়া পত্র আর শাড়ীর পাড়।

সুটকেসে দুখানি হরিদ্বারের থার্ডক্লাশ টিকিট। খগেন তাকে তার দাদুর কাছে পৌঁছাইয়া দিতে লইয়া যাইতেছিল।

সমস্ত হতাহতের মধ্যে খগেন নাই।

খগেন পরদিন রওয়ানা হইয়া জাপান হইতে কেবল্ করিয়াছে, "দাদা বৌদিকে প্রণাম।" সে এই সাঙ্ঘাতিক অ্যাকসিডেণ্টের খবরও পায় নাই। না পাওয়াই ভাল। ক্ষিতিপতি একাই তার দুর্ব্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করুক, আশ্রিত-বন্ধুকে সে বলিয়া বাঘিনীর গহ্বরে পুরিয়া দিয়াছিল।

দহন

শ্রীশান্তা দেবী

অনেক দিন আগের কথা। তখন মেয়েরা খাকৃত ঘরের কোণে হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে, নিজের স্বামী-পুত্র ছাড়া আর কোন পুরুষের সঙ্গে দেখাও তাদের ক্বচিৎ হত। সেকালের একটা কাহিনী হঠাৎ পুরানো ডায়েরীতে এতকাল পরে খুঁজে পেলাম। সেদিন হাসপাতালে আমার ডিউটি ছিল। সঙ্গী ছিল পুলিন। তখনও কাজে যাইনি, বসে বসে একটা অ্যানটিমির ছেঁড়া বইয়ে লাল দাগের উপর নীল দাগ দিচ্ছিলাম। হঠাৎ পুলিন এসে পিছন থেকে একটা ধাক্কা দিয়ে বল্‌লে, "ওরে আজকের নূতন কেসটা দেখেছিস্?" পেনসিলটা ইংরিজি অক্ষরগুলোর উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে নদীর মত দাগ টেনে ছিটকে এসে পায়ের কাছে পড়্‌ল। বিরক্ত হয়ে বল্‌লাম, "না, তোমাদের কেস তোমরা দেখ গিয়ে, আমার এখন মুদ্দফরাসের মত ল্যাস্ত মানুষ ছিঁড়ে খাবার অবসর নেই।" পুলিন দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌লে, "হুঁ হে শাক্যমুনি, সবাইকে চেনা আছে। তা ছাড়া সম্প্রতি আমি যার কথা বল্‌ছি তার মুণ্ডু মুদ্দফরাসের চেয়ে তোমার হেন কবিরাই বেশী বোঝে। রোগটা তার বাংলা দেশে নিতান্ত দুলভ, দুর্লভ অমন আর একখানা চেহারা।"

কবি হই আর নাই হই, পুলিনের হাত ধরে উঠে বল্‌লাম, "চল দেখে আসি কি রকম Interesting চেহারা।" সবে মাত্র পরশু সে বেডটার জানকারার মা বুড়ীকে তার কাল শুক্‌নো হাত পা মেলে শনের মত সাদা চুলগুলো নেড়ে বাবুদের শত মুখে গাল দিতে দেখেছি; মাঝে একটা দিন মাত্র খাট-খানা খালি পড়েছিল। কিন্তু এই একদিনের মধ্যেই যে কাঁটাবনে এসব গোলাপ ফুটে উঠ্‌বে তাত কল্পনাও করিনি। পুলিনের চোখ-জোড়া চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক্। রূপ যে কাকে বলে সে তা চেনে বটে।

মেয়েটি তখন ঘুমোচ্ছিল। শুধু তার মুখখানি আর হাত দুখানি পাড় ছেঁড়া লাল টুকটুকে একটা শালের তলা দিয়ে বেরিয়েছিল। বয়স তার কত হবে জানিনা; কুড়ি একুশ হতে পারে। সাতাশ আটাশও হতে পারে। সেরকম রূপ বয়সের সঙ্গে বড় বদ্‌লায় না। বাঙালীর ঘরের মেয়ের ভাসা ভাসা চোখ, ফোলা ফোলা গাল, চাপা নাক আর ছোটখাট গোলগাল গড়নের মধ্যে এক রকম রূপ দেখা যায়, তা দেখ্‌লে ষোল বছরে বলা চলে, "আহা, কেমন কচি কচি নরম সরম চেহারাটি" কিন্তু ছাব্বিশ বছরে তার কচিত্বটা ঘুচে গিয়ে কেবল নির্ব্বুদ্ধিতাটা বয়সের মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে যুক্ত ঘোষণা করে, গোলগাল গড়নটা ক্রমে ক্রমে বেড়ে তার ধৈর্য্যটা একবারে ঢেকে ফেলে। এ সেরকম রূপ নয়। ষোল বছর বয়সে এর কচি মুখের তারিফ খুব সম্ভব কেউ করেনি, বরং চোখা নাকের আর রোগা চ্যাঙা গড়নের

সমালোচনাই করতে তাকে অনেকবার শুনতে হয়েছে। তা হতেই পারে, কারণ অমন রাফেলীয় মত রঙ নিখুঁত করে আগাগোড়া গড়ে তুলতে বিশ্বকর্মারও সময় লাগে।

তাকে আমি গোলাপ বলে ভুল করেছিলাম; গোলাপের মত ফোটার সঙ্গেই করার শুরু এমন রূপে হয় না। রজনীগন্ধা বললে ঠিক বলা হয় না, কারণ সে শতদল পদ্মের মত চোখের সবটা দৃষ্টি কেড়ে নেয়, রজনীগন্ধার মত ছোট এতটুকু নয়। কিন্তু রজনীগন্ধা যেমন ফুটে উঠতে উঠতেই ঝরে পড়ে না, একেবারে শুকিয়ে শেষ হয়, এও তেমনি। কি যে কতগুলো বকলাম জানি না, কিন্তু সে ভুবনমোহিনী রূপের বর্ণনা করতে পারি নি।

সে ঘুমোচ্ছিল, কাজেই হাঁ করে সেখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়! তখনকার মত বিদায় নিলাম। কিন্তু নূতন রোগীর রোগের ইতিহাসটা আমাকেই লিখতে হবে, সুতরাং নার্সকে বলে রাখবার সময় হলেই আমায় যেন ডাকে। নার্সের ডাকে খানিক পরে এসে দেখি মেয়েটি উঠে বসেছে। তার পরনে একটা মলিন সরু কালপেড়ে ধুতি, হাতে কেবল দুগাছা লাল কলি। আমাকে দেখে সে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিল। কিন্তু ভয়ে জুজুবুড়ীর মত জড়সড় হয়ে মোটেই বসল না। আমি বললাম, "কেমন আছেন আপনি এখন?" তুমি বলতে আটকে গেল। সে বললে, "ভাল থাকলে কি আর তোমাদের আলাতে আসি বাবা!"

পুলিন বললে, "কি রকম কষ্টটা হচ্ছে আপনার?" সে বললে, "ক মাস ধরেই ত বুকে ব্যথা, হাত পা জ্বালা, কাশি চব্বিশ ঘণ্টা লেগে আছে। তা দেখলে কে বিশ্বাস করবে? ধর্মের অরুচি, মানুষের মুখে একটা 'আহা' শোনবার ভাগ্য নিয়েও জন্মাই নি।"

মনে মনে ভাবলাম 'আহা' বলতে মানুষের মনে থাকলে ত? বাইরে বললাম, "আচ্ছা, আপনার historyটা বলুন ত দেখি, কি ব্যবস্থা করা যায়। কোনো কথা লুকোবেন না কিন্তু।" সে বিস্মিত হয়ে বললে, "আমার history! তা দিয়ে কি হবে বাবা?"

আমি বললাম, "হাসপাতালের এই রকম নিয়ম।" সে বললে, "যে আসে তাকেই সব কথা বলতে হয়? কিন্তু অভাগীর সে যে বড় দুঃখের কথা, বাবা!" বুঝেছিলাম আমার কথার মানে সে ভুল বুঝেছে। পুলিন তাড়াতাড়ি সংশোধন করে দিতে ব্যস্ত হয়ে বললে, "লজ্জা কি? রোগ—"

সুন্দরীর ইতিহাসটা শোনবার খুবই ইচ্ছা ছিল। সুযোগ এমন সেধে উপস্থিত; পুলিনের রসবোধের অভাব দেখে বড়ই রাগ হল। তাকে এক ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আমরা আপনার ভাল বই মন্দ ত কিছু করব না—" আরো দুচার কথা জানিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, মেয়েটি তার অপেক্ষা না রেখেই বললে, "যাবার আগে পোড়া চোখের শেষ কান্নাটা তার পায়ে ত কেঁদে যেতে পেলাম না। তোমায় 'বাবা' বলেছি, তুমিই জান। কিন্তু পরিচয়টা না দিলে কি কিছু অপরাধ হবে বাবা?"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "কিছুই না।"

২

মেয়েটি বললে, "আজ কতদিন ওসব চিন্তা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তুমি আজ শুনতে চাইছ, তাই যেন সেসব দিনের কথা বহুকণা নদীর মত চোখ ঘুম ছাপিয়ে উঠতে চাইছে। এত দিনের পর যে কান্না বাইরে বেরোবার পথ পেয়েছে তাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।

বড়লোক জমিদারের ঘরেই জন্মেছিলাম। বাপ মায়ের এক মেয়ে, ঠাকুর্দাদা ঠাকুমার একমাত্র নাতনী আদরের দুলালী; কত সাধ আহ্লাদ, কত আদর আব্দার যে পেয়েছি তা গুণে বলা যায় না। বাড়ীতে ছেলে ছিল না, কিন্তু ঠাকুর্দার সখ ছিল রকম রকমের। গান বাজনা লেখাপড়া ত করেই ছিলাম, মেয়েমানুষ হয়ে ঘোড়ায় চড়াও বাদ যায়নি।

দশ বছর বয়সেই লম্বা হয়ে উঠেছিলাম, জমীদারের নাতনী বলে কেউ মুখ ফুটে কিছু বলত না; কিন্তু আমার ডানপিটে চাল চলনে সবাই মুখ টিপিয়ে অল্পত একটু হেসে নিত। মেয়েমানুষের গাড়ী হাঁকানো, ঘোড়ায় চড়া, কাছারী বাড়ীতে অষ্টপ্রহর আনাগোনা এ সব পাড়াগাঁয়ের মানুষের চোখে ঠেকবেই ত। ঠাকুমা মেয়েমানুষ, লোকে যে আমার রকম সকম ভাল নজরে দেখে না তা চটকরেই বুঝে নিলেন। বল্লেন, "মেয়ে বড় হচ্ছে, আর ওসব ঘিন্সিপানা মানায় না, শিকেরীকে দিতে হয় সহর থেকে একটা মেম এনে রাখ, অন্দরেই সব শিখবে এখন। পন্টন ও আর হবে না যে অত ঘোড়া হাতী নিয়ে নাড়ানাড়ি।

ঠাকুর্দার ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। হাজার টাকা খরচ করে ঘোড়া কিনেছিলেন; বাঁধা মাইনে দিয়ে বিষ্ণুপুর থেকে ওস্তাদ এনেছিলেন; ইস্কুলের সঙ্গে আড়াআড়ি করে বেশী টাকা কবুল করে তাদের নূতন এম্. এ মাষ্টারকে ছাড়িয়ে এনে বাড়ীতে বসিয়েছিলেন; সব কি ভণ্ডে যাবে? সাত বছর একলা কাছারী যান নি, আজ আমার বাড়ীতে রেখে যেতে তাঁর চোখে জল ভরে এল। কিন্তু ঠাকুমার কথা ঠেলতে তিনি কোনো দিনই পারেন নি; সেদিনও পারলেন না। আমার অন্দরেই বন্দী হতে হল। ঠাকুর্দার দিনরাত আর কাটতে চাইত না। পুরুষমানুষ অন্দরে অষ্টপ্রহর ত আর বসে থাকতে পারেন না, কিন্তু সময় তাঁর এমনি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল যে তিনি আর সেদিকে মুখ ফেরাতে চাইতেন না। তাঁকে মনমরা দেখে ঠাকুমাই উপায় বাৎলে দিলেন। বল্লেন, "এক কাজ কর, নাতনীর বিয়ে দিয়ে একটি জামাই নিয়ে এস। হাতে করে মানুষ কর তাকে। পুরুষ বাচ্চা সে। টাকা যদি ঢালতেই হয়, সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ যদি গড়ে তুলতেই হয় তবে তার পিছনেই চাল, তাকে গড়ে তোল, সব সার্থক হবে। মেয়েও সুখে থাকবে।" ঠাকুর্দা বল্লেন, "মেয়ে যে এখনও বড় কচি।" ঠাকুমা বল্লেন, "হলেই বা, কচি আছে কচির মত থাকবে, তোমার জামাই আনা নিয়ে কথা, জামাই আনো।"

তাই হল। ঠাকুর্দার নূতন এক কাজ হল। দিকে দিকে লোক ছুটল ছেলে খুঁজতে। রূপ আছে ত গুণ নেই, গুণ আছে ত কুল নেই, বাছাই করতেই মাস দুই কেটে গেল। দুহাতে ওই দুমাসে বোধহয় ঠাকুর্দা দুশ' ছেলে ঠেলে তাঁর নাতজামাই খুঁজে বের করেছিলেন! [illegible] অহরী না তিনি ছিলেন? মানুষ চিনে বার করতে তাঁর ভুল হয় নি; তবে আমি তখন বুঝি নি।

খুবই অল্প বয়স তাঁর। চোখ কি পনের ষোল বড় জোর। সবই ভাল ছিল; তবে বাইরে তত চেকনাই ছিল না বটে। রং শ্যামবর্ণ, আর দেখলে হঠাৎ মনে হত লম্বে বুঝি আমার চেয়েও ছোট হবেন। ভারি মুখ-চোরা ছিলেন, কখনও মুখ তুলে কথা কইতেন না। তাঁর মুখের মিষ্টি হাসি দেখে ঠাকুমার আর স্বয়ং কার্তিককেও বোধহয় মনে লাগল না।

দিন ঠিক হল। একমাস আগে থেকেই বাড়ীতে মহরৎ বসেছিল। দেশবিদেশ থেকে হালুইকর-বসুয়ে বামুন নিত্যি আসত। গাঁয়ে যেন কুম্ভমেলা লেগেছিল। দিনে হাতে মানুষের আর রাত্রে কোনোদিকে কান পাতবার জো ছিল না। অতবড় যে রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী তাতেও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে পেতাম না। আর খোঁজবারই বা কি ছাই আমার অবসর ছিল! সারাক্ষণই ওজনা আর কাপড়ের মাপ দিচ্ছি; তার উপর ঠাকুমার হুকুম ছিল একটী কুটোও যেন আমার অপচ্ছন্দে না রাখা হয়। ওই তখন বছরের মেয়ে আমি, পছন্দ যে কি তাই জানতাম না; সাত রাজ্যের কোনো জিনিষ আমার চোখ এড়িয়ে ঘরে ঢুকবার জো ছিল না। ছিলাম ভাল, পড়াশুনো সব চুলোয় দিয়ে অন্দরে মীনাবাজার বসিয়ে দশ বছরের রাণী মনের সাধে রাজত্বি করে নিয়েছিলাম।

তারপর বিয়ে হল চন্দন চেলী জরী জড়োয়ার আগা পোড়া ছেবে কি যেমাক যে সেদিন হয়েছিল, বাঘমামাদাদীরও কখনও অমন হয়েছিল কি না কে জানে? কিন্তু সেই রাত পোহাতেই মর্মান্তিক দেখা গেলাম। বুঝলাম একলাই [redacted] এত ঘটা করে যাকে নিয়ে এলাম, সেই আমার রাজত্বের সব চেয়ে বড় ভাগীদার। নিয়ে এলাম বলছি বলে ভেবো না, ঠাকুমাদার আহ্লাদে ওরকম মনে করতে আমার কিছু বিচিত্র হয় নি। তার সব আসবাবের মতই আমারই একটা খেলাঘরের খেলনা আমি নিজে হাতে এনেছি বলেই বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত ভেবেছিলাম। কিন্তু মায়ের কথায় মাসির কথায় ঠাকুমার কথায় যে ইঙ্গিত তার পরদিন থেকে পেতে সুরু করলাম, তাতে বুঝলাম খেলাঘরের আসবাব আমার ত সে নয়ই বরং আসবাব যদি কারুর কখনও হতে হয় ত আমাকেই হবে। হিন্দুর মেয়ে আমি, তবু রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। ঠাকুমার কাছে গিয়ে লাগালাম, "কেন ওই অতটুকু ছেলেটা আমার সবচাতে ভাগ বসাবে, কেন মা আমায় ওর এঁটো খাওয়াবে, কেন ওকে আমি অত মাজি করতে গেলাম, কেন, কেন?" ঠাকুর্দাদা মাথায় হাত দিয়ে চুলের উপর চুমু দিয়ে বল্লেন, "ও ত যে সে নয় ভাই, ওই যে তোমার সাত জন্মের তপস্যায় পাওয়া শিব। ওকে মাজি করেই তুমি ধন্য হবে।"

বাটকা দিয়ে হাত ছিনিয়ে নিয়ে রাগে গরগর করতে করতে সেখান থেকে চলে গেলাম। ঘরের মেঝের পড়ে কাঁদলাম। এর চেয়ে বড় অপমান আর আমার কি আছে? নালিশ শোনবারও আজ আমার কেউ নেই। সাত জন্মের তপস্যায় পাওয়া শিব যে কাকে বলে তা বোঝবার বয়সও আমার হয় নি, তোমরা বিশ্বাস করবে না কিন্তু [redacted] সে কথা বোঝবার আগে আমার গড়া হয় নি। কিন্তু বুঝেছিলাম এ শিব আর যাই হোক আমার চেয়ে অনেক বড় একটা কিছু। রোগা কালো ছেলেটা,

আমার সঙ্গে কথা কইতেও যার ভরসা হয় না সে হল আমার শিব? তারে দশা! কথাগুলো মনে আসি ওকে এতটুকু মাস্তি করি। দেখি ঠাকুমার শিব আমাকে কি করতে পারে?

তাঁর আলাদা ঘর, আলাদা আসবাব, লোকজন সবই ছিল, আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ কিছু সম্পর্ক ছিল না। আমি থাকতাম অন্দরে মা মাসির রাজ্যে দাসী বাঁদী নিয়ে, তিনি থাকতেন সদরে মাষ্টার পণ্ডিত ওস্তাদের মেলায় তাঁর শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে। কিন্তু তবু আমার যাতে আর অধিকার নেই তাই নিয়ে তাঁর এ গৌরব আমার ভাল লাগত না। আমি সারাক্ষণ ছল ছুতো খুঁজে বেড়াতাম কিসে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধান যায়। দেখতাম উনি আমাকে বেশ ভয় পেয়ে এড়িয়ে চলতেন। তাতে খুসীই হতাম; মা মাসি স্বীকার করুন আর নাই করুন, তাঁদের মাথার মণি যে আমার চেয়ে এক জায়গায় ছোট সে নিজেই যে তা স্বীকার করেছে। কিন্তু এ কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার অবসর পেতাম না বলে দুঃখও হত।"

এতকথা বলবার কিন্তু দরকার নেই জানি; কিন্তু বলতে যখন বসেছি তখন মনটা আজ ধুয়ে মুছে খালি করে ফেলব। একলা এ বোঝা আর বইতে পারছি না। যাক্, বেশী দিন দেবতার সঙ্গে রেষারেষি করার পাপ কপালে লেখা ছিল না। বাবার সখ ঠাকুমার চেয়েও বেশী ছিল, তিনি ঠাকুমাকে বল্লেন, "আমাইকে বিলেত পাঠাতে বল বাবাকে।" ঠাকুমা বল্লেন, "কি হবে দুধের ছেলেকে বনবাস দিয়ে? তোমার ত আর সাতটা পাঁচটা নেই যে করে খেতে হবে। ঘরের ছেলে ঘরে তোমরের কোল জুড়ে বেঁচে থাক্ তাহলেই আমার ঢের হবে।"

বাবা বল্লেন, "মানুষ কি পৃথিবীতে কেবল কোল জুড়ে বসে খাবার জন্যে আসে? ওর বাপ মা নেই, আমাদেরই ওর সব সাধ মিটোতে হবে। ভগবান ওকে বুদ্ধি দিয়েছেন, তার উপযুক্ত কাজ ত করা চাই।" ঠাকুমা বাবার কথাতেই সায় দিলেন। একবছরেই তিনি বাড়ীর সাথ সাথালীর মন কেড়ে নিয়েছিলেন। আমি রাগে মনে খিল দিয়ে বসেছিলাম তাই কেবল সেখানে ঢুকবার পথ পান নি। চলে গেলেন সবাইকে কেঁদে। কদিন ধরে সমস্ত বাড়ীটা যেন চাপা কান্নায় থম্‌থম্ করছিল। তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিতে যাবার আগে পর্য্যন্ত যাত্রার সে কি কোলাহল! তারপর সেই গাড়ীটা ছেড়ে দিল, আর আমরা গোমস্তা দাস দাসী থেকে সুরু করে যে যেখানে ছিল সবাই যে সেই মুখ বুজে চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে নামিয়ে নিলে এক হপ্তার মধ্যে বোধহয় কেউ কারুর মুখের দিকে তাকায় নি। চোখে চোখ পড়লেই আমার বুক যেন চোখে বাঁপ ডাকতে চাইত। বাড়ী ফিরে এসে ঠাকুমা আমায় কোলের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। তাগীদার চলে গেল বটে, কিন্তু ঠাকুমার মুখের দিকে চেয়ে সেদিন খুসী হতে পারিনি।

(৩)

দিন কাটতে লাগল। তাঁর সুখের জন্যেই এ বিচ্ছেদের দুঃখ, কাজেই বেশী দিন আর মুখ ভাঁধার করে কেউ রইল না। তিনি বিলেত গিয়েছেন, তাই আমাকে তাঁর উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার জন্যে আবার নানা আয়োজন সুরু হল। আমার জন্যে আবার এত ঘটা দেখে প্রথম প্রথম খুসী হয়ে অনেক কিছুতেই হাত দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার মনটা ছিল দুরন্ত আরব ঘোড়ার মত। তপস্যা করার

মত মন নিয়ে তৈরী হইনি। কেবল অষ্টপ্রহর ধরা বাঁধা নিয়ম করে দিনটাকে যেন ধারালো ছুরি দিয়ে সমান সমান ভাগ করে আমার তার খোপে খোপে সারাক্ষণ সবাই কাজে লাগিয়ে নিয়ে বেড়াত। ইচ্ছে করত কিই সব খাতা কলম বই বাজনা ছিন্ন ভিন্ন করে দিকে দিকে ছড়িয়ে। এই একান্ত শান্ত জীবনযাত্রার পথটাকে উড়ে পার হয়ে যেতে মন চাইত। মনে হত সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে ছুটে বেরতে পারলেই সেই অজানার বুকে সাগরের ঢেউয়ের মত আনন্দে অনন্তকাল দোল খাব। কি যে সে আনন্দ, কোথায় যে তার ধাম তা জানতাম কিন্তু জপতপের সঙ্গে তার যে কোনো সম্পর্ক নেই, ধ্যানধারণা, যে তার কোনোকালের পথ নয় তা যেন সমস্ত দেহ মনের শিরায় শিরায় অনুভব করতাম।

তখন বড় হয়ে উঠেছি। যদিও আমার কাজ-কর্মের সব নিয়মই বাঁধা ছিল, তবু আমার খেয়াল যখন হল তখন সে সব নিয়ম ছিঁড়ে ফেলতে আমার বিশেষ বাধেনি। ঠাকুমাকে গিয়ে বললাম, "আমার ও সব আর ভাল লাগছে না, ঠাকুমা, তুমি ওদের বিদায় করে দাও, আমি আর কিছু শিখতে চাই না।"

ঠাকুমা আমার গলা জড়িয়ে গাল টিপে দিয়ে বলেন, "আর দুদিন সবুর কর ভাই, সবই ভাল লাগবে। উমার তপস্যা না হলে কি শিবের দেখা মেলে?" আমার কেবল শিব আর শিব! ছেলে-বেলা থেকেই ওই কথাগুলো চক্ষুশূল দেখতে পারতাম না। তখন কথা ঘুরিয়ে বলতে শিখেছিলাম, তাই মনের কথাটা না বলে বললাম, "আহা, এই ত বুড়ো শিব আমার হাতের মুঠোয় রয়েছে, আবার কোন্ ভাগ্যবানের জন্য তপস্যা করতে যাব। না, তোমায় ওদের বিদায় করতেই হবে, আমি ওসব বাজে কথা শুনব না।"

মায়ের কানে কথাটা উঠতেই মা বলেন, "হ্যাঁ, ওই ধিঙ্গি মেয়ে শুধু শুধু ঘরে বসে থাকলেই হয়েছে আর কি? না, না, ওসব হবে না, এই বয়সে অমন ষাড়া হাত পা নিয়ে বসে থাকতে নেই। কাজ না থাকলেই অকাজের সৃষ্টি করবে।"

আমি বললাম, "বেশ করবো অকাজই করবো। তোমরা সবাই মিলে কি কাজ করছ শুনি?"

মা বলেন, "তাই যদি তুই বুঝবি, তবে আর আমার এত ভাবনা কিসের। তোরাই আমার কাজ, তোরাই আমার জপতপ, তোরাই আমার মন জুড়ে আছিস; আমার আর কিছু ভাববার অবসর থাকলে ত!"

কিন্তু মায়ের কথা শোনে কে? তার পর থেকে আজ আমার মাথা ধরে, কাল আমার ঘুম পায়, পরশু আমার পেট কামড়ায়; কিছু না হয়ত সব ভুলে যাই। আমায় নিয়ে যাদের কারবার ছিল, তারা আলাতন হয়ে দিনে দশবার ঠাকুমার কাছে লাগাতেই যেত। ঠাকুমা বুঝলেন, মেয়ে কিছু করবে না বলেছে যখন তখন করবেই না। একে একে সবাইকে বিদায় দিতে হল।

সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কিছুদিন বেশ ছিলাম। কখনও বিছানায় গড়িয়ে কখনও পাড়া বেড়িয়ে কখনও দাস দাসীকে বকে ঝকে কখনও বা মা ঠাকুমার সঙ্গে ঝগড়া করে দিন কাটাতাম। একটা ঝি ছিল সে থিয়েটারে কাজ করেছিল। তার যত সখের গান আর হাতনাড়া মুখনাড়া বেশী,

লাগত। সময়ও অনেকটা কাটত। তার কাজ ছিল আমার খোসামোদ করা। সবাই যখন গাল খেয়ে রাগ করত, সে তখন হেসে গড়িয়ে বলত, "দিদিমণি, ধন্যি তোমার বিশ্বকর্মা গড়েছিলেন বাবু, মার দর গাল দেও সবই যেন এক এক রঙের খেলা।" যাক্, সে সব বাজে কথায় কাজ নেই, কিন্তু সে যে কেমন করে আমার মাথাটি খেত তা এখন বুঝি; তখন ভাবতাম সত্যিই বুঝি আমি সাক্ষাৎ তিলোত্তমা। কিন্তু অমন করে আমার মত দুর্দান্ত মেয়ের দিন আর কত কাল কাটবে? নূতন একটা খেলার আশায় আবার মনটা ছটফট করতে লাগল।

সেই সময় মা পড়লেন অসুখে। শয্যা যে নিলেন ও আর ওঠবার আশা রইল না। সবাই বলে, যে রকম অবস্থা তাতে সর্বদা ডাক্তার কাছে থাকা দরকার। কাজেই কলকাতা থেকে এক ডাক্তার আনিয়ে রাখবার কথা হল। নূতন পাশকরা ডাক্তার ছাড়া কে আর পাড়া-গাঁয়ে গিয়ে ক'টাকা বাঁধা মাইনের মুখ চেয়ে বসে থাকবে? যিনি এলেন তিনি সবে সেই বছরই কলেজ থেকে বেরিয়েছেন। অনেকে মেয়ে ডাক্তার এনে রাখবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু যাঁরা ভাল পাশকরা মেয়ে তাঁরা পরের বাড়ী গিয়ে থাকতে চান না; যাঁরা ক্যাম্বেলে পাশ, ঠাকুমার তাঁদের ঘরে এনে রাখতে মন উঠল না।

আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না, তার উপর মায়ের অসুখ তাই সর্বদাই মায়ের ঘরে যাওয়া আসা করতুম। ডাক্তারি ব্যাপার ত আগে দেখবার অভ্যাস ছিল না, এ নূতন খেলাটা মন্দ লাগল না। ডাক্তার কি করে না করে সব মন দিয়ে দেখে দেখে দুদিনে সব কাজে আমি এমন হাত করে নিলাম যে ডাক্তার মহাখুশী। সব কাজেই তার আমাকে না হলে চলত না। যি ব্যাণ্ডেজ খুলে ডাক্তার অমনি বলত, "দিদিমণিকে ডাক।" সেঁক দিতে হলে বলত, "দিদিমণি না হলে একলা করি কি করে!" আমি এমন মহামূল্য হয়ে উঠে কাজগুলোও করতে সুরু করেছিলাম। একদিন ডাক্তার বললে, "নার্সগুলো যে এতকাল ধরে কাজ শিখছে, তাও আপনার মত পারে না। পারবে কোথা থেকে? অমন দুখানি স্বর্ণকলির স্পর্শেই যে কাজ সোণা হয়ে ওঠে।"

ছিপছিপে মুখে আমার রূপের বর্ণনা অনেক শুনেছিলাম, ও কথাটায় নতুন করে খুসী হবার আমার কিছু ছিল না, কিন্তু কি আর ডাক্তার যে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ! কথাটা কাণে যেতেই সমস্ত মুখ চোখ আমার রাঙা হয়ে উঠল, মনে হল গায়ে যেন কে হিংএর ছুঁচ ফুটিয়ে দিলে। ইচ্ছে করছিল তখনই ঘর থেকে ছুটে চলে যাই। কিন্তু তাহলে যে কথাটা গায়ে মেখেছি বোঝা যাবে। হার মানতে রাজি হলাম না। লজ্জায় ঘাড়টা হেঁট হয়ে গিয়েছিল তবু মুখটা তুলে বললাম, "কথার ব্যবসা করতে কি ঘর ছেড়ে এতদূরে এসেছেন?" তার চেয়ে শক্ত কথা কেন জানিনা মুখ থেকে বেরোল না। রাগ খুবই হয়েছিল, কিন্তু সেখানে একখানা নাটুকে বগড়া বাধাবার অবসরও ছিল না। মা সবে ঘুমিয়েছিলেন, আমাদের কথার শব্দে জেগে গেলেন, কাজেই কাজে লাগতে হল। এমন হাসিমুখে আবার সুরু করলাম যেন কিছুই হয় নি। ডাক্তারের মুখখানা আমার কথায় একটু যেন ফ্যাকাশে হয়ে এসেছিল। কিন্তু আমার ব্যবহারে দেখতে দেখতে সে সামলে নিলে।

তারপর পাঁচ সাত দিন আর মায়ের ঘরে ডাক্তার থাকলে যেতাম না। যখনই ডাক আসত, তখনই কাজের সৃষ্টি করে বসে থাকতাম, ডাকও দেখতাম আগের মত জোর তলব নয়। না গেলে 'চলবেই না' যত্নে

দ্বিতীয়বার আর কেউ আসত না। তারী ইচ্ছে করত কিন্তু জানতে লোকটার সত্যি অসুবিধা হচ্ছে কিনা। যার মন অমন চপল, তার যে কেমন করে চলা উচিত তা এখন বুঝলেও তখন জানতাম না, তাই একদিন গেলাম উঁকি মেরে দেখতে। সেদিন সে ডাকতে লোকও পাঠায় নি। তাই বোধ হয় রাগও হয়েছিল তার উপর। অমন মন না হলে আর এমন পোড়া-কপাল হবে কেন বল? দেখলাম ডাক্তার বেশ একলা হাতেই সুন্দর করে সমস্ত কাজ শেষ করলে, কি দুটো কেবল হাঁ করে মায়ের খাটের পায়ার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বুঝলাম ইচ্ছা করলে কাউকে না বলেও তার কাজ আটকায় না। ওর থেকে বার হবার উপক্রম করছে দেখেই সরে দাঁড়াতে গেলুম, কিন্তু পায়ের ঠোক্করে পাশের চৌকিখানা ক্যাঁচ করে উঠল। আমায় দু পা যাবার অবসরও না দিয়ে ডাক্তার একেবারে হুমড়ি খেয়ে আমার পায়ের উপর এসে পড়ল; পায়ে ধরে বললে, "দিদিমণি, যদি অপরাধ করে থাকি ক্ষমা করবেন। আপনি আমায় কি মনে করেছেন সেই ভাবনায় আমার এক'দিন রাত্রে ঘুমই হয়নি। বলুন আমায় ক্ষমা করেছেন।"

তার কাণ্ড দেখে এমন ভড়কে গিয়েছিলাম যে "করেছি" না বলে রক্ষা পেলাম না। সে চলে গেল, আর মনটা আমার কেবলি বলতে লাগল, "আহা মানুষটা ত ভাল।" হায়! তখন কি পৃথিবীটা চিনতাম? নিজের দর্পে নিজেকে ছাড়া কিছুর কথা ভেবেও কখনও দেখিনি। পরদিন থেকে সে আমায় ডাক পাঠাতে সুরু করলে। একদিন না গেলে পরদিন তার অভিমানের পালা পড়ে যেত।—"আমার কি অধিকার আছে যে তার জোরে আপনাকে নিয়ে আসব? আপনাদের মাইনে করা চাকর বই ত আর কিছু নই।"—"দয়া করে যে আজ এসেছেন সেই আমার পরম ভাগ্য বলে মানি; না এলে আমার বলবার কি সাধ্যি আছে?" এই সব কত কি যে সে বলত তার ঠিক নেই। অত দীন যে সাজতে, সেযে তার মান ভাঙিয়ে তার কাজ না করে দিয়ে পারতাম না।

কবে যে তার সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেল, তা টেরও পাই নি। আমার সঙ্গে আমার অভিমানের তার শেষ ছিল না; আপনি বলা ছেড়ে চট্ করে সে যখন 'তুমি' বলতে সুরু করল তখন তার সঙ্গে এতখানি মেলামেশিও করে ফেলেছিলুম যে ওই নিয়ে চোখ পাকিয়ে দাবড়ি দেওয়া তখন নিতান্ত ন্যাকামির মত দেখায়।

৪

এমন সময় উনি আসবেন শোনা গেল। আট বৎসর পরে ঘরে ফিরছেন, বাড়ীতে যেন আনন্দের বাণ ডেকে গেল। শ্বশুরবাড়ী বলতে আমার ত কিছু বিশেষ ছিল না, কাজেই যত কিছু উৎসব আয়োজনের ঘটা তা আমাদের বাড়ীতেই সুরু হল। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় দু-চারদিনের ঝগড়ার সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক ত আমার হয়নি, বলতে গেলে সত্যিকারের কোনো পরিচয়ই হয় নি, কাজেই এতদিন পরে সেদিন যেন আমার আসল বিয়ের লগ্ন লেগে গেল।

আজ মনে পড়ছে তাঁর সেই আনন্দে উজ্জ্বল লজ্জায় রক্তিম হাসিমাখা সুন্দর মুখখানা। সে মুখের যে রূপ তা চিনুবারও সাধনা চাই। পথে ঘাটে যে হাজারে সেই যদি তা দেখতে পেত তবে তার মূল্য কি? কল্পনার রাগ ত মাটিতে আঁচড় কাটলেও ওঠে কিন্তু সোণার রং ওঠে কেবল কষ্টি পাথরের বুকে। বাড়ীতে

সে যেখানে ছিল, সবাই যেমন তাঁকে একদিন চোখের জলে বিদায় দিতে গিয়েছিল, তেমনি সবাই আজকে আবার তাঁকে আদরে যত্নে বরণ করে নিতে এগিয়ে চলল। আমিও গিয়েছিলাম; এগার বছরের খুদে মেয়ের চোখে পনের বছরের তার জাদিদারকে কেমন লেগেছিল, সেকথা তখনকার মত ভুলে গিয়েছিলাম। অন্য কিছু দেখবার আশাতেই সেদিন অস্পষ্ট অতীতকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম। গাড়ী এসে যখন দাঁড়াল তখন আমার সমস্ত অন্তর বাহির যেন চোখের দৃষ্টি হয়ে সবার আগে ছুটে এগিয়ে যেতে চাইছিল। তিনি নামলেন। তিনি আমায় ঠিক চিনেছিলেন; সবার আগে তাঁর দৃষ্টি এসে পড়ল আমার চোখের উপর। এক মুহূর্ত্তের জন্য সব ভুলে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল জগতে এ দৃষ্টির উৎস খুঁজে বের করে কার সাধ্য! তার চেয়ে এ জন্মে খুঁজে পাব না। এ যেন মহাসাগরের মধ্যবিন্দু থেকে উঠে এসেছে কিন্তু আকাশের ছায়া কি পাহাড়ে ঝরণার চপল কোলে কখনও দাঁড়ায়? অতবড় একটা বিরাট মেলার মধ্যে আর যে তৃতীয় মানুষ কেউ ছিল তা এইক্ষণ মনে ছিল না। কিন্তু লোকজনের আনন্দ কোলাহলে মাটীর পৃথিবী তার সমস্ত ধূলো মাটী নিয়ে আমার চোখে ফিরে আসতে দেরী করল না।

একদল লোক ছুটে দরজার কাছে এগিয়ে গেল—আমাদের জ্ঞাতি গুষ্টি কুটুম্ব আশ্রিত যে যেখানে ছিল। জমিদার বাড়ীর চাঁদের হাটের মধ্যে তাকে যে কি বেদানান ঠেকল তা কি বলব? আট বছরের পুরাণো স্মৃতি তেমনি পরিষ্কাররূপে আবার ফিরে এল। এ ত সেই, আর ত কেউ নয় কি করে এতক্ষণ সে কথা ভুলে ছিলাম। রাজ্যিশুদ্ধ লোকের মধ্যে আমার মাথার যদি বলে যাকে ভুল করা হয়েছে তার রূপ দেখে আমার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গেল। ডাক্তার তার হাত ধরে সামনে টেনে আনছিল। আমার দিদিমা বিয়ের সময় আসে নি, আজ নাতজামাই দেখতে এসেছিলেন। আমার মুখখানা হেঁট দেখে দুই হাতে তুলে ধরে বললেন, "দিদি, চোখ তোল্, কার্ত্তিকঠাকুরকে দেখে জন্ম সার্থক কর্, আহা, কি রূপ! বিশ্বকর্ম্মার হাঁচে এমন আর হয় নি।"

থিয়েটারের সেই কিটা জিভ কেটে বললে, "দিদিমা গো! ও কি কথা বললে? সোণার কার্ত্তিকটি ত ডাক্তার, লোহার কার্ত্তিকটি তোমার নাতজামাই।" কিটার আস্পর্দ্ধার সীমা ছিল না। দিদিমার ঠেলার মুখ তুলে দেখলাম ডাক্তার মুখ টিপে হেসে চলে গেল।

অন্ধ চোখ নিয়ে যে সংসার সুরু করলাম, পদে পদেই তাতে ভুল হতে লাগল। মানুষের দৃষ্টি-বিভ্রম হলে সে যে শুধু হীরেকে কাচ ভাবে তা নয়, কাচকেও হীরা বলে ভুল করে। তাই মনে হয় তাঁরও চোখের ভুল হয়েছিল; নইলে আমি যে ভুলটা করলাম, তিনি ঠিক তার উল্টোটা করলেন কি করে? কিন্তু তার জন্যেও ভগবানকে ধন্যবাদ দি। সেদিন যদি তিনি আমাকে চিন্‌তেন তাহলে তাঁকে চেন্‌বার উপায় আর আমার কোথাও মিলত না। আমি যত অপরাধ করেছি সব তিনি ক্ষমা করেছিলেন বললে কম বলা হয়। আমার অপরাধ তিনি কোনো দিন যে দেখতে পেয়েছিলেন বলেও ত আজ মনে হচ্ছে না। অপরাধ খুঁজে বেড়াবার তাঁর অবসরও ছিল না। তাঁর অতলস্পর্শ অন্তরে ওসব আবর্জ্জনার ছায়া কখন পড়ত না।

উনি আসবার কিছু দিন আগে ডাক্তারের কাছে স্বাস্থ্যতত্ত্ব পড়তে সুরু করেছিলাম। পড়াতে আমার আগ্রহ কতটা ছিল তা না বলাই ভালো, তবে পড়ানোতে তার এতটা আগ্রহ ছিল যাতে আমার ভাগটা

অনায়াসে বাধা দিলেও পড়ার ক্ষতি হবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। উনি আমাতে সংসারের ব্যবস্থা সব যখন ওলোট পালোট হয়ে গেল, তখন ঠাকুমা বলেন, "থাকগে দাদা, তোর আর ওসব বিবিয়ানায় কাজ নেই। এখন তোর সবার সেরা কাজই ত জুটে গেছে আর ভাবনা কি? কারুর কথা মাথা পেতে নেওয়া আমার স্বভাব ছিল না: আমি বল্লাম, "হাঁ, কি এমন কাজ জুটেছে যার জন্যে বিদ্যাশিক্ষাও ভুলে বসে থাকতে হবে?" ঠাকুমা বল্লেন, "আহা কি আমার সরস্বতী রে, বুড়ো যখন রাশ রাশ টাকা ঢেলে রাজ্যির লোক এনে ঠাকরুণের পাঠশালা বসালে তখন ও বুদ্ধিটা ছিল কোথায়?" মনে মনে হার মানলেও জোর করে পড়া ছাড়লাম না।

সেদিন বৈশাখের শুক্লা দ্বাদশী। বারান্দার বসে টবের বেলফুলের উপর জোৎস্নার খেলা দেখছিলাম। কি এসে বলে গেল, "ডাক্তারবাবু এসেছেন।" উঠতে ছুড়েমি লাগছিল, যাই যাই করেও তখন বসে আছি, এমন সময় দেখলাম উনি নিয়ে আঁচলে একরাশ বকুল ফুল নিয়ে উনি বাগানের পথে আসছেন। উনি বারান্দায় উঠে বল্লেন, "তোমার মাস্টারের মাসীকে এসেছে।" আমি বল্লাম, "কিন্তু আমার যে এখন অবসর নেই, আমি পড়তে যাচ্ছি।"

উনি বল্লেন, "ডাক্তারের কাছে তোমায় পড়তে যেতে হবে না, তুমি আমার কাছে পড়তে এস।" আমি বল্লাম, "তুমি কি ডাক্তারি জান যে পড়াবে?" তিনি হেসে বল্লেন, "নাই বা জান্লাম, তবু আমার কাছেই তুমি পড়বে। ওর কাছে তোমায় এখন পড়তে হবে না।"

হঠাৎ রেগে মুখ দাঁড়িয়ে বল্লাম, "তার মানে কি তুমি বল্তে চাও শুনি?"

উনি আমার হাত দুখানা শক্ত করে চেপে ধরে বল্লেন, "তার মানে? তার মানে আমি তোমায় কি করে বোঝাব? তার মানে কেবল এই।"

আমি হাত ছিনিয়ে নিয়ে বল্লাম, "ও সব হেয়ালি রাখ। বিলেত গিয়েও তোমার মন এত ছোট?"

সেখান থেকে হন্হনিয়ে চলে গেলাম। তারপর পড়া শেষ করে যখন ফিরে এলাম, দেখলাম বারান্দায় কেউ কোথাও নেই। মনে পড়ছে জোৎস্নার মধ্যে বকুল ফুলগুলো বারান্দায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সারারাত তার গন্ধ আমার ঘুমের মধ্যে মধো পাগল করে তুলছিল। সারারাত মাঝে মাঝে কতবার ভাবলাম আমার কি ভুল হয়েছে? কিন্তু সে প্রশ্ন করবার অবসর আর হল না। ভোরবেলা ঘুমিয়ে উঠে দেখলাম তিনি উঠে গেছেন। মনে হল, তবে কখনও ভুল নয়; ভুল হলে তাঁর এত লজ্জা কিসের? কিন্তু কার লজ্জা ঢাকবার জন্যে যে তাঁর এত লজ্জা তা মন সেদিন বুঝল না। তারপর যখন কথা বল্বার অবসর পেলাম তখন আমার সে একরত্তি লজ্জাই শুকিয়ে মরে গেছে। উনি তাকে জাগিয়ে তুলতে পারতেন কিন্তু তাই যদি উনি চাইবেন তবে আর উনি উনি কেন?

পড়ার কথা ডাক্তারের কথা তারপরে আর উনি একদিনও তোলেন নি। কথাই এত কম বলতেন যে ঐ জন্যে আমার আরও রাগ হত। এক এক সময় এমন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন যে আর কেউ হলে তাঁর কাছে যেতেও ভয় করত। বেশ বোঝা যেত তাঁর মনটা যেখানে এক নিমিষে চলে যেতে পারত, সাত জন্ম তপস্যা করেও আমরা তার দরজা খুঁজে পাই না। আমি চাইতাম তাঁকে আমার মত নীচে টেনে আন্তে,

অত উপরে তিনি থাকতেন এ আমার সইত না। ওকে চুপ করে বসে থাকতে দেখলেই আমি যা বলতাম, "আর ধ্যান করতে হবে না, ওঠ। বৈরাগী হবার অনেক সময় আছে।"

উনি হেসে কোন বলতেন, "তুমি এসেছ!" আর কেউ হলে সাত রকম অনুযোগ করত, আর আমার মত মানুষ যারা তারা ত ওই ছোটখাট কথাগুলো শুনবার জন্যেই ছটফটিয়ে মরে। কিন্তু উনি একবারও বলতেন না যে "এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" যেন আমি এসেছি এই তাঁর পরম সৌভাগ্য। কিন্তু সে কথাও কি ছাই কোনোদিন মুখফুটে বলেছেন! না যে বলেছেন তার জন্যে আজ মনে মনে তাঁকে প্রণাম করছি; ঘাটে ঘাটে ও কথা কে না বলেছে? ও সব সস্তা কথা সস্তা উচ্ছ্বাস তাঁর মুখে কখনও মানাত না।

বৈশাখ কী মাসে পাড়গাঁয়ে কি আগুন লাগার ধুম! মনে হত শিবনেত্রের আগুন যেন সৃষ্টি-ধ্বংস করতে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠছে। গাঁয়ে গাঁয়ে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। সকাল সন্ধ্যের মধ্যে ওঁর দেখা পাওয়া ভার হয়ে উঠেছিল। নাওয়া খাওয়ার ঘুরে গিয়েছিল। সারাক্ষণ এমন উধাও হয়ে থাকতেন যে মনে হত যে কটা কথা কইতেন তাও যেন ভুলে গিয়েছেন। কোনো কথা বললে কেবল একটু হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন, দশ কথায় একটার বেশী কথা শুনতে পেতাম না। রাগ হত ভয়ানক, কিন্তু সে ভুবন-ভোলানো হাসি দেখে এ রণচণ্ডীর রাগও জলে উঠতে পারত না।

রোজই এদিক ওদিকে আগুন লাগছিল। রোদের তাপে পৃথিবীর বুকের রক্ত পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছিল, কাজেই আগুন নেবানোও শক্ত ছিল। সেদিনও সন্ধ্যার সময় দেখলাম দক্ষিণ দিকে আকাশটা প্রলয়ের আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। উনি তখন বাড়ী ছিলেন না। আগুন লেগেছে বুঝলাম কিন্তু সেই আগুনের আলিঙ্গনে যে কত অভাগার আশ্রয় ভস্ম হয়ে গেল, কত দীন দরিদ্রের সর্বস্ব ধরণীর ধূলিশয্যায় লীন হয়ে গেল তা কল্পনা করবার মত উদার দৃষ্টি আমার ছিল না। পূর্ণিমার কোলে যে দোল খাচ্ছিল, ভিক্ষের সর্দারণীর কান্না সে কি শুনতে পায়? রাত ক্রমে বাড়ছিল, তবু উনি বাড়ী আসেন না দেখে বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠছিল। কাছারী বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল, ঠাকুরদাও ঘুমিয়েছিলেন, খবর না পেয়ে চারদিকে লোক ছোটালেন। বাড়ীতে গোলমাল পড়ে গেল, কাজেই ইচ্ছে করলেও গিয়ে শুতে পারলাম না।

রাত তখন দুটো, ঘুমে চোখ জ্বালা করছিল, এমন সময় খালি পায়ে রুক্ষ চুলে নায়েবমশায়ের সঙ্গে উনি এসে হাজির হলেন। যা দেখাচ্ছিল! নায়েবের নায়েব বললেও লোকে স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করত। ওঁকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে নায়েবমশাই চলে গেলেন। ঘরে ভাত ঢাকা ছিল তা দেখেও এখনও যে ওঁর খাওয়া হয়নি তা মনে হল না। বিরক্ত হয়ে আগেই বললাম, "দেখ, মানুষের প্রাণ ত! আর কত সয়! এই কি তোমার বাড়ী আসবার সময়?"

উনি বললেন, "মানসী, দেশ তোমাদের পর করেছে নইলে দেখতে ভগবান মানুষকে কি না দওয়াচ্ছেন।" আমি বললাম, "রাখ তোমার বক্তৃতা। যারা সইছে তারা চিরকালই সইছে। তাদের ঘাড়ে ওসব কিছু লাগে না। যারা সুখ কোনো দিন জানে নি তারা দুঃখ বুঝবে কোথা থেকে? তোমরা কেবল মাঝ থেকে ভাবুক সেজে আমাদের হাড় জ্বালিয়ে তোল।"

উনি কিছু বললেন না। অনেকক্ষণ চুপ করে আছেন দেখে আমি কোথায় ওঁকে ঘর করে খেতে বলব, তা না মন দিয়ে ওঁর সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। দেখলাম, ওঁর আংটী ঘড়িগুলো পর্যন্ত নেই। আমি বললাম, "গায়ের কাপড় চোপড় আংটি ঘড়ি সব কি করলে?"

উনি বললেন, "তোমায় লুকোব না; সেগুলো টিউব-ওয়েল কিনতে লোক দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়েছি, আমার যা টাকা ছিল তাতে ঘটা চাই তা হয় না। আর একটা তার চেয়ে বড় অন্যায় করেছি, তোমার মহালের তিনটে খাল কাড় ওদের দিয়ে এসেছি, গাঁয়ে একটা চালা বাঁধবার কুটো কাটাও নেই।"

আমি বললাম, "খুব করেছ! নিজের বলে যা দিয়ে আসা হয়েছে, সেটাই যে কত নিজের তা একবার ভেবে দেখতে পার নি! শ্বশুরের ভেবে দান করতে তোমার লজ্জা করে না? লোকে যে হাসবে।"

এত শক্ত কথা বলে ফেলব ভাবি নি। দেখলাম ওঁর মুখখানা সাদা হয়ে গিয়েছে। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। মুখ তুলে ওঁর দিকে আর চাইতে পারছিলাম না। আমার লজ্জা ওঁকে ব্যথা দিত। উনি তাড়াতাড়ি আমার মুখখানা তুলে ধরে বললেন, "মানসী, চোখে দেখলে তোমারও ওকথা মনে থাকবে না, তুমি বোঝনি তাই বলতে পেরেছ। কিন্তু তোমার যে কিসের লজ্জা তা আমি বুঝতে পেরেছি। স্বামী যার অন্ন দিতে পারে না, কিন্তু গ্রহণ করতে পারে তার মত লজ্জা কার? এ বাড়ীতে শিশুকালে এসেছিলাম, তাই মনে ছিল না, তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে।"

আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল কিন্তু পারলাম না, চুপ করে বসে রইলাম।

পরদিন উনি বললেন, "মানসী, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। শুধু আমরা দুটি।" নূতন একটা আনন্দে ওঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। উনি লেখাপড়া শিখে এসেছিলেন, কিন্তু ওঁর পুঁজি ত কিছু ছিল না। ওঁর কথা শুনে আমার কেমন ভয় করতে লাগল। এত ঐশ্বর্য্য ছেড়ে কোথায় যাব ওঁর সঙ্গে একলা? খোঁটা আমিই দিয়েছিলাম তাই কিছু বলতে পারলাম না। বললাম, "কোথায় যাবে?"

উনি হেসে বললেন, "এখানের কাউকে এখন কিছু বলব না। টাকা পাঠাবার পথ বন্ধ রাখতে হবে। তোমাকে আমি কেমন করে হোক খেতে পরতে দিতে পারব বিশ্বাস হয়?" শুভ্র হাসিতে তাঁর মুখ আলো হয়ে উঠল।

আমি শুধু বললাম, "চল।" মনে মনে ভাবলাম, টাকা পাঠাবার পথ বন্ধ করলেও আমি নিয়ে যেতে ত পারব। ওঁকে সে কথা বলা হবে না। কিন্তু কতই আর আমি নিয়ে যাব? বেশী কিছু নিয়ে যাওয়াও শক্ত, তার উপর সে টাকার ব্যবহারও ত আর ওঁর চোখ এড়িয়ে করতে পারব না। বাপের ঐশ্বর্য্য ফেলে স্বামীর খুদ-কুঁড়ো খাবার জন্যে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত ছিলাম না। তাঁর থেকে নিজেকে আমি এতটাই উঁচুদরের জিনিষ বলে মনে করতাম যে অমন স্বামীভাগ্যটা আমার চোখে গর্ব্বের চেয়ে লজ্জার কারণই বেশী ছিল। আমি যে —বাবুদের ঘরের একমাত্র আদরের, তাদের ইহ-পরকালের গতিমুক্তি আমারই হাতে, এর চেয়ে আর কোনো বড় পরিচয় যে হতে পারে তা আমি জানতাম না। আমি ওঁকে যে খোঁটা দিয়েছিলাম, তা ওঁকেই লজ্জা দেবার জন্যে, কিন্তু হায়রে আমার কপাল! ওঁকে আঘাত করতে যে আমার আনন্দ হতে পারে একথার ছায়াও তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না। কাজেই আমার মুখ বন্ধ সহজেই হয়ে গেল।

বাড়ীর লোকে তাঁকে ঘরের ছেলের মতই ভালবাসত। তাদের দেওয়া জিনিষ নিতে লজ্জা হবার বয়সে তিনি এ বাড়ীতে আসেন নি, কাজেই এ বাড়ী তাঁর নিজের বাড়ীই হয়ে গিয়েছিল। তবু কেবল আমাকে খুসী করবার জন্যেই তিনি যাত্রার আয়োজনে সব বাহুল্য বর্জ্জন করলেন। শাল দোশালা ঘড়ি চেন আংটী তাঁর যথেষ্টই ছিল, কিন্তু সে-রাত্রির পর সেগুলো আর তাঁর কাজে কোনোদিন লাগে নি। ছোট্ট একটা মেয়ে হাত বাক্সর তাঁর যথাসর্ব্বস্ব গোছানো হয়ে গেল। মুখে না বলতে পারলেও বার দুই তিন তাঁর হাতের কাছে দামী জিনিষ কয়েকটা এনে এনে ফেলেছিলাম যদি কিছু ভুলেও সঙ্গে নেন। কিন্তু সেগুলো যেন তিনি দেখতেই পেলেন না।

মেয়ে মানুষের লাটবহর বড় করবার অনেক ছুতো আছে। কিন্তু লজ্জার খাতিরেও আমি মনের মত বোঝা বাঁধতে পারলাম না। লজ্জা করবার আমার খুব যে দরকার ছিল তা নয়, কারণ আমি কি যে নিচ্ছি না নিচ্ছি তা তিনি দেখলেনই না।

ঠাকুর্দ্দাকে আমিই খবর দিলাম, আমরা ভ্রমণে বেরুচ্ছি। তিনি বললেন, "যো হুকুম মহারাণী! কি চাই বল।"

আমি বললাম, "কিছু না। শুধু হাতেই পথে বেরোব।"

ঠাকুর্দ্দা হেসে বললেন, "বলিস্ কি রে! আমাদের ফেলে তোরাই আগে বাণপ্রস্থে চলেছিস্ নাকি?"

কবিতা দু-চারটে পড়েছিলাম; বললাম, "বাণপ্রস্থ যৌবনেতেই ভাল চলে।"

উনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠাকুর্দ্দা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ তীর্থে চলেছ?"

উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "সে কথা বলা বারণ। আগে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হোক তারপর বলা যাবে।"

দু-একটা লোক সঙ্গে নেবার জন্যে ঠাকুর্দ্দা ঝুলোঝুলি করতে লাগলেন। আমি ওঁর মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। উনি একবারটি আমার মুখের দিকে তাকালেন। ভুল বুঝলেন কি ঠিক বুঝেও টললেন না জানিনা, বললেন, "না, লোক চাই না।"

বাড়ীতে খবর ছড়িয়ে গেল। কান্নাকাটী লেগে গেল চারদিকে। জামাইয়ের একি খেয়াল! ঠাকুমা এসে আমায় বললেন, "তুই বুঝিয়ে বল্ ভাই, তাহলেই ঠিক শুনবে। এই বয়েসে একি ফকিরি খেয়াল!" কিন্তু আমার যে বলবার মুখ ছিল না, নইলে কান্না কি আমারও আসছিল না?

মা কিন্তু ঠাকুমার কথায় সায় দিলেন না। চোখের জল মুছে বললেন, "বাধা দিওনা মা। মানসীর ভালই হবে। যে নিয়ে যেতে চাচ্ছে সেই ত ওর গতিমুক্তি। তার সঙ্গে বিরোধ বাধিও না। যার সঙ্গে গাছ-তলাও রাজসিংহাসন তার হাতে ছেড়ে দিতে ভয় কি?"

ঠাকুমা কাঁদতে লাগলেন, "ওরে আমার সোণার প্রতিমা, আমার পটের ছবি, কেমন করে পথে ছেড়ে দেব রে! ওরে কাঙালের ছেলে, রাজসিংহাসনের মর্য্যাদা তুই কি বুঝবি? কাঙালপনাই তোর এত ভাল হল!"

মা বললেন, "ছি মা। তোমার মানসীর বর-বসতে চোখের জল ফেলা কি ভাল!"

বাবা বললেন, "যে শিক্ষা আমি দিয়েছি তার ফলকে ভয় পাওয়া আমার সাজে না। যে পথে যেতে চাইছে সে পথ ভাল কি মন্দ পথে বেরিয়ে ওদেরই দেখে নিতে দাও। তারপর ফিরে নেবার জন্যে ওদের ঘর দোর ত চিরকাল ওদেরই রয়েছে।"

কোথায় কোথায় কাজকর্মের জন্যে উনি চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার জন্যেই আরো দু-চার দিন অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় একদিন ডাক্তার এসে ধরে বসল, "তোমরা কোথায় যাচ্ছ আমায় বল।" আমি বললাম, "এত লোক থাকতে আপনাকেই বা বলতে যাব কেন?"

সে বললে, "কথা দিয়ে কথা চাপা দেবে ভেবেছ বুঝি! যতই আমায় ফাঁকি দেবার চেষ্টা কর, আমি ঠিক খুঁজে বের করব।"

ভারি রাগ হল। বললাম, "কারুর হাত পড়ে নি ফাঁকি দিতে। ঐ ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না কিনা।"

সে বললে, "যার যদি কারুর পড়ে নি তবে বলতে অত ভয় কিসের?"

কথাটা কোথায় যেন একটু লাগল। এর পর না বলতে গর্কে বাধছিল। তাছাড়া যে জন্যে সবাইকে বলা বারণ তার সঙ্গে ওর ত কোনো সম্পর্ক ছিল না। বলে ফেললাম যে একথা দ্বিতীয় প্রাণীর কাছে প্রকাশ করতে তার অতি বড় দিব্যি রইল। কিন্তু মুখের কাউকে যা বলিনি সেই কথা ডাক্তারকে বলে মনটা লজ্জায় ভরে গেল। একথা ওঁর যে ইষ্টমন্ত্রের মত গোপনে ছিল। অপরাধটা তাঁর কাছে স্বীকার করতে পেলে শান্তি পেতাম। কিন্তু অপরাধ স্বীকার করার মত বড় আমি ছিলাম না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম একথা জানলে যে ওঁর অত বড় আনন্দের প্রদীপ দুদোয় নুটিয়ে যাবে। দোষ যা করেছি তার গ্লানি আমার মধ্যেই থাক। ভরসা ছিল ডাক্তার একথা আর কারুর কানে উচ্চারণ করবে না। তাই অপরাধ ঢাকা দিয়ে চুপ করেই রইলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই যে খবর দেব বাড়ীর সবাইকে এই আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। আপাতত পশ্চিমে একটা জায়গায় ওঁর কাজ রয়েছিল, কিন্তু সে অল্পদিনের জন্য। তারপর কলকাতা আসবার সম্ভাবনা ছিল। তবে সে কাজ তখনও পাকা হয় নি।

আমরা খুব কাছাকাছি একটা জায়গার টিকিট নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। তারপর পথে বিপথে ঘুরে নূতন নূতন টিকিট করতে করতে ক্রমে যথাস্থানে পৌঁছব কথা ছিল। ঠাকুমার ইচ্ছা ছিল পিছন পিছন লোক দিয়ে আমাদের সন্ধান রাখেন; কিন্তু বাবা তা করতে দিলেন না।

৬

জীবনে প্রথম স্বামীর ঘরে পা দিলুম। নির্জ্জন গ্রাম, সহরের খানিকটা দূরে। বাঙালীর ত মুখ দেখবারই জো নেই; ভদ্রলোকও বড় দেখা যায় না। তেমনি দেশে গাছপালা নদী ঘাট মাঠের মধ্যে একেবারে প্রকৃতির কোলের কাছে আমরা দুটিতে এসে পড়লাম। দুজনের এত কাছাকাছি দুজনে আর কখনও আসি নি। অত কাছেও যা দেখতে পাইনি, আজ তাই দেখতে এত দূরে আসতে হয়েছে। যে বাড়ীতে আমাদের থাকবার

বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সে যে কি বাড়ী তা আর কি বলব! এর আগে অমন বাড়ীর ভিতরে আমি কখনও পাও দিই নি। কতকালের একটা পোড়ো বাড়ী। তার এ ঘরে চামচিকের বাসা ও ঘরে বোলতার চাক। ঘরজা জানলার শার্সী খড়খড়ির ভিতর দিয়ে উড়িয়ে সেই আগুনে বাতাস রাশি রাশি ধুলো উড়িয়ে সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে ছুটে এসে ঢুকছে। মেঝেগুলো খোঁড়া। মাঝে মাঝে চকচকে সিমেন্টের অলিগুলো যেন ঘরের রূপ দেখে হাসছিল। ঘরে বাইরে অষ্ট প্রহর ধুলো আর মাছি যেন হোলির কাদের মত উড়ছিল।

ষ্টেশন থেকে এসে যখন সেই বাড়ীতে নামলাম তখন ধুলোয় মাথার চুল পর্য্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। উনি ছেলে আমার হাত ধরে নামালেন। যে ভদ্রলোক বাড়ী ঠিক করে দিয়েছিলেন, তিনি সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন, কাজেই উনি আর মুখে কিছু বললেন না; কিন্তু মুখ দেখে মনে হচ্ছিল এমন মুখ সংসার হয়ে পর্য্যন্ত আর কারুর ভাগ্যে বোধ হয় কখনও ঘটে নি। একে অত পথের শ্রান্তি, তাতে ঘরের এই শ্রী আর নিজেদের এই চেহারা দেখে সর্ব্বাঙ্গ আবার রাগে কি রি করছিল। ধন্য হাসি ভগবান তাঁকে দিয়েছিলেন, নইলে এমন সময়েও মানুষ হাসে।

একটা ঝি ছিল, তাকে ঘরে ঝাঁট দিতে বলা হল। ঘর সে কতখানি পরিষ্কার করল জানি না, কিন্তু অভ্রতার ভাণ করে যেটুকু পরিচ্ছন্নতা আমাদের বেশভূষার বাকি ছিল, সেটুকুও তার ঝাঁটার কল্যাণে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল। বাড়ীতে এতটুকু পরিষ্কার জায়গা ছিল না যেখানে বসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আমার আবদুলের পালক আর মার্কেলের মেঝের পাতা গালিচাগুলোকে মনে করে চোখে জল আসছিল। এতক্ষণ সাতটা দাসী জল পাখা নিয়ে ছুটে আসত। উনি আমার অবস্থা দেখে সেই ধুলোর মেঝেতেই বিছানাটা খুলে পেতে দিলেন। আর কোনো দিকে না তাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি পাশের ঘরে ষ্টোভের উপর জল ফুটছে, একটা থালায় এলোমেলো ভাবে কতগুলি রুটি সাজানো রয়েছে, মাথার কাছে একটা হ্যারিকেন আলো জ্বলছে আর উনি আলু ছাড়াতে ছুরি দিয়ে হাত কেটে বসে সেইটে ন্যাকড়া জড়িয়ে বাঁধছেন। ব্যাপার দেখে হাসিও পেল কান্নাও পেল। কিন্তু ঘুমিয়ে মনটা হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। তার উপর সন্ধ্যের আসন্ন অন্ধকারে ঘরের ভিতর জলন্ত উনুনে হাঁড়ি চড়ানো দেখলে কোন মেয়ে মানুষের মনে গৃহের ছবি না ফুটে ওঠে। আমি বিছানা ফেলে উঠে ওঁর আনাড়ি হাত থেকে হাঁড়ি কুড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে বসলাম। উনি ছেড়ে দিয়ে হেসে বললেন, "আমার হাতে পড়ে ওরা ক্ষেপে গিয়েছিল। লক্ষ্মীর পরশেই ঠিক মত কাজে লেগে যাবে।"

ঠিকে ঝি রাঁধুনী নিয়ে সেই পোড়ো বাড়ীটাতেই ঘরকন্না পাতলাম। কিন্তু ঝি রাঁধুনী থাকলে কি হবে? সংসারের ভার ত আর তাদের নয়। এক পলক সরে দাঁড়ালেই তারা সব লণ্ড ভণ্ড করে বসে থাকত। একে ত কাজ কিছু জানে না, তার উপর আমার রণচণ্ডী মেজাজ, সারাক্ষণ বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র লেগে থাকত। তাদের চেয়ে আমি নিজে যে কাজে একটুও পটু ছিলাম তা নয়, কিন্তু জমিদার বাড়ীর মেয়ের পান থেকে চুণ খসলেই খুঁৎখুতা রোগটা খুব অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এতটুকুতেই বোধ করতাম, অথচ কি করে যে সেটা সেরে যাবে তা বলে দিতে পারতাম না। এমন মনিষ্যের খিটখিটে কোন ঝি চাকর সয়ে থাকতে পারে?

রোজ লোক পালানও লেগে গেল। যে আমি আঙুলে রং ধরে যাবার ভয়ে পান পর্য্যন্ত সেজে খাইনি কখনও সেই আমিই তিন দিন অন্তর পোড়া কড়া মাজ্‌তে বস্‌লাম। উনি যখন সর্ব্বাঙ্গে কালী মেখে আমার কাজের সাহায্য করতে আস্‌তেন তখন আমার মেজাজ আরো সপ্তমে চড়ে যেত।—"একটা লোক রেখে দেবার মুরোদ নেই আবার দরদ দেখাতে আসা হয়েছে? যাও যাও, আমি মরি আর বাঁচি তাতে ত তোমার ভারি এল গেল কিনা, তুমি তোমার দেশ উদ্ধার কর গিয়ে।"

উনি একটাও প্রতিবাদ করতেন না। পাছে আমার রাগ আরো বেড়ে যায় তাই সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে যেতেন। সব কাজটাই আমার ঘাড়ে পড়ত। নিজের রাগে নিজে জ্বলে পুড়ে একলাই কাজ শেষ করতে হত। কাজ করা ত অভ্যাস ছিল না, একটা করতে গিয়ে আর একটার মুণ্ডপাত করে বস্‌তাম। দুধ নামিয়ে জল তুল্‌তে গিয়ে ফিরে এসে দেখতাম বেড়ালে দুধ খেয়ে গেছে। ভাত চড়িয়ে নাইতে গিয়ে দেখ্‌তাম ভাত ধরে গেছে। হাঁটতে চল্‌তে তেল ঘি ছড়িয়ে উল্টে বাসনকোসন ভেঙে একাকার করতাম। লোকসান যত হত রাগ তত বাড়ত। কিন্তু রাগ জিনিষটা আর যাই করুক মানুষকে কর্ম্মপটু করে তোলে না।

প্রথম প্রথম ছিলাম একরকম। অবসরগুলো দুজনের একসঙ্গেই কাটত। ওই পোড়ো বাড়ীটার ভাঙাঘরেও যে আনন্দ থাকতে পারে তার যেন একটুখানি আমেজ পেতে সুরু করেছিলাম। নিজের হাতে আলো জেলে সন্ধ্যে বেলা ভাঙা ঘরে যখন ঘুমন্ত ঝিটার কাছে বসে উঁর প্রতীক্ষা করতাম তখন যে আমার হাতেগড়া একান্ত নিজের সংসারটার ছবি মনে ভেসে উঠ্‌ত, আমাদের সাতমহলা বাড়ীতে তার খোঁজ কোনোদিন পাইনি। উনি এসে দাঁড়াতেন একান্ত আমারি তয়দায়, কেবল আমারি মুখ চেয়ে। শুধু আমাকেই সর্ব্বস্ব দিতে আমার হাতেই সর্ব্বস্ব পাবার জন্যে যে একটা মানুষ দাঁড়িয়েছে এসে, যেনা পাওনার জন্যে যার আর কেউ নেই, তাকে এতদিন ধরে ভুলে নেবার যে সুখ তার পরিচয় ওই ভাঙা ঘরখানাতেই যা দু'চার বার পেয়েছিলাম। মাঝখানে কেউ আর ছিল না।

কিন্তু সংসার যখন আমায় ঝালাপালা করে তুললে সেই সময় বিশ্ব এসে উঁর অবসরেও ভাগ বসালো। সেই পুরাতন কথা। প্লেগ কলীদের বাধা উঁকে এখানেও খুঁজে বের করল। দিনে খাওয়া ঘুচে গেল, রাত্রের ঘুম টুটে গেল। সারাদিন খাটুনির পর বসে বসে আমার চোখ যখন ঘুমে ভরে যেত, তখন বাড়ীর সীমানায় উঁর সাড়া পাওয়া যেত। নড়তে ইচ্ছে করত না; কিন্তু আপাদমস্তক ওষুধগোলা গরম জলে না ধুয়ে ত উনি ঘরে উঠবেন না। কাজেই তখন আবার কাজে লাগতে হত।

ঘরে ফিরেও উঁর মুখে আর হাসি দেখা যেত না। সমস্ত দিনের দেখা বীভৎসতার স্মৃতি উঁর মনটাও যেন মেঘাবৃত করে রাখত। সারাদিনের শোনা "রামনাম সত্য হয়, গোপাল নাম সত্য হয়, সত্য বোলো সত্য হয়", এই ধ্বনি ছাড়া আর কোনো কথার সুরও যেন উঁর কানে লাগত না। আমিও ঘরের জানালায় বসে দেখেছি যখন তখন মৃতদেহ কাঁধে করে লোক চলেছে, ঠেলাগাড়ীতে এক সঙ্গে দশবারোজনের দেহ ঠেলে নিয়ে নির্ব্বিকার মুখে গাড়ীওয়ালারা চলেছে। ধনীর শবযাত্রায় তখনও পয়সা ছড়ানোর সমারোহ মাঝে মাঝে দেখা যায়, কিন্তু দরিদ্রের শবযাত্রা, সে কি ভয়াবহ। দিনান্তে

মনটা সুন্দর শোভন কিছু চাইত, মিষ্টি দুটো কথা শুনতে, মধুর একটু স্পর্শ পেতে, নিজস্ব কুলায় রচনার একটু আনন্দ জাগিয়ে তুলতে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ত। কিন্তু কি পেতাম? কিছুই না!

উনি কেমন যেন আমাকে এড়িয়ে চলতেন। আজ বুঝতে পারি ভালোর জন্যেই করতেন। যে মৃত্যুতাণ্ডবের আবেষ্টনের ভিতর থেকে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতেন তার ছোঁয়াচ যেন আমার কোথাও না লাগে এই ভেবে তিনি সর্বদা সশঙ্কিত থাকতেন। কিন্তু পাছে আমি বেশী ভয় পাই তাই আমাকে খুলেও কিছু বলতেন না। ছোট একটা খাটিয়া ঘরের আর এক কোণে আলাদা পাতা হল, উনি বললেন, "ওইখানে আমার বিছানা পেতে দাও। সারাদিন এমন সব নোংরা বস্তিতে ঘুরেছি যে এ শরীরটা নিয়ে আর তোমার ওই দুগ্ধশুভ্র বিছানায় উঠতে ইচ্ছা করে না।" বেশীর ভাগ সময় সেই ছোট খাটিয়াতেই উনি পড়ে থাকতেন। খাটের উপর কয়েকটা ডাক্তারী বই—হোমিওপ্যাথীই অধিকাংশ—ছড়ানো, তারি মধ্যে মাথায় বই হাতে বই নিয়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। শুনেছিলাম রুগীর সেবা ছাড়া মৃত্যুভয়গ্রস্ত মানুষদের মনে সাহস জাগিয়ে তোলাও তাঁর কাজ ছিল। যারা কাজ করতে ভয় পেত, তাদের সামনে নিজে রুগীদের কোলে টেনে নিয়ে তিনি দেখিয়ে দিতেন মৃত্যুভয় কত তুচ্ছ জিনিষ। কিন্তু এ সব কথা তিনি আমায় কিছু বলেন নি। আমি অপরের কাছে পরে শুনেছি। সেই মৃত্যুযজ্ঞের দিনে আমি যদি রুগীদের কথা কখনও তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে যেতাম, উনি বলতেন "তুমি বুঝবে না, সে সব ডাক্তারী ব্যাপার।"

আমার সাহস ছিল না যে—আমিও তোমার সঙ্গী হব। আমাকে তোমার কাজে নাও। তাছাড়া মেয়ে মানুষে প্লেগ রুগীর সেবা করতে যাচ্ছে এটা কেউ কোনো দিন দেখেওনি। স্বভাবতই আমি আরাম বিলাস প্রিয় মানুষ, আমি যে আবার একটা নূতন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব এটা আমিও কল্পনা করতে পারতেম না, উনিও না। আমার দিন যে ভাল কাটছে না জীবনটা যে শূন্য হয়ে পড়ছে তা উনি বুঝতে পারতেন। কতকটা বোধহয় নিরুপায় হয়েই একদিন সন্ধ্যে বেলা উনি যখন বাড়ী ফিরলেন তখন দেখলাম সঙ্গে একটা বছর দেড়েক ছোট কালো ছেলে। ছেলেটা একেবারে উলঙ্গ, গায়ে একটা সুতোও নেই। প্রতিদিনের মত শুধু জল চড়ানো, আলাদা জুতো জামা কাপড় এনে দেওয়ার কয়মাসের আগেই উনি বললেন, "মানু, তুমি ত সারাদিন একলাই থাক, এমন আর কত দিন চলবে, কে বলতে পারে? এই ছেলেটিকে রাখ ও তোমার সঙ্গী হবে বেশ।"

আমি বললাম, "কোত্থেকে একটা মেথর না চামারের ছেলে কুড়িয়ে এনেছ, আমায় খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তাই ওকে মানুষ করব? কার না কার ছেলে আমার বিছানায় নোংরা করবে আর আমি তাই পরিষ্কার করব? ভাল অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিলাম।"

ওঁর মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল। বললেন, "আচ্ছা, আজ রাতটা আমার কাছেই থাক, আমি কাল ওর অন্য বন্দোবস্ত করব। ওর মা মারা গেছে, ওকে দেখবার এখানে কেউ নেই।" পরে শুনেছিলাম ওর মা শুধু নয়, বাপ ভাই সব প্লেগে মারা গিয়েছে; গ্রামে তাদের পোড়াবারও লোক জোটে নি, ওঁদের কর্মীদলই তাদের কাঁধে করে পুড়িয়ে এসেছিল। ছেলেটাকে যারা এই কয়েকদিন আশ্রয় দিয়েছিল তারাও এমন মরণ দেখে

ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে আর রাখতে চাইছে না। এ সব কথাই পরে শুনেছি। নিজেরই একটা ধুতি ছিঁড়ে ছেলেটার গায়ে মোলাইএর মত করে বেঁধে পরদিন ভোরে তাকে নিয়ে উনি বেরিয়ে গেলেন। বললেন, "ওকে একজায়গায় রাখতে যেতে হবে, ফিরতে দেরী হলে ভেবো না।" আমি একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলাম না।

(৭)

অদৃষ্ট লোকে আজকাল মানে না। কিন্তু অদৃষ্ট ব'লে একটা জিনিষ আছে। নাহলে যা স্বাভাবিকভাবে কোনোদিন ঘটে না, সেই জিনিষটাই ঠিক একদিন অসময়ে ঘটে বসে কেন পৃথিবীতে। ছ'মাস হল এদেশে চলে এসেছিলাম বাপের বাড়ীর সুখৈশ্বর্য্য ছেড়ে। কাউকে ঠিকানা দিয়ে আসিনি, এসে চিঠি পত্রও লিখিনি, উনি বলেছিলেন, "এখন নয়, যখন আমি সময় হয়েছে বুঝব তখন আমি নিজেই তোমাকে লিখ্‌তে বল্‌ব।"

ভেবেছিলাম ধীরে ধীরে আমরা গুছিয়ে বস্‌ব, সংসারের খুঁটি নাটির বিরক্তিগুলো চাপাপড়ে গিয়ে নীরু ধাত্রীর আনন্দটাই একদিন স্থায়ী হয়ে উঠবে; তখন বাড়ীতে সকলকে খবর দেব। কিন্তু তাও হল না। সেবার নেশা ওঁকে সব ভুলিয়ে দিলে। আসবার সময় বলেছিলেন, "যাব শুধু আমরা দুটি;" কিন্তু এখন সহসা এসে বিউটিটিকে কোথায় সরিয়ে দিলে। এই ছোট ছেলেটাকে নিয়ে যেদিন উনি ভোরে বেরিয়ে গেলেন সেই দিনই ভেবেছিলাম এসব করে আর চলবে না, আমি আমার বাবা মায়ের কাছেই ফিরে যাব। তাঁদের লিখব টাকা পাঠাতে, তা উনি যতই রাগ করুন না কেন। আমার বাবা মায়ের আমি একমাত্র সন্তান, কিসের জন্যে আমি তাঁদের সম্পর্ক এমন করে ত্যাগ করব? আজই লিখব যাতে যত তাড়াতাড়ি পারি চলে যাওয়া যায়। কিন্তু আমি ছাড়া যাকে দেখ্‌বার এখানে কেউ নেই তাকে এই মহামারীর মধ্যে একলা ফেলে যেতেও মনে ভরসা হচ্ছিল না; বুঝিয়ে পড়িয়ে যদি কোনো রকমে ওঁকেও নিয়ে যাওয়া যেত!

জানালার ধারে বসে বসে এই সব কথাই ভাবছিলাম। বাইরের পোড়ো বাগানটায় অথবা স্কুলের আলো-করা গাছগুলো ক্রমে অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে আসছিল। বড় রাস্তার উপরের নিমগাছগুলো আকাশের গায়ে মিশিয়ে গিয়েছে, ঘরের বাইরে বেশী আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় ঘুলোওড়ার একটা শব্দ এসে নাকে লাগ্‌ল। রাস্তার এক হাঁটু ধুলো ছড়িয়ে পড়ে। একটা একাগাড়ীর ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের আওয়াজ কানে আসতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যাবেলা উনিত রোজ ষ্টেশন থেকে এই পথটুকু হেঁটে আসেন, আজ আবার কেন গাড়ীতে আসছেন বুঝলাম না। সেই ছোট ছেলেটার কোন গতি হয় নি বুঝি?

গাড়ীটা গেটের সামনে এসে দাঁড়াতে একাওয়ালাটা ডাকাডাকি সুরু করল। উনি আবার আজ নিজের ঘরেই নূতন হলেন নাকি? আমি বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম। গাড়ী থেকে লুপ্‌ করে নেমে পড়ল কে? উনি ত নয়। গা'টা কি রকম শিউরে উঠ্‌ল। কিছু বিপদ আপদ হয়েছে বুঝি? অজানা কে খবর দিতে এল।

কিন্তু গেটের দরজা ঠেলে গট্ গট্ করে এগিয়ে এল কে? ডাক্তার, সেই আমার বাপের বাড়ীর ডাক্তার দেখেই আমার সমস্ত শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। এর হাত কি আমি কিছুতেই এড়াতে পারব না? প্রথমে একটাও কথা বল্‌ল না। কি রকম একটা দৃষ্টিতে আমার আপাদ মস্তক দেখে নিল। আমি আমার চোখ দুটো নামিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে আমার চোখে চোখে এমন করে তাকাল যে চোখ সরানো যায় না। ওকে আমি ভয় করতুম, এড়াবার চেষ্টাও করেছি; কিন্তু আমার মধ্যে কি একটা জিনিষ ছিল যা আবার ওকেই যেন কাছে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ত। ও সেটা বেশ রকম বুঝত।

যাই হোক, ওরকম নীরব ভাষা বেশীক্ষণ চলে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি এখানে কোথা থেকে এলেন?" প্রথমে সে বল্‌ল, "চুলোর টানে।"

আমি বল্‌লাম, "সত্যি কথা বলুন। আপনাকে ত এখানে কেউ আসতে বলে নি।"

ডাক্তার বল্‌লে, "সত্যি কথা ওইটাই, তবে একটা মিথ্যা কথাও আছে। সেটা হচ্ছে একটা প্লেগগ্রস্ত জমিদার প্লেগ বাধিয়ে বসেছেন। দিবারাত্রি তাঁকে আগলে বসে থাকবার জন্য দুজন ডাক্তার চাই। এদেশের ডাক্তাররা ত অধিকাংশ বেশ ছেড়েই পালিয়েছে। আমাদের দুজনকে টেলিগ্রাম করে আনানো হয়েছে। গরীব মানুষ, টাকার লোভে এসেছি লোকে জানবে।"

আমি বল্‌লাম, "প্রাণের চেয়ে টাকা বড় হল?"

ডাক্তার এগিয়ে এসে আমার হাতখানা ধরে বল্‌লে, "তুমিও তাই বল্‌বে?"

আমি হাতখানা টেনে নিয়ে বল্‌লাম, "আপনি ওরকম করে কথা বলবেন না।"

সে যেন বিরক্ত হয়েই বল্‌ল, "তোমার জন্যে আমি জীবন পণ করেও আসতে পারলাম, আর ও রকম করে কথা বলব না? আমার চেয়ে আপনার তোমার কে আছে? ওই যে কাদার ভালিয়ান-মার্কা লোকটা তোমাকে ঘরে ফেলে রেখে সখ করে প্লেগ ঘেঁটে বেড়ায়? ও ধার্মিক হতে পারে, কিন্তু ভালবাসার ও কি জানে!"

আমি জবাব দিতে পারলাম না। ডাক্তার তার বিরহ বেদনার কথা, তার জীবন তুচ্ছ করার কথা, তার শয়নে স্বপনে জাগরণে ধ্যান করার কথা অনর্গল বলে যেতে লাগল। সে সব তোমাদের বাবা, আমি খুঁটিয়ে বল্‌তে পারব না, মাপ করো।"

আমার অদৃষ্ট সত্যিই খারাপ ছিল, আগেই বলেছি। না হলে ঠিক সেই রাত্রেই উনি বাড়ী ফিরলেন না কেন?

ডাক্তার বল্‌লে, "এই দেশে এমন দিনে রাত্রে তুমি একলা পড়ে থাকবে? আমি তোমাকে ফেলে যাব না। তুমি বুঝতে পারছ না, নিয়তি আজ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন আর আমার জীবনের একটা পরম ক্ষণ।"

(৮)

পরদিন ভোরে সে চলে গেল। উনি অনেক বেলায় ফিরে এলেন। কাল রাত্রে তাঁর ফিরবার উপায় ছিল না। সেই মা-মরা শিশুটিকে দুই ষ্টেশন দূরে ক্রীশ্চান মিশনারীদের একটা অনাথাশ্রমে দিতে

যেতে হয়েছিল। ছোট গ্রাম সেটাও। রাত্রের ট্রেণগুলো দাঁড়ায় না, অতদূর থেকে আসবার অন্য উপায়ও ছিল না। মিশনারীদের আশ্রয়েই রাত কাটিয়ে দিনের ট্রেণ ধরতে হল।

ডাক্তার যে এসেছিল একথা ওঁকে না বললে কখন হয়ত আচমকা দেখা হয়ে গেলে তাকে বড় অপ্রস্তুত হতে হবে। তাই খাওয়া দাওয়ার পর ওঁকে বললাম, "জান, আমার বাড়ীর সেই ডাক্তার এখানে এক জমিদারের ছেলে এসেছেন। সে কাল আমাদের বাড়ী খুঁজে এসে হাজির।"

উনি শুধু বললেন, "আমরা যে এখানে তা ও কি করে জানল?"

আমি একটু ভীত ভাবেই বললাম, "ওকে ভুলে বলে ফেলেছিলাম ঠিকানাটা।"

আশ্চর্য্য, উনি কিছু বকলেন না, শুধু বললেন, ভুল করেছিলে।"

তারপর আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। আমারও সাহস হল না যে কথা পাড়ি। নিজের নিয়ম মত সব কাজ করে যেন কিছুই হয় নি এমনি মুখ করেই তিনি যথা সময়ে কাজে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার এল সন্ধ্যায়। বসল না বেশীক্ষণ, বলল, "আমি দিনে ডিউটি করে রাতে ছুটি নিতাম। আজ থেকে রাত্রে ডিউটি করে দিনে ছুটি নেব। কাল থেকে আমি দুপুর বেলা আসব। এমন সময় কাজটা পড়বে যে তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করা শক্ত হবে। অবশ্য আমাকে দেখবার জন্যে তিনি ব্যস্ত নয়।"

এইভাবেই আসা যাওয়া চলতে লাগল। রোজই যে সে আসে সেটা ওঁর কাছে ঢাকা রইলনা, আমি পুরোপুরি ঢাকতে চাইতামওনা। যি চাকর সবাই দেখে, চা খাওয়া, সরবৎ খাওয়া এবং আরও দু চারটে টুকি টাকি চলে যা বাড়ীতে একটা চাকর থাকলেও প্রকাশ হয়ে পড়বেই। একলা থাকি, পুরানো বন্ধুর মত একজন এসে আমার নিঃসঙ্গতা দূর করে, এটা ওঁকে বলে যেন একটু খোঁটা দেওয়াও হত। যার জন্যে মা বাপ ধন সম্পত্তি সব ছেড়ে এলাম, দিনে আমাকে কতটুকু সময় দেয়? আর এই যে মানুষটা প্লেগের রাজ্যে এসেছে মরণকে যেন আগ বাড়িয়ে নিতে শুধু আমারই জন্যে, সারারাত জেগে ধনী পাহারা দেয় দিনে আমার সঙ্গে পরে বলে, এর কথা শুনে পোড়া মনে অহঙ্কারও একটা হত। ছেলেবেলা গল্পে উপন্যাসে পদ্মিনী কি হেলেনের কথা পড়েছিলাম, ডাক্তারের স্তুতিবাদ শুনে মনে হত তারাই যেন আমার মধ্যে এসে জন্ম নিয়েছে। মা বাবা যাকে জীবনের সঙ্গী করে দিয়েছিলেন তার গুণের তুলনা মেলে না, কিন্তু আমার পাপ মন শুধু সেই গুণ রাশিতে তৃপ্তি পেত না। দেবতাও ভালবাসে হয়ত পাপীও ভালবাসে। কিন্তু দুটো ঠিক এক জিনিষ নয়। পাপীর ভালবাসার সে সুরার মাদকতা আছে, যে ভালমন্দ ভুলে উন্মত্ত প্লাবনে ভেসে যাওয়া আছে, মানুষের বহু পুরুষের গড়া লজ্জা সরমকে জলাঞ্জলি দেওয়ার যে পৈশাচিক আনন্দ সত্যতাই সৃষ্টি করেছে, তার আগড় খুলে দেখবার লোভ ভদ্রঘরে জন্মেও আমার ভিতর কেন ছিল জানি না। ডাক্তারের তীক্ষ্ণ চোখ প্রথম থেকেই আমার ভিতর সেটা আবিষ্কার করেছিল। শুধু রূপ নয় আমারই মত বেপরোয়া নির্লজ্জতা সে এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। নিয়তি তাকে ঠিক সেইখানেই এনে ফেলেছে। আমি ভুলে গেলাম স্বামীর মহত্ত্ব, ভুলে গেলাম পিতৃ পিতামহের বংশ মর্য্যাদা, ভুলে গেলাম আমার ঘরে যে শিশু এসে আমার মাতৃত্বের গৌরব একদিন করবে তার কথা, আমি নরকে তলিয়ে গেলাম। মায়ের জাতে জন্ম আমার, মা হবার যেটা দেরীও ছিল না, কিন্তু

সন্তানকে কলঙ্কের ডালি উপহার দিয়ে যেতে একটু বাধল না। খেতে না পেয়ে লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেয়ে, স্বামী হারিয়ে মানুষ অহরহ যায় বোঝা যায়, কিন্তু সব থেকেও জগতের সেরা রত্ন পেয়েও মানুষ চুলোয় যায় কখনও দেখেছ? যায়; মেয়ে মানুষের গর্ভে সবই মানুষ জন্মায় না, মাঝে মাঝে ডাকিনীও জন্মায়; সেই তারাই চুলোয় যায়।

কিন্তু বিধাতা সব সময়ই চোখ বুজে থাকেন না। এত পাপ সইল না। একদিন সমস্ত গায়ে ব্যথা হয়ে আমার ভীষণ জ্বর এল। এক মুহূর্তে জ্বর এমন করে সর্বাঙ্গে আগুন ছড়িয়ে দিতে পারে আগে জানতাম না কখনও। একটা হাতের তলা এমন ফুলেছিল যে তার তাড়সে মুখ চোখ পর্যন্ত ফুলে লাল হয়ে বীভৎস হয়ে উঠল। ঝি চাকরগুলো ঘরে ঢুকেই পালিয়ে গেল। 'জল জল' করে 'মা মা' করে কতক্ষণ ডেকে ছিলাম মনে নেই, কেউ কাছে আসে নি, কেউ সাড়া দেয় নি। তারপর খানিকটা আচ্ছন্নের মত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন জেগে উঠে তাকালাম, সমস্ত ঘরটা ইউকালিপটসের গন্ধে ভুরভুর করছে বলে মনে হল কেউ বোধহয় ঘরে এসেছে। এসেছিল, ডাক্তারই এসেছিল, একেবারে অমানুষ নয়। কি জানি, হয়ত সব অমানুষেরই মধ্যে ভগবান একটু আধটু ভাল দিয়েছেন।

আমার মাথায় জলপটি দেওয়া রয়েছে বুঝতে পারলাম। আমাকে তাকাতে দেখে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, "মানসী তোমার এত জ্বর হয়েছে কখন?"

আমি বেশী কথা বলতে পারলাম না, বললাম, "জানি না।"

ডাক্তার বলল, "উঃ কি ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে তোমার? ভগবান বড় নিষ্ঠুর বিধায়ক। এমনি করে কি রূপ যৌবনের অনিত্যতা আমাকে বোঝাবার দরকার ছিল? এমন জানলে কে আসত?"

অত দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও কথাগুলো আমার কানে গিয়েছিল আর মনেও বিঁধেছিল। তখন বেশী কথা ভাববার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু পরে ভেবেছিলাম—এই ভালবাসা? ভগবান যেন তার পুরস্কার আর শাস্তির জন্যেই আমায় গড়েছিলেন। আমার নিজের জন্যই নয়?

সন্ধ্যার একটু আগে উনি বাড়ী ফিরে এলেন। ঝি চাকরগুলো পালিয়েছিল বলে আজ ডাক্তার সাহস করে সন্ধ্যা পর্যন্তই বসেছিল। উনি এলে সে যে তাকে কি বলেছিল তা আমি কিছু শুনি নি। কেবল মনে আছে অনেক দিন পরে উনি আজ আমার বিছানায় এসে আমার মাথাটা কোলে করে বসলেন। আমার আরক্ত মুখের উপর মুখ নামিয়ে এনে সস্নেহে চুম্বন করে বললেন, "জ্বর পেওনা, মানসী, সেরে যাবে।"

ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ চলল। কিন্তু আমার জ্ঞান ভাল থাকত না। আমি মানুষ চলাফেরা দেখতাম, খেতে দিলে খেতাম, যন্ত্রণায় কাঁদতাম। কিন্তু কে যে খেতে দিত, কে যে সেবা করত, কিছু বুঝতে পারতাম না। ছায়ার মত তিন চারটা মানুষ অনেক সময় ঘুরে বেড়াতে দেখতাম, কখনও ঘরে ভীষণ একটা ব্যস্ততার ভাব লক্ষ্য করতাম। কিন্তু কে মানুষগুলো, কি করছে ধরতে পারতাম না।

কথায় যে বলে যমের অরুচি, এ তাই। যম আমাকে নিলে না। একদিন স্বামীকে চিনতে পারলাম। উনি বুঝতে পেরেছিলেন, কাছে এসে বললেন, "মানসী, এই যে আমি, ভয় কি? বলেছিলাম ত তুমি সেরে

উঠবে।" তিনি ধীরে আমার কপালে হাত বুলাতে লাগলেন। আমি মুখটা তার হাতের উপর চেপে ধরে বললাম, "কেন বাঁচালে আমায়? আমি না বাঁচলেই তোমার মঙ্গল হত।"

উনি বললেন, "ছিঃ, ও কথা বলে না। আমি তোমার নতুন জন্ম দেখলাম আমার কত বড় সৌভাগ্য।"

লজ্জায় মাথা খেয়ে একদিন ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তার কোথায় গেল? সে ত আমাকে দেখতে আসে না।"

উনি বললেন, "সে সেইদিনই চলে গেছে আর আসে নি। সে বললে তোমাকে এরকম করে মরতে দেখতে সে পারবে না। তাই ও তারটুকু আমার উপরে দিয়ে গেল।"

এরকম করে কথা উনি কখনও বলেন নি, সেই একদিনই শুধু বলেছিলেন।

আর বেশী কথা বলবার কিছু নেই। শেষ ক'টা কথা কি করে বলব জানি না। অনেক দুঃখের অনেক লজ্জার কথা।

সেরে উঠে বলতে হল একদিন সব কথা। সেই উদাসী মানুষ মনের মুখ থেকে আমাকে টেনে এনে আমায় এমন করে আগলে রাখতে আরম্ভ করলেন; এমন শিশুর মত করে পালন করতে লাগলেন যে আমি কিছু ঢাকতে পারলাম না তার কাছে। উনি বললেন, "তোমার মনের আগুনই ত তোমার শোধন করে দিয়েছে ও নিয়ে আর দুঃখ করো না। আমার কাছে তুমি যা ছিলে আবার তাই হবে। আমি পাপের জন্য উড়িয়ে পাপ খুঁজে বেড়াব না।"

কিন্তু আমি পারলাম না তাঁর কথায় রাজি হতে, আমি একদিকে বিদ্রোহী হলেও আমার মেকেলে সংস্কারও কম ছিল না। বললাম, "না, সে হয় না, তুমি না হয় নীলকণ্ঠ, গরল ধারণ করেও আমায় আগলে রাখবে। কিন্তু আমার সন্তানকে তোমার সন্তানকে আমি আমার এই হাতে মানুষ করতে, এই মুখ দেখাতে চাই না। আমার মা বাবার কাছে আমি এই মুখ নিয়ে ফিরে যেতে পারব না। তাদের কাছে আমি চিরদিনের মত মরেছি।"

ছোট এক মাসের শিশুটিকে তার বাপের হাতে দিয়ে ক্রিশ্চান মিশনের হাতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারপর অনেক দুঃখ অনেক পরীক্ষা জীবনে গিয়েছে, সে কথা হয়ত না বললেও চলবে। মাঝে মাঝে স্নেহস্পর্শের মত টাকার উপহার পেতাম কার কাছ থেকে জানি; তিনি বলেছিলেন, "যখন তোমার মন চাইবে তখন আমায় জানতে দিও, আমি তোমায় দেখা দেব।"

কিন্তু আমি তা চাই না, আমার খোকার মা আমার মায়ের মেয়ে যে বহুদিন মরে গেছে, তাকে বাঁচানো ত যায় না। আর তারাও আছে কি নেই এ জগতে আজ তাও আমি জানি না।

গল্প শেষ করে মেয়েটি সলজ্জভাবে আমাদের দিকে একবার তাকালে। পুলিন বললে, These are more things in heaven and earth ...

এমন একখানা চিঠি ডাক্তারের রুগীর খাতায় কখনও লেখা হয় নি। কিন্তু আমি আমার ডায়েরীতে লিখে রাখলাম।

বিজয়িনী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আসাম পরিত্যাগ করে দক্ষিণবাহিনী হয়ে যেখানে সোমেশ্বরী নদী ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করেছে, তার মাইল দশেক দক্ষিণ-পশ্চিমে হরিণপুর গ্রাম। গ্রামখানি প্রধানত মুসলমান অধ্যুষিত হলেও হিন্দুর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। রায়চৌধুরীরা গ্রামের প্রাচীন জমীদার বংশ। তাদের আত্মীয় কুটুম্ব আশ্রিত-পালিতগণও ক্রমশ বর্ধিত হওয়ার ফলে, উপস্থিত ষাট বাষট্টি ঘরের কম হবে না। তদ্ভিন্ন, সামান্য কিছু বৈদ্য কায়স্থ এবং অন্যান্য হিন্দু জাতির বাসও আছে।

ভাগ-বাটোয়ার ফলে রায়চৌধুরীরা কয়েক ঘরে বিভক্ত হলেও উত্তরাধিকার সূত্রে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগে তরুণ জমীদার জীবনশেখর একাই বারো আনা অংশের মালিক। বাকি চার আনা অংশ কয়েকজন অংশীদারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে কয়েকটি নামমাত্র জমিদারের সৃষ্টি করেছে।

জীবনশেখরের পরিবারে সে ছাড়া মাত্র দুটি প্রাণী—সন্তানহীনা বিধবা পিসি উমাসুন্দরী এবং আই, এ পাশ-করা অবিবাহিতা ভগ্নী কনকলতা। পিতার মৃত্যুর পর পিতামহ বৃদ্ধ ত্রিলোকশেখর জমিদারি পরিচালিত করছিল। বৎসর দুই পূর্বে ত্রিলোকশেখরের মৃত্যুর পর থেকে জীবনশেখর মালিক জমিদার।

আশ্বিন মাসের প্রারম্ভ। আকাশ মেঘনির্মুক্ত হ'তে আরম্ভ করলেও নাকি বর্ষার জন্য এবৎসরে এখনও হরিণপুরের চতুর্দ্দিকে খাল বিল পুষ্করিণী পরিপূর্ণ জলভারে থৈথৈ করছে।

সকাল থেকে সমস্ত দিন মাঝে মাঝে প্রচুর বৃষ্টিপাত হ'য়ে বৈকালের দিকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান ছেড়ে যাবার সময়ে গৃহপালিত পশুগুলি সম্বন্ধে বিশেষত গরুগুলি সম্বন্ধে, কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। গোয়ালবাড়ির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে জীবনশেখর মনে মনে সেই কথা চিন্তা করছিল, এমন সময়ে ওসমান আলি ডাকপিওন এসে তার হাতে ডাক দিয়ে গেল। নিকটতম ডাকঘর থেকে হরিণপুরে সপ্তাহে মাত্র দু দিন ডাক বিলি হয়।

চিঠি এবং কাগজপত্রগুলা একে একে দেখতে দেখতে খামে মোড়া একখানা চিঠি বিশেষ ভাবে জীবনশেখরের মনোযোগ আকৃষ্ট করলে। দামী খয়েরি রঙের মূল্যবান খাম। খামের উপরে সুস্পষ্ট মেয়েলি হাতের অক্ষরে লিখিত ঠিকানা, এবং ডাকটিকিটে কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ডাকঘরের ছাপ,—এই উভয়ে পাশাপাশি একত্র হয়ে যে কথা ব্যক্ত করতে চায় তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সাহস হয় না।

অবিলম্বে কাছারি বাড়িতে তার খাস কামরায় উপস্থিত হয়ে জীবনশেখর খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করলে। প্রথমেই চোখে পড়ল চিঠির আরম্ভের সম্ভাষণ পাঠ—'সশ্রীতি প্রণাম পূর্বক নিবেদন'। প্রত্যাশার পরিমাপ যন্ত্রে পারার রেখা তাড়াতাড়ি কয়েক দাগ চ'ড়ে গেল। তারপর চিঠিখানা উল্টে চতুর্থ পৃষ্ঠার তলদেশে লেখিকার স্বাক্ষরের উপর দৃষ্টিপাত করতেই জীবনশেখরের চরিতার্থ প্রত্যাশা আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে উঠল। সত্যই তা হ'লে এ চিঠি লিখেছে বিধাহ প্রস্তাবে আবদ্ধা তার বধূ দীপ্তি।

দীপ্তি কলিকাতার শিক্ষিতা মেয়ে; বিবাহের পূর্বে যদিই বা সে তার সম্ভাবিত স্বামীকে এরূপখানা চিঠি লেখে, তার মধ্যে বিস্ময়ের এমন কোনো গুরুতর হেতু থাকে না। কিন্তু তাই বলে একেবারে ঠাসা চার পৃষ্ঠা চিঠি! এ পর্যন্ত কলিকাতার পরিচয় লাভের যেটুকু সুযোগ তার হয়েছিল তা থেকে জীবনশেখরের বুঝতে বাকি নেই যে, স্বভাবত দীপ্তি লাজুক মেয়ে,—উচ্চশিক্ষিতা হ'লেও আধুনিক ঠাটের কুণ্ঠাসঙ্কোচ বিমুক্ত চালের মেয়ে সে নয়। সুতরাং চার পৃষ্ঠা জুড়ে যে বস্তু বিস্তার লাভ করেছে, নিছক প্রণয়-চর্চা হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় মনে করে জীবনশেখর একটু উদ্বিগ্নও হ'য়ে উঠল।

চিঠিখানা আদ্যন্ত পাঠ ক'রে কিন্তু বিহ্বলতার অবধি রইল না জীবনশেখরের। সহসা অতর্কিতে একি উৎকট সঙ্কটের সৃষ্টি করে বসল দীপ্তি! বহু বিচার বিতর্ক বিবেচনার পর বহু ভাবে অপ্রায় লাভ লোকসান সুবিধা অসুবিধা ওজন ক'রে দেখার ফলে অগত্যা যে উৎসাহন ব্যবস্থা সে প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছে, দীপ্তি তা এক ফুৎকারে বানচাল করে দিতে চায়? সে যে এমন উগ্রমাত্রার খেয়ালি, কে তা' আগে জানত? মাটির মানুষ ব'লে যাকে নিঃসংশয়ে বোকা গিয়েছিল, কে জানেছিল তার মধ্যে লুকিয়ে আছে যাদুর ভাণ্ডার।

দুশ্চিন্তা প্রকট হ'য়ে উঠল জীবনশেখরের ললাটের কুঞ্চিত রেখার মধ্যে। কিন্তু দুশ্চিন্তারই ধারে ধারে আনন্দেরও একটা মৃদু আমেজ ক্ষণে ক্ষণে রেখা দিতে লাগল কালো মেঘের কোলে রুপালি আভার রীতের মতো।

৩

সন্ধ্যার পর জীবনশেখর তার সহপাঠী এবং বন্ধু এনায়েৎ আলির গৃহে উপস্থিত হ'য়ে ডাক দিলে, "এনায়েৎ বাড়ী আছ?"

তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সহাস্য মুখে এনায়েৎ বললে, "নিশ্চয় আছি।" তারপর ব্যস্ত হয়ে বললে, "আরে, ভিজে গেলে যে। এস, এস। উঠে এস।"

তখন টিপ টিপ ক'রে পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে।

জীবনশেখর বারান্দায় উঠলে দুই বন্ধু দুখানা চেয়ার জুড়ে মুখোমুখি হয়ে বসল।

এনায়েৎ বললে, "বৃষ্টি মাথায় ক'রে যখন এসেছ একটা কোনো মৎলব নিশ্চয় আছে। হুকুম কর, কি করতে হবে।"

হাসিমুখে জীবনশেখর বললে, "হুকুম ক'রবার সব অধিকার আমি ত' তোমাদের লিখে প'ড়ে দিয়েছি। হুকুম ত' এখন তোমরা করবে।"

এনায়েৎ বললে, "তোবা, তোবা! সন্ধ্যেবেলা বোংরা কথা শুনিয়োনা। হরিণপুরের তোমরা হ'লে পাঁচ পুরুষের জমিদার।' লিখে প'ড়ে যাও, আর যাই কর, হরিণপুরের পশু পক্ষীও তোমাদের হুকুম মানতে বাধ্য। বল, কি হুকুম।"

"একখানা চিঠি প'ড়ে দেখবার হুকুম।"

"চিঠি? —কার চিঠি?"

"দীপ্তির।"

গভীর বিস্ময়ে এনায়েৎ বললে, "দীপ্তির? অর্থাৎ, তোমার—" তারপর কোন্ কথা যোগ ক'রে কথা শেষ করবে ঠিক ভেবে না পেয়ে থেমে গেল।

হাসিমুখে জীবনশেখর বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দীপ্তির। অর্থাৎ, আমার। নাও প'ড়ে দেখ।" ব'লে চিঠি-খানা এনায়েতের হাতে দিল।

চিঠিখানা নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে খুসি হ'য়ে সহাস্যমুখে এনায়েৎ বললে, "বল কি হে! বিয়ের আগেই এত বড় চিঠি? এ যে অল্পে, গাছে না উঠেই এক কাঁদি, তাই হল তোমার।"

স্মিতমুখে জীবনশেখর বললে, "হ্যাঁ, তা হয়েছে। তবে কাঁদিটা ভারি শক্ত,—আর পড়বি ত' পড় একেবারে মাথায় প'ড়ে মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছে।"

বিস্মিত কণ্ঠে এনায়েৎ বললে, "তার মানে?"

"তার মানে চিঠিতে লেখা আছে।"

বারান্দার কড়ি থেকে একটা কেরোসিনের বাতি নীচু হয়ে ঝুলছিল। সেটাকে একটু তেজ ক'রে দিয়ে আগ্রহ সহকারে এনায়েৎ চিঠিখানা পড়তে লাগল। চিঠিখানা এইরূপ—

সশ্রীতি প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

আমার এই চিঠি পেয়ে আপনি খুবই বিস্মিত হবেন; কিন্তু চিঠি শেষ ক'রে একথাও নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে, সম্প্রতি আপনি দাদাকে যে-চিঠি লিখেছেন তার দ্বারা, অন্তত আমার পক্ষে, নিরতিশয় অঙ্গরী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমাকে বাধ্য করেছে এ চিঠি আপনাকে লিখতে।

আপনি লিখেছেন, আপনার পূর্ব্ব বঙ্গের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি, সমস্ত জমি-জমা-জমিদারি বিক্রয় ক'রে দিয়ে বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং বহনযোগ্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে পশ্চিম বাঙলায় এসে আমাকে বিবাহ করবেন। এ বিষয়ে কোনোপ্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বেই আপনাকে জানিয়ে রাখি, এ ব্যবস্থায় আমি সম্মত নই।

চিরদিনের জন্য পাকিস্তান পরিত্যাগ ক'রে চ'লে আসার সপক্ষে আপনি কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চিঠি পড়ে মনে হয় যে-কারণের সহিত আমি জড়িত, সেইটেই আপনি সবলের চেয়ে গুরুতর কারণ মনে করেন। আপনি লিখেছেন, মেয়েদের সংক্রান্ত সমস্যাই সব চেয়ে বড় সমস্যা, আর আপনার ব্যক্তি-গত ক্ষেত্রে সে সমস্যা দেখা দিয়েছে প্রধানত তিনটি মেয়েকে নিয়ে। সে তিনটি মেয়ের দুজন হচ্ছেন পিসিমা আর কনক। বাকি যুঁড়ি অদূর ভবিষ্যতে বিবাহের পর আমি।

আপনি লিখেছেন, সিসিমাকে আপনি তত চিন্তিত নন, কারণ যে-বয়সে সিসিমা উপনীত হয়েছেন সে বয়সে তিনি অনেকটা নিরাপদ; আর কনকের বিষয়ে লিখেছেন যে, তার সমস্যার সমাধান সহজেই করা চলবে পশ্চিম বাঙলায় তার বিবাহ দিয়ে। তা হ'লে বাকি রইলাম শুধু আমি। অর্থাৎ আমার সমস্যার সমাধান করতে হ'লে পূর্ব বঙ্গের পাট তুলতে হয়। তার মানে, আমাকে বিয়ে করতে হ'লে আপনাকে পিতৃ-পিতামহের পবিত্র বাস্তুগৃহ, জমি, জমিজমা সমস্ত বিক্রয় ক'রে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নিতে হয়। আপনাকে আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি, এত বড় দুষ্কৃতি আর অকল্যাণের কারণ হ'য়ে বিবাহিত জীবন আরম্ভ করলে বেশি দিন আমি বাঁচবনা। পরিত্যক্ত বাস্তু-দেবতার কঠোর অভিশাপ আমাকে জীর্ণ করতে থাকবে।

তার চেয়ে নাই বা হ'ল উপস্থিত আমাদের বিয়ে। ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি নরনারীর মধ্যে দুটী প্রাণী যদি শেষ পর্যন্ত অবিবাহিতই থেকে যায়, তাতেই বা কি-এমন ক্ষতি হবে বিশ্বের? পরিত্রাণ পাবে আপনার বিষয়-সম্পত্তি অবহেলিত হওয়ার অগৌরব থেকে। নিমিত্তের ভাগী হওয়ার গ্লানি থেকে আমি পাব পরিত্রাণ।

কিন্তু আমার মনের প্রকৃত কথা যদি জানতে চান, তা হ'লে বলব, আমি আমাদের বিবাহ প্রস্তাব ছেদন করতেও চাইনে, বিলম্বিত করতেও রাজি নই। শুনেছি আপনাদের দেশে আশ্বিন কার্তিক মাসে বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে। কি কাজ অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করে? যদি সম্ভব হয় আশ্বিন মাসেই, নচেৎ কার্তিক মাসে বিবাহ ক'রে আমাকে হরিণপুরে নিয়ে যান। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, কিছুতেই আমি আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হবনা। কেউ আমার দেহ মলিন করতে পারবেনা, এ আশ্বাস আপনাকে নিশ্চয় ক'রে দিলাম। যদি কেউ একান্তই আমার দেহ স্পর্শ করে, সে স্পর্শ করবে আমার শবদেহ। বিভীষিকা ভরে শিউরে উঠে ঠেলে ফেলে দেবে সে নিরর্থক দেহ।

আপনি জানেন, আপনার বন্ধু আমার দাদা কেমিষ্ট্রির একজন বিখ্যাত অধ্যাপক। আমাদের বাড়িতে তাঁর ছোটখাটো একটা ল্যাবরেটরী আছে, সে কথাও আপনি জানেন। হরিণপুরে যাবার সময়ে তাঁর ল্যাবরেটরি থেকে অল্প-একটু পোটাশিয়ম সায়ানাইড সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ হবে না। প্রয়োজন স্থলে পোটাশিয়ম সায়ানাইড আমাকে বিদ্যুৎ গতিতে শুশুর হাত থেকে নিরাপদ করবে।

কিন্তু কেনই বা পোটাশিয়ম সায়ানাইডের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে? সুন্দরবনে বাঘ নিয়ে মানুষ বাস করতে পারে, আর মানুষ কি মানুষের এত বড় শত্রুই হয়ে উঠেছে যে, পূর্ব বঙ্গে মানুষ নিয়ে আমরা বাস করতে পারব না?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে আমার একটুও দ্বিধা নেই, নিশ্চয় পারব। আজ হয়ত' পৃথিবীতে অত্যাচারীর দল প্রবল হয়ে উঠেছে; কিন্তু যারা ভদ্র, যারা ধার্মিক, যারা মানবতার ধর্মকে শ্রদ্ধা ক'রে চলে, একদিন তারা অত্যাচারীদের নিশ্চয় পরাভূত করবে। পূর্ব বঙ্গে সে-রকম মুসলমানের সংখ্যা অল্প নয়, একথা আমি সত্যই বিশ্বাস করি। সেই সব ভদ্র মুসলমানকে আপনাদের রক্ষা করবার জন্য যথেষ্ট সুযোগ এবং সময় না দিয়ে মুষ্টিমেয় শুশুর ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসা ঐ সকল ভদ্র মুসলমানের প্রতি গভীর অবিচার। ভয় পাওয়ার মতো

অনিষ্টকর রিপু মানুষের আর দ্বিতীয় কিছু নেই। ভয় পেয়ে আত্মরক্ষাকে জিইয়ে রাখি, আর প্রশ্রয় করে তুলি।

চিঠিতে এক জায়গায় আপনি লিখেছেন আত্মসম্মান নিয়ে সেখানে বাস করা যায় না। আমি জেনে পাইনে, আত্মসম্মান নিয়ে সেখান থেকে পালানোই বা যায় কেমন ক'রে। পূর্ব বঙ্গের গাড়ি যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছায়, তখন কি সেই লজ্জাভীতিজর্জর আত্মসম্মান বেচারার বিন্দুমাত্র অংশও জীবিত থাকে? থাকেনা যে, সে কথা মুহূর্তের জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালেই বোঝা যায়।

আত্মসম্মান বজায় রাখবার সকলের চেয়ে বড় উপায় হচ্ছে, মৃত্যুপণ ক'রে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মরিয়া হওয়া। মরিয়া মানুষকে ভয় করে না এমন নির্ভীক গুণ্ডা বিরল। আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে যে-মানুষ মরিয়া, তার বাণী হচ্ছে, যাক প্রাণ যাক মান। আর, আত্মসম্মান বাঁচাবার ওজুহাতে যে-মানুষ পলায়ন-পর, তার অন্তরের গোপন বাণী হচ্ছে, যাক মান থাক প্রাণ। বিবাহের পর আপনি আর আমি মৃত্যুপণ করে নির্ভয়ে হরিণপুরে বাস করব। দেখবেন আমাদের সম্মান কেউ নষ্ট করতে পারবেনা।

এবার আমার গোপন মনের একটা রঙিন স্বপ্নের কথা আপনাকে জানাই। আমার স্বপ্ন, আপনাকে বিবাহ ক'রে আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন আপনাদের নদ-নদী খাল-বিল খচিত শ্যামল সুন্দর দেশের স্বপ্নময় হরিণপুর গ্রামে। সেখানকার প্রাচীন জমিদার বংশের আমি হব নতুন দিনের বউ। সকাল থেকে সারাদিন আমার কাটবে বনেদি পরিবারের হাজার রকম দাবি-দাওয়া আর পরিচর্যার মধ্যে। তারপর দিনান্তে প্রাচীন কালের বৃহৎ অট্টালিকার উপর সন্ধ্যা যখন তার স্নিগ্ধ মায়াজাল বিস্তার ক'রে নেমে আসবে, আমি বাজাব শাঁখ, ঘরে ঘরে দেখাব প্রদীপ, দ্বারে দ্বারে ছড়াব জল। তারপর সংসারের কল্যাণ কামনায় গলায় আঁচল দিয়ে তুলসী তলায় করব প্রণাম, যে তুলসীমঞ্চে তলায় প্রণাম করতেন আগেকার কালে আমার শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীরা।

আপনার প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমার এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার ব্যবস্থা আপনি যেন অনুগ্রহ করে অতি অবশ্য করেন।

এইবার আমার শেষ কথাটুকু ব'লে দীর্ঘ চিঠি শেষ করি। এটা হয়ত আমার আজগুবি মনের অদ্ভুত খেয়ালের কথা। কিন্তু দেখবেন বিপদের দিনে এইটেই হবে আমার রক্ষাকবচ। হরিণপুর পৌঁছে সর্বপ্রথম মুসলমানের সংস্পর্শে আসবার আমার সুযোগ হবে, —হোক্ সে ভদ্র, হোক্ সে গুণ্ডা, হোক্ সে আর যাই কিছু—তার সঙ্গে আমি স্থাপন করব ভাই-বোনের মিতালি। দেখবেন, প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করবে, যেমন করে করত তার আপন বোনকে। আমাকে বাঁচাবার জন্য একজন মানুষ মৃত্যুপণ করে প্রস্তুত আছে, এ কথা জানা থাকলে মৃত্যুবরণ করাও সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

পূর্ব বঙ্গ পরিত্যাগ করবার সপক্ষে যে-সকল কারণ আপনার পত্রে উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে যেগুলির সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে আমি সংশ্লিষ্ট, এ চিঠিতে প্রধানত সেইগুলির আলোচনাই করেছি। বাকিগুলিও যে অলঙ্ঘনীয় নয়, সে কথা আপনার ন্যায় জ্ঞানী মানুষকে আমার বোঝাতে যাবার প্রয়োজন নেই।

বুঝতেই পারছেন, কতকটা আহত-মনা এ চিঠি আপনাকে লিখছি। সুতরাং, স্বাভাবিক অবস্থায় যে-সংযম প্রত্যাশা করা যায়, সে সংযমের কিছু অভাব এ চিঠির মধ্যে প্রকাশ করা আশ্চর্য নয়। মনের দুঃখ-বেদনার অকপট কথা সোজাসুজি ভাবে জানাতে গিয়ে কোথাও যদি আপনাকে আঘাত দিয়ে থাকি, অনুগ্রহ ক'রে সে অপরাধ ক্ষমা করবেন।

আশা করি আপনারা কুশলে আছেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
দীপ্তি

চিঠি শেষ ক'রে হর্ষোজ্জ্বল মুখে এনায়েৎ বললে, "অদ্ভুত এই চিঠি! আর, ধন্য তুমি জীবন, এমন অদ্ভুত মেয়ের সাক্ষাৎ লাভ ক'রে কি ঠিক করছ?"

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জীবনশেখর বললে, "কিছু ত ঠিক করতে পারছিনে।"

তীক্ষ্ণ-কুঞ্চিত নেত্রে জীবনশেখরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে এনায়েৎ বললে, "বল কি হে! ঠিক করতে পারছ না?—এত টিমে তুমি? এর পরও যদি কলকাতার দিকে মুখ ফেরাও, তোমার কোমর জড়িয়ে আমরা লটকে যাব,—নোটিশ দিয়ে রাখলাম।"

মৃদু হেসে জীবনশেখর বললে, "কি এমন মূল্যবান বস্তু আমার মধ্যে আছে যার জন্যে আমাকে এখানে আটকে রাখতে চাইছ?"

এনায়েৎ বললে, "উপস্থিত তোমার মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান বস্তু হচ্ছে দীপ্তি, যা থেকে হরিণপুরকে কিছুতেই আমরা বঞ্চিত হ'তে দেব না। দীপ্তির মতো একটি মেয়ে হরিণপুরে আছে জানা থাকলে হরিণপুরের নৈতিক মান উঁচু হয়ে থাকবে।"

এক মুহূর্ত গভীর ভাবে কি চিন্তার পর এনায়েতের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে শেখর বললে, "কিন্তু দলিল? দলিলের কি হবে?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এনায়েৎ বললে, "ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হবে। সই-স্বাক্ষর হয়নি, রেজেস্ট্রী হয়নি, টাকার লেন-দেন হয়নি,—ও আবার দলিল কি হে?" তারপর কণ্ঠস্বর একটু মৃদু করে নিয়ে বললে, "তুমি চ'লে যাচ্ছ ব'লে বাবা এত দুঃখিত হয়েছেন যে, একথা শুনলে তিনি আনন্দিত হ'য়ে দলিল-খানা নিকটতম আগুনে অর্পণ করবেন। যাতে পঙ্গু হ'য়ে শুয়ে আছেন, নইলে তোমার কাছে তাঁকে নিয়ে আসতাম। যাবে তুমি আমার সঙ্গে তাঁর কাছে?"

"কেন!"

"চিঠিখানা তাঁকে প'ড়ে শোনাব।"

বিস্মিত-কণ্ঠে জীবনশেখর বললে, "বল কি হে! এ চিঠি শোনাবে তাঁকে?"

এনায়েৎ বললে, "অবশ্য শোনাব। এ ত' আর প্রেমপত্র নয়, হজুর মতো তোমার প্রতি একটি হুজ্জো। এ চিঠি শোনাতে কোনো আপত্তি নেই। যাবে আমার সঙ্গে!"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে জীবনশেখর বললে, "না, আমি আর যাবনা, তুমি একাই যাও।"

"আচ্ছা, তা হ'লে একটু অপেক্ষা কর, এখনি আসছি।" ব'লে এনায়েৎ অন্দর মহলে প্রবেশ করলে।

এনায়েৎখের গৃহ থেকে জীবনশেখর যখন বাড়ি ফিরল, তখন রাত্রি আটটা বেজে গেছে। সেই দিনই সে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত জেগে সুদীর্ঘ পত্র লিখলে দীপ্তির দাদা বিনয়েন্দ্রকে। চিঠি লেখবার সময়ে ক্ষণে ক্ষণে তার মনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছিল একটা বাণী—বিবাহের পর আপনি আর আমি মুক্তাপণ ক'রে নির্ভয়ে হরিণপুরে বাস করব।

বিনয়েন্দ্রর কাছ থেকে উত্তর আসবার পূর্বেই দীপ্তির কাছ থেকে এল তার দ্বিতীয় পত্র। এবারকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চিঠির এক জায়গায় সে লিখেছে,—আজ আপনার চিঠি পেয়ে পর্যন্ত দাদা মাঝে মাঝে একে-ওকে-তাকে প্রায়ই বলছেন, হঠাৎ জীবনের কী যে হল, সব ব্যবস্থা একেবারে উল্টে-পাল্টে দিয়ে হরিণপুরে থাকাই স্থির করলে। শুনে আমি নিঃশব্দে হাসি, আর মনে মনে বলি, হয়নি অল্প কিছুই, অধীনার আবেদনে সদয় কর্ণপাত করেছে।

১৩২৫ সালের ৯ই কার্তিক।

বেলা বারোটার সময়ে দেখা গেল হরিণপুরের সীমান্ত-রেখার অনতিদূরে একটা শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে হরিণপুরের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। শোভাযাত্রার মধ্যস্থলে রায়চৌধুরীদের বংশ-প্রথা অনুসারে অশ্বপৃষ্ঠে জীবনশেখর, এবং তার পশ্চাতে সুসজ্জিত তাঞ্জামের মধ্যে নববধূ দীপ্তি।

হরিণপুরের সীমান্তরেখার অব্যবহিত পশ্চাতে হরিণপুর এলাকার মধ্যে জমা হয়েছে জন পঞ্চাশেক মুসলমান। তাদের প্রত্যেকের হস্তে বাঁশের দীর্ঘ মোটা লাঠি।

পূর্বোক্ত শোভাযাত্রা মুসলমান জমায়েতের সম্মুখে উপনীত হওয়া মাত্র অতর্কিতে প্রচণ্ড শব্দ করে একটা বোমা বিদীর্ণ হ'ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশজন লাঠিয়ালের মিলিত-কণ্ঠের আল্লা-হো-আকবর ধ্বনিতে আকাশ ভরে উঠল চকিত। শোভাযাত্রা নীরব হ'য়ে থেমে গেল, জীবনশেখরের ঘোড়া হ'য়ে উঠল চঞ্চল।

তখন সেই মুসলমান জনতার মধ্য থেকে ত্বরিতপদে একব্যক্তি দীপ্তির তাঞ্জামের পার্শ্বে উপনীত হ'য়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করলে।

প্রত্যভিবাদন ক'রে সহাস্য-প্রশ্ন মুখে দীপ্তি বললে, "নামতে হবে এখানে? নামব না কি?" ব'লে অবতরণ করবার ভঙ্গিতে পদ প্রসারিত করলে।

ব্যস্ত হ'য়ে মুসলমানটি বললে, "আজ্ঞে না, নামতে হবেনা আপনাকে। আমি আপনার দেহরক্ষী এনায়েৎ আলি। হরিণপুরের জমিতে আমিই প্রথম মুসলমান যার সৌভাগ্য হ'ল আপনার দর্শন লাভ করবার।"

সহসা দীপ্তির খেয়ালে এল একটা কথা। ধীরে ধীরে তার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল সুমিষ্ট-মধুর হাসি। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "তা হ'লে এদিকের সৌভাগ্যও শুধু কম নয়! হরিণপুরে প্রবেশ করেই ছোট বোন বর্ষার দেশে তার দাদার।" তারপর মনে মনে একটু কি ভেবে নিয়ে বললে, "আজ মঙ্গলবার, আসছে মঙ্গলবারে ভাইফোঁটা। ওঁকে পাঠিয়ে দেবো আপনাকে নেমন্তন্ন ক'রে আনতে।"

দীপ্তির কথা শুনে এবারেও হাসতে লাগল। বললে, "তা হ'লে নেমন্তন্নর ফর্দ্দ কিছু বাড়াতে হবে দিদি। আমার মতো আরও উনপঞ্চাশটী ভাই লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।" তারপর পকেট থেকে একটা কাগজ বার ক'রে দীপ্তির হাতে দিয়ে বললে, "এতে আপনার পঞ্চাশটি ভাইয়ের নাম পাবেন। বাড়ী গিয়ে প'ড়ে দেখবেন এটি আপনাকে দেওয়া অঙ্গীকার পত্র। আপনার পঞ্চাশজন ভাই এতে সই ক'রে অঙ্গীকার করেছে তাদের মধ্যে একজনের দেহেও প্রাণ থাকতে কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবেনা।"

গভীর আদরে সঙ্গে কাগজখানা কপালে ঠেকিয়ে দীপ্তি কোলের উপর রেখে দ'রে পড়তে গেল। কিন্তু চোখ ঝাপসা একরাশ উচ্ছল অশ্রু। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে দু-চোখ মুছে হাসিমুখে সে বললে, "ভগবান মঙ্গল করুন। আমি পঞ্চাশজনেরই নামে নেমন্তন্ন পাঠাবো।"

লাঠি ঘুরিয়ে এবারেও ইশারা করলে। আবার বিদীর্ণ হল একটা ঝোঁয়া, বেজে উঠল বাজনা-বাদ্য। নেমন্তন্নের মিঠে-কড়া মৌজের আনন্দের মধ্য দিয়ে মন্থরগতিতে শোভাযাত্রা পুনরায় অগ্রসর হ'ল জমিদার বাড়ীর দিকে। তাজামের আগে আগে অশ্বপৃষ্ঠে চলল জীবনেশ্বর, তাজামের পাশে পাশে লাঠি হস্তে এবারেও আসি। আর সর্বাগ্রে চলল অধীর উল্লাসে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে উনপঞ্চাশজন লাঠিয়ালের দল।

জীবনেশ্বরের প্রসন্ন-পরিতৃপ্ত অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছিল—বিবাহের পর কৃতজ্ঞতা ক'রে নির্ভয়ে আমরা দুজনে বাস করব হরিণপুর গ্রামে।

21-3-50